সাহিত্য-সম্পুট

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীবিজিতকুমার দত্ত
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

ভূমিকা

এই সংকলনগ্রন্থে যে-নীতি অবলম্বনে রচনাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম রচনাটির লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ সালে, আর শেষ প্রবন্ধটির লেখক মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮ সালে; সকলেরই জন্ম ঊনবিংশ শতকে, কিন্তু ইঁহাদের অনেকেরই জীবন বিংশ শতকের দীর্ঘকাল অধিকার করিয়াছে; এমন-কি ইঁহাদের অনেকেরই কীর্তির চরম বিকাশ বিংশ শতকে; তৎসত্ত্বেও বলিলে অন্যায় হয় না যে, ইঁহারা সকলেই ঊনবিংশ শতকের লোক। অল্পবিস্তর একই সামাজিক আবহাওয়ায়, একই মানসিক খোরাকে ইঁহাদের মন ও ধ্যানধারণা গঠিত। স্বল্পাক্ষরে সে ভাবটিকে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় জীবনের প্রতি একটি গহন গম্ভীর দৃষ্টি, ম্যাথু আর্নল্ড্ বলিয়াছেন high seriousness! নানাকারণে বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতক নিষ্ঠায় এবং আদর্শে এবং প্রেরণায় অত্যন্ত গহন গম্ভীর; বাস্তবকর্মে ও সাহিত্যকর্মে সর্বত্র তাহার এ পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। এমন-কি, যেখানে তাহার কলম লঘু চালে চলে সেখানে অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা আরও প্রবল। সস্তা-দরের সাংবাদিকতার বাহিরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম যেখানে চলিয়াছে সেখানে গাম্ভীর্য। মনে হয় না দুইয়েরই উৎস একই কলম। ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধ্যার লঘুবাচাল প্রবন্ধগুলির তলে তলে কী অদম্য দৃঢ়তা, মলমলের জামার তলে মাংসপেশীর দার্ঢ্য যেন চোখে পড়ে। বীরবলী কলমের লঘু নৃত্য কি সম্ভব হইত পায়ের তলাকার মাটি যদি সুদৃঢ় ও অটল না হইত? রবীন্দ্রনাথের গহন গম্ভীর প্রবন্ধগুলির পাঁচশোমণি পালোয়ারী নৌকাগুলি স্মিতহাস্যের স্রোতের উপরে এমন অনায়াস মসৃণতায় বাহিত হইয়াছে, মনে হয় যেন কোনো ভার নাই, মনে হয় যেন শিশুতেও ঠেলিয়া লইতে পারে। এমন উদাহরণ আরও পুঞ্জীভূত করা যাইতে পারে— কিন্তু সে প্রয়োজন আছে মনে করি না। কেন এমন হইল সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলা চলে যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, ইংরাজি সাহিত্য আত্মসাৎ করার ফলে বাঙালীর মনের মধ্যে যে ধর্মান্তর চলিতেছিল সেই ধর্মান্তরসুলভ উৎকট নিষ্ঠা, নবোদ্‌বোধনজাত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, এবং সংস্কারপ্রয়াসী কর্মোৎসাহ প্রভৃতি মিলিত হইয়া ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর মন বিশেষ একটা ধরণে গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহারই ফলে জীবনের প্রতি এই গহন গম্ভীর দৃষ্টি, ম্যাথু আর্নল্ড-কথিত high seriousness। আমাদের বিশ্বাস, এখানে সংগৃহীত বত্রিশটি প্রবন্ধের সবগুলিতেই জীবনের সম্পর্কে এই গহনগম্ভীর ভাব বিদ্যমান।

আরও দুটি বিষয় সংগ্রহনীতির অন্তর্গত— যে-সব রচনা আমরা এখানে সংগ্রহ করিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস, সে সমস্তই অল্পবিস্তর সাহিত্যগুণসম্পন্ন। সাহিত্যগুণই যে রচনার সমাদরের একমাত্র নিরিখ তাহা নয়, ঐতিহাসিক গুণও একটা মস্ত নিরিখ। ফোর্ট্ উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অনেকের রচনাই অদ্যাপি ঐ গুণে সমাদরযোগ্য। কিন্তু যেখানে সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সুপ্রচুর, সেখানে সাহিত্যগুণহীন রচনা -নির্বাচনের কারণ নাই। গবেষণা-গ্রন্থে তেমন প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের জন্য সংকলিত গ্রন্থে সে অবকাশ নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয় বলিয়াই মনে করিয়াছি।

লেখকগণ সকলেই সুপরিচিত। কয়েকজন তো বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির ন্যায় মনীষী লেখক নামে-মাত্র পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ ইঁহাদের রচনা গ্রন্থাকারে বাজারে পাওয়া যায় না। লেখকগণের মধ্যে মাথায় উঁচু নীচু থাকিলেও এবং খ্যাতি ও প্রচারে কমিবেশি থাকিলেও, সকলেরই কলম সাহিত্যের কলম, এমন-কি জগদীশচন্দ্রের মতো বৈজ্ঞানিক, যোগেশ-চন্দ্র বিদ্যানিধির মতো তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো প্রফেটের কলমও সরস্বতীর স্পর্শ হইতে বঞ্চিত নয়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধিকাংশ মনীষীর কলমে বাণীর স্পর্শ আছে। এই জন্য বাংলা সাহিত্যে সংকলন করা সহজ, অল্প আয়াসেই ডালি ভরিয়া ওঠে।

প্রবন্ধ বলিতে যে-সব গুণের সমষ্টি বোঝায় এই-সব রচনায় তাহা থাকিলেও এগুলিকে আক্ষরিক অর্থে প্রবন্ধ বলা চলে কি না সন্দেহ। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতে পারে, স্বল্পায়ত হইতেও পারে, কিন্তু বোধ করি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এ গ্রন্থের অনেক রচনাই দীর্ঘতর রচনার অংশবিশেষ। কিন্তু নির্বাচন এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, মূল পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্য ছাড়াও বুঝিতে পারা যায়, বড়ো জোর এক-আধটি ইঙ্গিত আবশ্যক হয়, অনেক সময় তাহারও আবশ্যক হয় না। দেবেন্দ্রনাথের 'হিমাচল-ভ্রমণ' এবং বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'— দুইই লেখকগণের আত্মচরিতের অংশ। দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের জীবনকথা সুপরিজ্ঞাত, কাজেই বলা যাইতে পারে যে, এ-দুটির ভূমিকা পাঠকের মনে আগে হইতেই রচিত হইয়া আছে। 'পাশ্চাত্যভাব' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের অংশমাত্র হইলেও এমনভাবে লিখিত যে পাঠক, সমগ্রের সাহায্য ছাড়াও লেখকের বক্তব্য বুঝিতে পারে। অবশ্য সমগ্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলে অংশটি

ব্যাপকতর অর্থ লাভ করে সত্য, কিন্তু অংশতঃ পড়িলেও অর্থগৌরব হ্রাস পায় না।

আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে আমরা এখানে চারজনের রচনা সংকলন করিয়া দিয়াছি: বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ। চারজনেই মনীষী ব্যক্তি। একই বিষয়কে চারজনের মনীষা কি ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহা সত্যই শিক্ষাপ্রদ, ও কৌতূহলজনক। আর লক্ষ্য করিবার মতো এই যে, বিচাররীতিতে ভেদ থাকা সত্ত্বেও চারজনের সিদ্ধান্তে দুস্তর ভেদ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়' ও প্রমথ চৌধুরীর 'ফাল্গুন' একটু স্বতন্ত্র ধরণের রচনা। অন্য রচনা যেখানে বিষয়কে প্রকাশ করে এ শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করে নিজেকে। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যেন ভারবাহী মুটে, এ শ্রেণীর প্রবন্ধ লঘুতল্পী পথিক; বিষয়-গৌরবী প্রবন্ধের কাছে পথটা লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়মাত্র, আর এ-জাতীয় প্রবন্ধের কাছে (ইহাদের আত্মগৌরবী বলা যাইতে পারে) পথে চলাটাই লক্ষ্য, তদতিরিক্ত যদি কোনো লক্ষ্য থাকে তবে তাহা বেমালুম চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে সাহিত্যবিষয়ক রচনার সংখ্যা অধিক হইলেও অন্য বিষয়ের রচনার অভাব নাই। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' ও 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ, যেমন সামাজিক প্রসঙ্গ হইতেছে 'পাশ্চাত্যভাব', তত্ত্বমূলক রচনা হইতেছে 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব', 'সাধনা: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রভৃতি। গ্রন্থখানা, বাংলা যে রচনা-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিপুলতার সামান্য অংশ তাহার সমগ্রতা সত্যই বিস্ময়কর।

২

নব্য বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিণতির দিকে চাহিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আমলে ইহার গদ্যশাখার উৎপত্তি ধরিলে, মাত্র সামান্য চল্লিশটি বছরের মধ্যে বাংলা গদ্য যে অপ্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করিল, তাহা বিস্ময় সৃষ্টি না করিয়া পারে না। অন্য কোনো দেশে গদ্যের উদ্ভব ও পরিণতির মধ্যে এত অল্প সময়ের ব্যবধান নয়। প্রথমে কিছুদিন গেল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুনশী ও পণ্ডিতগণের কর্মকাণ্ড, তার পরে আসিল রামমোহনের জ্ঞানকাণ্ড, তার পরেই দেখা দিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর, তাঁহার কলম শিক্ষানবিশের নয়—একেবারে স্রষ্টার। আর দুটি দশক ভালো করিয়া না যাইতেই বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ রসসাহিত্য সৃষ্টি করিলেন। ইংরাজি গদ্য, কর্মকাণ্ড হইতে যথার্থ গদ্যে

পৌঁছিতে তুলনায় অনেক দীর্ঘতর সময় লইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এই সংক্রমণ অতি অল্প সময়ে ঘটিয়া দর্শকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে! বাঙালী সমাজের এই নবজাগরণ সত্যই এক আশ্চর্য ব্যাপার। ইহার প্রাথমিক কারণটা বাহির, হইতে আসিলেও দেশের চিত্তভূমিতে বিপুল সম্ভাবনা না থাকিলে এমনটি কখনোই ঘটিতে পারিত না। আচার্য যদুনাথ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন বর্ণনা করিয়া ভারতীয় সমাজের যে নবজাগরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এই বিস্ময় প্রতিফলিত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ লিখিতেছেন—

"The Indian Renaissance was possible only because a principle was discovered by which India could throw herself into the full current of modern civilisation in the outer world without totally discarding her past. She could approach the temple of modern art and science not as a naked beggar, not as an utter alien, but as a backward and at present impoverished country cousin of Europe...

"The ground was prepared for this revolution in thought by the change in our education system which began in Bengal about 1810 and grew with increasing force from 1818. (Bengal will best serve as my illustration). Education through the English language was the lever which moved the mediaeval Indian world, after centuries of inertia under Muslim rule...

"This Renaissance was at first an intellectual awakening and it influenced our education, thought, literature and art ; but in the second generation (1840-1870) it became a moral force and set itself to reforming our society and religion. It began with our study of English literature and modern philosophy from books written in the English language, that is, with what is called higher or college education, as distinct from the mere knowledge of English for the work of clerks or interpreters to the British officers...

"In the next generation, the fruits of this English education produced a new and highly valuable literature in the provincial languages of India, at first by translation, next by adaptation from English works, and finally as original compositions. In these writings the influence of English literature and European thought is unmistakable, but equally unmistakable is their success in

adapting the foreign spirit and literary model to the Indian mind and tradition."

—*Fall of the Mughal Empire*, VOL IV

বাংলা গন্তের ইতিহাস লিখিতে বসিলে বা বাংলা গন্তের নমুনা উদ্ধার করিতে বসিলে বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্য-লেখকদের কথা বলিতে হয় বা তাঁহাদের রচনা উদ্ধার করিতে হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। আমরা এখানে বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিতেছি না বা বাংলা গদ্যের নমুনা সংগ্রহ করিতেছি না। গদ্য যেখানে আসিয়া সাহিত্যপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছে সেখান হইতে আমাদের প্রসঙ্গের সূত্রপাত। তাই বিদ্যাসাগরকে[১] আদি ধরিয়াছি; যদিচ জন্মতারিখের খাতিরে দেবেন্দ্রনাথের রচনাটিকে প্রথম স্থান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের আগেকার গদ্যে সাহিত্যগুণ যেমন কখনো কখনো হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপরে লেখকের যেন কর্তৃত্ব নাই, পরবর্তী কালের গদ্যে আর তেমন নয়। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্থায়ী হইবার ফলে বাংলা গদ্যরীতির একটা সামগ্রিক উন্নতিবিধান যেন ঘটিয়া গিয়াছে। সাহিত্যগুণ বহুল পরিমাণে বাংলা গদ্যের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, এমন-কি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রচনাতেও সাহিত্যগুণ অবিরল। ইহা আর কিছুই নয়—বহু প্রতিভাবান লেখকের ব্যবহার-ফলে বাংলা গদ্য সুরবহুল বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, অল্প আয়াসেই মনোরম সুর ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, এমন-কি নিতান্ত আনাড়ির হাতের পীড়নেও যে ঝংকার ওঠে তাহা সব সময় শ্রুতিকটু নয়। ব্যক্তির গুণের মতো যন্ত্রেরও একটা গুণ আছে। এ সেই যন্ত্রের গুণ।

'প্রবন্ধ' শব্দটির মধ্যে বন্ধ্ ধাতু থাকায় একটা বাঁধাবাঁধির ভাব আছে। ও বস্তু যেন রীতিমত আটঘাট বাঁধিয়া, কোমর কষিয়া, লিখিতে বসা। কিন্তু ইংরাজি essay শব্দটি মূলতঃ ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ বহন করে—ইংরাজি essay শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা হইতেছে, প্রচেষ্টা, খসড়া, 'loose sally of the mind'—মনের কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া প্রবেশ। কিন্তু কি ইংরাজি সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যে essay ও প্রবন্ধ এমন দুই ভিন্ন শ্রেণীর রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনো-ক্রমেই যাহারা এক-শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারে না। ড্রাইডেনের essay, বার্কের essay,

[১] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো রচনা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ গুণ তাঁহাদের সচেতন ইচ্ছাশক্তির ফল বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাসাগরই প্রথম সচেতন গদ্যশিল্পী।

আর হ্যাজ্‌লিট ও ল্যামের essay এক-শ্রেণীর রচনা নয়। ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ, দুইই প্রবন্ধ নামে আখ্যাত হইলেও দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দুস্তর। কেহ কেহ এক শ্রেণীকে প্রবন্ধ, অন্য শ্রেণীকে রচনা আখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। 'প্রবন্ধ' ও 'রচনা' শব্দ দুটিরও প্রয়োগ নির্বিচার ও মিশ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে রচনা মানে প্রবন্ধ। কাজেই শব্দ দুটিকে ভিন্নার্থবাহক করিতে গেলে সফল হইবার আশা অল্প। এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক শ্রেণীর প্রবন্ধ 'বিষয়গৌরবী', আর অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধ 'আত্মগৌরবী', রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'বিষয়ের গৌরব' আর 'বিষয়ীর গৌরব'— আমরা বলিতেছি 'আত্মগৌরবী'। এক শ্রেণীর প্রবন্ধ যুক্তি তর্ক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করে, অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধ অলংকার কল্পনা ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা আপনাকেই প্রকাশ করে, আগেই বলিয়াছি, এক শ্রেণীর প্রবন্ধ ভারবাহী মুটে, অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধ লঘুভার পথিক। এখানে আমরা দুই শ্রেণীর প্রবন্ধই সংগ্রহ করিয়াছি, স্বভাবতঃই প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা অধিক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধুপুরুষ, ধর্মসাধনা তাঁহার জীবনের যথার্থ ক্ষেত্র। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসেও তাঁহার পদাঙ্ক পড়িয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি একদল মনীষী বাঙালী লেখককে একত্র করিয়া, এক লক্ষ্যের দিকে চালনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা দেশের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। আত্মচরিত ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান বাংলা ভাষায় দুইখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। 'হিমাচল-ভ্রমণ' আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত। দেবেন্দ্রনাথ ভ্রমণরসিক ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাত্মসাধনার সুবিধার জন্য অনেক সময় তিনি নির্জনবাস করিতেন। এই রকম একটি নির্জন স্থানের সন্ধান করিতে গিয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভূখণ্ডটি 'আবিষ্কার' করেন। কিন্তু হিমালয়ের বহুপুণ্যস্মৃতিজড়িত নির্জনতাই বোধ করি তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় ছিল। হিমাচল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সিপাহিবিদ্রোহ ঘটে। যদিচ পাহাড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই, তবু বিপদের আশঙ্কা যে একেবারে না ছিল তাহা নয়। বিশেষ, কলিকাতা-প্রত্যাবর্তনের পথে মহর্ষিকে অনেক সময়ে বিপদের গা ঘেঁষিয়া চলিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় বা গুরুতর কারণ হইতেছে— এবারকার

হিমাচলবাসের ফলে যে অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়া ফিরিলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিল। তাহার বিশদ বিবরণ শিবনাথ শাস্ত্রী -লিখিত 'ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান' প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।

কালক্রমে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব অন্য ক্ষেত্রে ম্লান হইয়া আসিলেও তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি ম্লান হইবে মনে হয় না। মহর্ষির আত্মচরিত বাংলা ভাষায় অল্প কয়খানি সুখপাঠ্য আত্মচরিতের অন্যতম। প্রধানতঃ অধ্যাত্মজীবনের রহস্যব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইলেও, ইহা নীরস ধর্মগ্রন্থ মাত্র হইয়া ওঠে নাই। বর্ণনাচাতুর্যে, ঘটনাবিন্যাসকৌশলে, আর সর্বোপরি প্রসাদগুণবিশিষ্ট মার্জিত ভাষার ঐশ্বর্যে এ গ্রন্থ স্থায়িত্বের অধিকার অর্জন করিয়া লইয়াছে। আত্মচরিতের কোনো কোনো অধ্যায়ের নাটকীয় গুণ বঙ্কিমচন্দ্রের অলিখিত কোনো উপন্যাসের পরিচ্ছেদের মতো মনোহর মনে হয়। 'হিমাচল-ভ্রমণে'র পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, সৌন্দর্যদর্শনের সহজাত নেত্র লইয়া দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হিমাচলের সৌন্দর্যে তিনি হিমাচলস্রষ্টার সৌন্দর্য দেখিয়াছেন। সৌন্দর্যদর্শনের এই নেত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আত্মচরিত লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই— খুব সম্ভব নিছক সাহিত্যের দাবিতে লিখিত গ্রন্থ শেষ করিতে তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না। এই রচনাটি উদ্ধার করিবার কারণ, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত আর ইহাতে তাঁহার এমন-একটি রীতির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা 'বিদ্যাসাগরী রীতি' হইতে স্বতন্ত্র। 'বিদ্যাসাগরী রীতি' লইয়া কিছু ভুল-বোঝাবুঝি চলিয়া আসিতেছে। এই ভুলের উৎপত্তি তাঁহার সমকালে, আর এই রীতিকে যাঁহারা ভুল বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন। দুরূহ ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত জবুথবু বাক্যকে যেন তাঁহারা বিদ্যাসাগরী রীতি মনে করেন। এর চেয়ে ভুল আর কিছু হইতেই পারে না। প্রসাদগুণে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ লেখক কয়জন? 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ কিছু বেশি— কিন্তু সে বস্তুমাহাত্ম্যে। তৎসম, তদ্‌ভব ও দেশী শব্দ মিশাইতে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ কয়জন? প্রমাণ তাঁহার রচিত বিতর্ক-পুস্তিকাগুলি। আর প্রধানতঃ তদ্‌ভব ও দেশী শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট রচনার সৃষ্টি করিতেও যে তিনি সমান দক্ষ তাহার প্রমাণ আত্মচরিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্যাসাগরী রীতি' নামে একটি ভাষারীতি আছে, বা বলা উচিত এক সময় ছিল— এই রীতির প্রধান লক্ষণ দুরূহ ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। এখন, এই রীতি আর যাহার রচনাতেই পাওয়া যাক বিদ্যাসাগরের রচনায়

কখনো পাওয়া যাইবে না। উহা কেন যে তাঁহার নামে চলিল জানি না। বিদ্যাসাগরের ভাষা বা স্টাইল বিষয়ানুগ, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, মার্জিত ও সুললিত। সর্বোপরি তাঁহার ভাষারীতি একটি নয়, অন্ততঃ তিনটি। সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি এক রীতিতে লিখিত; বিতর্কপুস্তিকাগুলি অন্য রীতিতে লিখিত; আর আত্মচরিত তৃতীয় রীতির অন্তর্গত।

বিদ্যাসাগর বোধ করি শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক, বিশুদ্ধ শিল্পপ্রেরণায় যিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্য তাঁহার কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র। কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, তাহার পরে কর্মের আর যাওয়া সম্ভব নয়। কর্ম যেখানে থামিয়াছে সাহিত্যের সেখানে সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহার লেখনীর কর্ণধার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ practical মনোবৃত্তি। কর্মের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলে আদৌ তিনি লেখনী ধারণ করিতেন কি না সন্দেহ। প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি লেখনী গ্রহণ করেন। বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী বর্ণপরিচয় হইতে যাত্রা শুরু করিয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অবশেষে সীতার বনবাসে গিয়া পৌঁছিল। সংস্কৃত পাঠ্য-পুস্তকের অভাব; তাঁহার লেখনী আবার যাত্রা শুরু করিল, ঋজুপাঠ উপক্রমণিকা হইয়া সংস্কৃতকাব্যের বিবিধ সংকলন-গ্রন্থে গিয়া উপনীত হইল। বিধবাবিবাহ-প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিরোধ-কল্পে তিনি আন্দোলনে ব্যস্ত; প্রতিপক্ষগণ সমালোচনা করিতেছে; কাজেই বেনামীতে তাঁহাকে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' 'কস্যচিৎ উপযুক্ত-ভাইপোসহচরস্য' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে হইল। মহাভারতের বঙ্গানুবাদের সূত্রপাত ও শব্দসংগ্রহের চেষ্টার মূলেও তাঁহার কার্যসম্পাদনী বুদ্ধি।

এই নিয়মের ব্যতিক্রমে মাত্র দুইখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একখানি আত্মচরিত, উহা সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহবোধ করেন নাই। অপরখানি প্রভাবতী-সম্ভাষণ। এই পুস্তিকাটি তাঁহার 'পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে রচিত'।

নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই বোধ করি প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক, বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেরণায় যাঁহার কলম চলিয়াছে। তৎপূর্বে সমস্ত সাহিত্যিকেরই লেখনী-ধারণের মূলে ছিল বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধি। ফোর্ট্‌ উইলিয়াম কলেজের লেখকগণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সকলেই এই নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কলম সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কখন্ আপনার অগোচরে উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া গেল, এবং বাংলা গদ্যের স্থায়ী নির্ভর-

যোগ্য বনিয়াদ গড়িয়া তুলিল। বিত্থাসাগরের গন্তের সঙ্গে পূর্ববর্তীদের গন্তের প্রভেদটা কোথায় এবং কিসে তাহা বোঝা সহজ, বোঝানোটাই কঠিন।

ছন্দের প্রাণ যতিতে, অর্থাৎ যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যে— এই নিয়ম গন্ত ও পন্ত দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যতিস্থাপনের সার্থকতাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আশ্চর্য স্থষ্টি। আর উহার সার্থকতার অভাবেই বৃত্রসংহার কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল-হীন পয়ার মাত্র। বিত্থাসাগরের পূর্ববর্তী গন্তলেখকগণ সজ্ঞানে যতি-স্থাপনের নিয়ম অনুসরণ করেন নাই— আঁচে আন্দাজে অথবা অন্ধভাবে চলিয়াছেন। কখনো কখনো তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই করে নাই। বিত্থাসাগরই প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নিয়মটি অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার পক্ষে কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি অপরিহার্য ছিল, কেবল পূর্ণচ্ছেদে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। প্রভাবতী-সম্ভাষণের ভাষা হৃদয়াবেগে মন্থর, অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত, পদে পদে কমা-সেমিকোলনে ঈষৎ থামিয়া থামিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটিয়াছে, চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্যশব্দের লোষ্ট্রখণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে। আর, সীতার বনবাসের ভাষায় ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন! পৌরাণিক পরিবেশ-স্থষ্টির পক্ষে ঐ ভাষাই অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছিবার আগে ভাষার এমন বিচিত্র প্রতিছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিত্থাসাগরের গন্তরীতির ছন্দে নব্য গন্তরীতির মূল-ছন্দ ধ্বনিত। এই ছন্দই নানা কলমে বিচিত্রতর হইয়া আজ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। পন্তে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গন্তে তাহা করিয়াছেন বিত্থাসাগর। তিনি গন্ত-ছন্দের মধুসূদন।

'পাশ্চাত্যভাব' অংশটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সামাজিক প্রবন্ধ' হইতে গৃহীত। উহা কেবল ভূদেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়, বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করিতেছি। ভূদেব রসসাহিত্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শক্তির চরম প্রকাশ প্রবন্ধ-সাহিত্যে। ভূদেবের ভাষা নিরলংকার; যুক্তিতে কোথাও ফাঁক নাই, ভিত্তি তথ্যভূয়িষ্ঠ এবং সর্বপ্রকার উষ্মা ও অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভূদেব জাতীয়তার (তিনি 'জাতীয়ভাব' শব্দটির পক্ষপাতী) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অন্তাবধি বর্তমান। পাশ্চাত্য ভাবের তুলনায় ভারতীয় ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ভূদেবের সময়ে এই তুলনাগত শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, এখনো আছে, হয়তো বা বাড়িয়াছে, কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত হইবার ফলে এক দল লোক

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। ভূদেবের অভিমত জাতীয় চিত্তের ভারসাম্য-রক্ষায় সাহায্য করিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন—"ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্যপাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেবভক্তি এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্র-স্বরূপ।"

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃত প্রবন্ধাংশকে মানিয়া লইতেন, কমা-সেমিকোলনটি অবধি বদল করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "হিন্দুত্ব কী তাহাই আমি দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাইতেছি যে য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল।" ভূদেব এ কথা সানন্দে মানিয়া লইতেন।

কিছুকাল হইল লোকসংস্কৃতির প্রতি নূতন আগ্রহ দেখা দিয়াছে। লোক-সংস্কৃতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। সঞ্জীবচন্দ্র যখন যাত্রা-সমালোচন লিখিতেছিলেন (১৮৭৫) তখন লোকসংস্কৃতির প্রতি এই আগ্রহ জাগ্রত হয় নাই— ইহা মনে রাখিয়া প্রবন্ধটি পড়িতে হইবে। তৎকালীন ইংরাজি রুচি দেশের অনেক প্রথা ও বস্তুকে হেয় মনে করিত, সঞ্জীবচন্দ্রও যাত্রার প্রতি সুবিচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষে বলা যায় যে, তিনি যাত্রাগানের যে বিকৃতরূপ দেখিয়াছেন তাহারই সমালোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসুন্দরের পালা বা রাধাকৃষ্ণের পালার যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু তখনও দেশে যাত্রার অবিকৃতরূপ প্রচলিত ছিল, জনসাধারণের রসতৃষ্ণা-নিবারণে তাহার সার্থকতা ছিল— সেই শ্রেণীর যাত্রা দেখিলে সঞ্জীবচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রশংসা করিতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের সমালোচনা যাত্রার বিকৃতরূপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা মনে না রাখিলে সঞ্জীবচন্দ্র ও যাত্রা দুয়েরই প্রতি অবিচার করা হইবে।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানতঃ পালামৌ-ভ্রমণ রচনাটির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইলেও, তাঁহার অন্যান্য রচনার পরিমাণ অল্প নয়। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁহার রচনার বিশেষ রীতিটি। তিনি অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত

সত্য, ভাষার আটপৌরে রূপটি তাঁহার নিজস্ব। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-পাঠের সময়ে ভুলিয়া যাই যে লিখিত বাক্য পড়িতেছি, মনে হয় যে তিনি আসর জমাইয়া গল্প করিতেছেন, আমরা শুনিয়া যাইতেছি। ইহাকেই বলি ভাষার আটপৌরে ভাব, তাঁহার ভাষা যেন ভাষার মোটা শাড়ি পরিয়া স্বজন-পরিজনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ। কি পালামৌ-ভ্রমণ, কি যাত্রা-সমালোচন, কি তাঁহার অন্যান্য রচনা— সর্বত্র এই ভাবটি বিদ্যমান।

শকুন্তলা নাটক সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে, এখানে তাহাদের আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়াতেই খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ লিখিত, যদিচ উভয় রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অল্প নয়। বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা-চরিত্রের পূর্বার্ধের সহিত মিরন্দার ও উত্তরার্ধের সহিত দেস্‌দিমোনার মিল দেখিতে পাইয়াছেন— যদিচ মূলগত অমিলও তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। খুব সম্ভব মূলগত অমিল আছে বলিয়াই মিলটুকু বেশি করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা ও মিরন্দার মধ্যে মিল স্বীকার করিয়াছেন, যদিচ সেটাকে স্থান ও ঘটনা-গত আকস্মিকতা মাত্র বলিয়াছেন। তাঁহার মতে অমিলটাই সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে দুজনের দৃষ্টিতে প্রভেদ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মিল স্বীকার করিয়া অমিলের উপরে ঝোঁক দিয়াছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র অমিল স্বীকার করিয়া লইয়া মিলের উপরে ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুজনের দৃষ্টিতে এক জায়গায় গভীরতর ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে শকুন্তলা-চরিত্রের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা বলিয়াছেন— আবার গ্যেটে তাহাকেই তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ তিনজনেরই দৃষ্টি শকুন্তলা-চরিত্রের বিবর্তন ও পরিণতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; তিনজনেই মুগ্ধ হইয়াছেন।)

(বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাটি সমাজনিরপেক্ষ, যদিচ সাধারণতঃ তিনি সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমাজের কল্যাণ দুইই মনে রাখিয়া লেখনী চালনা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল সাহিত্যিক উৎকর্ষের আলোচনাই করিয়াছেন) চন্দ্রনাথ বসু ও (রবীন্দ্রনাথের আলোচনা পড়িলে দেখা যাইবে (উভয়েই) সাহিত্য ও সমাজ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ দুটিকেই আলোচনার বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে কল্যাণ-নিরপেক্ষ মনে করেন না। তাঁহার বক্তব্য— "সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণ-দীপ জ্বলে।" সূচনায় আমরা ঊনবিংশ শতকের বাঙালীমনের প্রকৃতির আলোচনায়

বলিয়াছি যে high seriousness বা জীবনের প্রতি গহন গম্ভীর দৃষ্টি তাহার *বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশি দেখিতে পাওয়া যায় তৎকালীন সমালোচনা-সাহিত্যে।* কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সমাজ ও সাহিত্যকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই, 'কলাকৈবল্য'-তত্ত্বকে তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। তবে সাহিত্যের দাবি ও সমাজের দাবি কাহাকে কতখানি স্বীকার করিতে হইবে— স্বভাবতঃই এ বিষয়ে মতভেদ তাঁহাদের মধ্যে ছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনো কোনো মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন তাহার মূল হয়তো এইখানে। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৌন্দর্যের কাছে সমাজকল্যাণকে বলি দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মত অবশ্যই সমর্থন করি না, কিন্তু তবু যে উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ— সাহিত্য-সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণ -ধারা দুটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-প্রদর্শন। রবীন্দ্রনাথের বিচারে শকুন্তলা নাটকের মহত্ত্বের মূলে আছে— এই দুটি ধারার সুষ্ঠু সমন্বয়। চন্দ্রনাথ বসুর আলোচনার ভিত্তিও ইহাই। তবে তিনি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে যথাক্রমে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া সাহিত্যবিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য দর্শনশাস্ত্রের বেনামদার হইয়া দাঁড়াইলে আর সাহিত্য থাকে না। বেচারা সাহিত্যের প্রাণ অত শক্ত নয়।

এখানে চন্দ্রনাথ বসুর গদ্যরীতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখক, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির অনেক গুণ তাঁহাতে বর্তিয়াছে। নিরলংকার ভাষা, প্রাঞ্জল দৃষ্টি, প্রসাদগুণ, তাঁহার গদ্যের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অপরে কি করিয়া পাইবে? তাঁহার গদ্য প্রবন্ধকারের গদ্য। তাঁহার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গূঢ় কল্পনা বা ভূদেব-রামেন্দ্রসুন্দরের মনস্বিতা না থাক্, প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। নিজগুণে বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন কি না জানি না, কিন্তু বঙ্কিমী রীতিকে যাঁহারা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতমরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার একখানি আসন থাকিবে বলিয়াই মনে হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'দুর্ব্বাসার শাপ' শকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার শাপের মনোজ্ঞ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। তাঁহার মতে দুর্বাসার শাপ নাটকের ঘটনাবিন্যাসের তোরণ। ইহার উপরেই নাটকের স্থায়িত্ব ও চমৎকারিত্ব। হরপ্রসাদ প্রধানতঃ এখানে নাটকীয় সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইলেও সে সৌন্দর্য সমাজকল্যাণনিরপেক্ষ নয়— তাহা বলিতে ভুলিয়া যান নাই। অতিথিসেবা গৃহীর প্রধান কর্তব্য। দুষ্মন্ত-গত প্রাণ

শকুন্তলা দুর্বাসাকে অবহেলা করিয়াছিলেন, গৃহীর ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, ফলে দুর্বাসার শাপ— এবং তাহারই ফলে পরবর্তী নিদারুণ দুঃখ। ব্যক্তিগত বিভ্রম বা বিলাসে মুহূর্তের জন্যও স্বধর্মবিস্মৃত হইলে তাহার ফল বড়ো শোচনীয়। হরপ্রসাদ বলিতেছেন— "যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি ? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে যে-কোনো ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্মপালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকেই আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত।" এখানেও দেখিতে পাই সাহিত্যসৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণ জড়িত। বস্তুতঃ উনবিংশ শতক এ দুইকে জড়িত করিয়া ছাড়া দেখে নাই, তাঁহার চোখ সর্বদাই বাহ্যের মধ্যে গহন গম্ভীরকে অনুসন্ধান করিত, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে একই ভাবের এপিঠ ওপিঠ জ্ঞান করিত।

আশ্চর্য হরপ্রসাদের গদ্যরীতি। বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে যে কয়জন সুনিপুণ শিল্পী দেখা দিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ তাঁহাদের অন্যতম। কাজেই কিছু বিস্তারিতভাবে তাঁহার গদ্যরীতির আলোচনা করা গেল।—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার স্বকীয়তা তাঁহার বেণের মেয়ে (১৯২০) উপন্যাসে এবং শেষের দিকে লিখিত প্রবন্ধাদিতে সব চেয়ে পরিস্ফুট। তাঁহার কাঞ্চনমালা (১৯১৬) ও বাল্মীকির জয় (১৮৮১) প্রথম দিকের রচনা, দুখানিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল— বাল্মীকির জয় ১২৮৮ (১৮৮১) সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ (১৮৮২-৮৩) সালে। দুখানি গ্রন্থের ভাষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনীবিন্যাসে তো আছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কি ভাষায়, কি কাহিনীর টেক্‌নিকে, কাটাইয়া উঠিতে তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। বেনের মেয়ে ১৩২৫ (১৯১৮-১৯) সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যদিচ কাহিনীবিন্যাসের রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র-সুলভ টেক্‌নিক দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মিল ও অমিল উভয়ই আলোচ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি হইতে তাঁহার স্বকীয় রীতির বিবর্তনের যে ইঙ্গিত দেওয়া হইল, তৎসত্ত্বেও এক জায়গায় একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া দুইজনের ভাষায় ঐক্য আছে। দুইজনেরই ভাষা মূলতঃ যুক্তিসিদ্ধ মনের ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্বরস আছে। তৎসত্ত্বেও তাঁহার মন মূলতঃ নৈয়ায়িকের মন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার চরম উৎকর্ষ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নয়, তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় তাঁহার নৈয়ায়িক মন

স্বভাবসিদ্ধ স্থানটি লাভ করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনও নৈয়ায়িক মন, যদিচ বাল্মীকির জয় এবং বেনের মেয়ে গ্রন্থদ্বয়ে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের মন মূলতঃ কল্পনাপন্থী। প্রচুর কল্পনার জোগান না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক স্টাইল পদচারী পথিক, তাহার অনুসরণ কঠিন নহে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহা অনায়াসে অনুসরণ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তায় পৌঁছিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য না হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুদ্রাদোষ দেখা দেয় নাই।

এখানে আর-একটা জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িল, নৈয়ায়িকের মন আর কল্পনা-পন্থীর মন। বাঙালী-সমাজের সমষ্টিগত মনে এই দুইটি উপাদানই আছে, বাঙালী নৈয়ায়িকও বটে আবার কল্পনাপ্রবণও বটে। যে বাঙালী নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙালীই বৈষ্ণব পদাবলী লিখিয়াছে— বাংলা দেশের মানসচিত্রে ভট্টপল্লী ও নান্নুর-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত। কাঁঠালপাড়া হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়া আরও কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব সম্ভব নৈয়ায়িক বংশের সন্তান।

আগে বাংলা সাহিত্যের মুখ্য ভাষা সম্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর-একটা জল্পনার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দেশের রাজা ইংরেজ না হইয়া ফরাসী হইতে পারিত, এক সময়ে সে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংলা সাহিত্য কি আকার লাভ করিত? ইংরেজী গদ্য, কল্পনাপ্রবণের গদ্য, সে গদ্য মূলতঃ কাব্যধর্মী। এমন যে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালী-মনের কল্পনাপ্রবণ উপাদানগুলি জোর পাইয়াছে, বাঙালীর কাব্য যেমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে গদ্য তেমন হইতে পায় নাই; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম বাংলাগদ্যে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। বাংলার নৈয়ায়িক মন ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্রশ্রয় পায় নাই। ফরাসী জাতি এ দেশের রাজা হইলে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়াটা হইত মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ফরাসী সাহিত্য যুক্তিপন্থী, তাহার গৌরব গদ্য। ফরাসী কাব্য গদ্যধর্মী, অর্থাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্ণেই ও রাসিনের নাটক নৈয়ায়িক মনের কাব্য। ব্যাপক ভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাঙালীর নৈয়ায়িক মন সমর্থন পাইত, কাব্যাংশে বাংলা সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ হইত কি না জানি না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, বাংলা গদ্য একপ্রকার স্বচ্ছতা সরলতা ঋজুগতি

ও দীপ্তি লাভ করিত, বর্তমান বাংলা গদ্যে যাহার একান্ত অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে যে গদ্য বাহির হইয়াছে সে গদ্যকে বাংলা গদ্যের নিয়ম না বলিয়া গদ্যের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের রাজপথ হইয়া উঠিত। এখন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বসতি বাংলা সাহিত্যের একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইলে সেটা বড়ো সড়কের উপরে হইতে পারিত। ডুপ্লের কূটনীতির জয় হইলে ভট্টপল্লী বাঙালী মনের রাজধানী হইতে পারিত। কিন্তু এসব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক। হয়তো এইটুকু অর্থ ইহাতে আছে যে, বাঙালী-মনের গতিবিধি এবং প্রসঙ্গক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

এই ভাষাকেই আমরা মুখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথম লক্ষণীয়, ইহার ক্রিয়াপদগুলি সংক্ষিপ্ত নয়। অনেকের ধারণা, খেয়ালের ডাণ্ডা মারিয়া ক্রিয়াপদগুলির হাড়গোড় ভাঙিয়া দিলেই সাধুভাষা কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সেরূপ অপচেষ্টা নাই, তবুও ইহা মুখ্য ভাষা, যেহেতু ইহার বিন্যাস এমন যে, সাধারণ কথাবার্তা বলিতে যেটুকু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জোর দরকার, ইহাতে ততোধিক জোরের দরকার হয় না। বিশ্রম্ভালাপের সময় কথা বলিতেছি এ চৈতন্য সব সময় হয় না, এই গদ্য পাঠকালেও প্রায় সেই রকম অবস্থা। ইহাতে তৎসম তদ্‌ভব ও খাঁটি দেশী শব্দ কেমন সুকৌশলে মিশ্রিত, খাপে-খাপে খোপে-খোপে কেমন জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। ইহার তুলনায় আলালী ভাষা গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা কৃত্রিম। এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। খাঁটি সংস্কৃতর সঙ্গে খাঁটি দেশীর মেল-বন্ধন সামান্য প্রতিভার লক্ষণ নয়। মুখ্যভাষা-রচনায় সেই প্রতিভার আবশ্যক। সেই প্রতিভা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীতে অসামান্য রকম ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম এই, ভাষা সম্পর্কে কোনো রকম গোঁড়ামি ভালো নয়। ভাষার উদ্দেশ্য পাঠকের মনে লেখকের চিন্তা বা অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া ; যে ভাষায় অর্থাৎ যে-সব শব্দের সাহায্যে তাহা প্রকৃষ্টতম উপায়ে সম্ভব তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে তৎসম তদ্‌ভব দেশী বিদেশী সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা দেখি না।

কিন্তু আমাদের কিছু আপত্তি আছে, যদিচ তাহা সিদ্ধান্ত-সম্পর্কিত নয় তবু সিদ্ধান্তের সঙ্গেই পরোক্ষভাবে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন, "যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন।

সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবন-বারি নিষিক্ত হইল।"

আপত্তি আমাদের এখানেই। যেদিন বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত সেইদিনই। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য নিজের কথা বলেন নাই, আমরা বলি দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ বাংলা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যবর্ধনে অধিকতর সাহায্য করিয়াছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকেই অনুসরণ করিয়াছে, ইহাই বাংলা ভাষার মূল প্রবাহ, ইহার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র বড়ো স্থান নাই। খুব জোর ইহাদের দুইটি ক্ষুদ্র শাখানদী বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে এমন ভুল করিলেন তাহা জানি না। বিদ্যাসাগরের ভাষার কৃতিত্ব তিনি ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। এমন ভুল তাঁহার মতো মনীষীর পক্ষে বড়ো অস্বাভাবিক। আরও একটি কথা, তিনি রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান লেখক নন, কোনোক্রমেই তাঁহাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুখপাত্র বলা যায় না। অথচ তাঁহার উক্তিকেই তিনি "সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিলেন।" এটিও উচিত হইয়াছে মনে হয় না; তা ছাড়া একটি গম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে অনাবশ্যক অসহিষ্ণুতা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। 'আমার মন' প্রবন্ধটি কমলাকান্তের দপ্তর হইতে উদ্‌ধৃত। কমলাকান্তের মন চুরি গিয়াছে, জীবনে তাহার সুখ নাই— কে মন চুরি করিল, কেন অশান্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কমলাকান্ত আবিষ্কার করিয়াছে যে পরের জন্য আত্মোৎসর্গেই সুখ, সংসারে আর কিছুতেই সুখ নাই, কিন্তু লোকে সহজে এই কথাটি বুঝিতে চায় না, তাহাদের বিশ্বাস 'বাহ্যসম্পদের পূজা'তেই সুখ। বঙ্কিমচন্দ্র-সৃষ্ট যাবতীয় নরনারীর মধ্যে কমলাকান্ত বোধ করি সব চেয়ে জনপ্রিয়। কমলাকান্ত একাধারে নেশাখোর, পাগল, কবি ও মানবপ্রেমিক। এই সমস্ত বিচিত্র গুণের সমাবেশ তাহার জনপ্রিয়তার কারণ। কমলাকান্তের উক্তিগুলির আপাতলঘুতার মধ্যে যে গভীরতা, বাহ্য হাস্যরসের মধ্যে যে করুণা এবং অত্যন্ত প্রকট অসম্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে যে নিগূঢ় মনস্বিতা আছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। আগে বলিয়াছি, কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সব চেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র; প্রসঙ্গটাকে আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা যায়। কমলাকান্তের দপ্তর তাঁহার জনপ্রিয় রচনা, কমলাকান্তের অনেক উক্তি ভাষার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সকলেই ব্যবহার করে, অথচ জানে না কার উক্তি। কমলাকান্তের

স্রষ্টার নাম জানে না অথচ কমলাকান্তের নাম জানে, এমন লোক থাকাও বিচিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে জীবনদর্শন তত্ত্বাকারে ধর্মতত্ত্বে কৃষ্ণচরিত্রে ও ভগবদ্‌গীতার টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই রসসাহিত্য-আকারে কমলাকান্তের মুখে দিয়াছেন; এ দিক হইতে বিচার করিলে কমলাকান্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপাত্র বলা যায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান' প্রবন্ধে খৃষ্টীয় ১৮৬০-৭০ এই দশ বৎসরকে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থানের তথা ব্রাহ্মসমাজের চরম প্রভাবের কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই নবোত্থানের নেতৃস্থানীয় হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। তাঁহাদের প্রভাবে বহু উচ্চশিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তখন তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি প্রশস্ততর হইয়া সমস্ত বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এই নবোত্থানের সঙ্গে তাল রাখিয়া সাহিত্যেও নবযুগ দেখা দিল। সত্য কথা বলিতে কি, এই সময়টাকে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর একটা মাহেন্দ্রক্ষণ বলা যাইতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামের গ্রন্থ দুইখানিতে এই সময়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র কবি ও বিজ্ঞানীর ব্যবধান-দুস্তরতায় বিশ্বাসী নন। তাঁহার মতে কবি ও বিজ্ঞানীর লক্ষ্য এক— সত্যানুসন্ধান। তবে পথ স্বতন্ত্র বটে। বিজ্ঞানী প্রমাণ ও যুক্তির খুঁটি ধরিয়া ধরিয়া চলেন, কবি চলেন অনুভূতি ও অনুমানের ইঙ্গিতে। কল্পনা দুজনেরই প্রেরণাদাত্রী; এখানেই নিউটন ও সেক্সপীয়ারের ঐক্য। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন— "কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন— "সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।"

এই মন্তব্যটি কাহার কলমে লিখিত— কবির, না, বৈজ্ঞানিকের! রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে অনুরূপ বা সমান্তরাল মন্তব্য খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই বলিতেছিলাম কবির কলমে ও বৈজ্ঞানিকের কলমে আড়াআড়ি নাই, প্রচ্ছন্ন সহযোগিতাই আছে— তবে ক্ষেত্র ভিন্ন বলিয়া সেটা সব সময়ে ধরা পড়ে না।

জগদীশচন্দ্রের কলম কখনো কবির চালে, অনেক সময়েই কবির চিহ্নিত পথে, চলিয়া কবি ও বিজ্ঞানীর অচ্ছেদ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে একজন প্রচ্ছন্ন কবি না থাকিলে জড়বিজ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ জড় ও চৈতন্যের সুনির্দিষ্ট বেড়া ভাঙিয়া দিয়া জড় ও চৈতন্য যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে সেই নূতন রাজ্যে তিনি প্রবেশ করিতেন না। তাঁহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন কবিই খুব সম্ভব আর-একটি প্রদীপ্ত কবিপ্রতিভাকে কাছে টানিয়া পরম বান্ধব করিয়া তুলিয়াছিল। তখন দেখা গেল যে, অন্তরের মতো বাহিরেও কবি ও বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য অতি ঘনিষ্ঠ, একের মন হইতে অপরের মনে এক ধাপের ব্যবধান। অন্তরে বাহিরে কবি ও বিজ্ঞানী প্রতিবেশী।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যের একজন প্রধান লেখক, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা এই যে তিনি এখন নামে মাত্র পরিচিত। এমন ঘটিবার আসল কারণ নিজের রচনা তৎপরতার সহিত পাঠকের কাছে উপস্থিত করিবার দিকে তাঁহার তাগিদ ছিল না। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবার ফলেই তিনি বিস্মৃতপ্রায়, অথচ বিষয়ের গাম্ভীর্যে, দৃষ্টির অভিনবত্বে ও রচনারীতির স্বকীয়তায় বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট। তাঁহার গদ্যরীতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রভাব কাটাইয়া নিজস্ব পথ করিয়া লইয়াছে। সাধুভাষার সহিত, খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সহিত, বাংলার নিজস্ব 'ইডিয়ম'গুলিকে এমন সুনিপুণ ভাবে মিলাইয়া লইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ব্যতীত আর কাহাকেও তো দেখি না। আবার যখন চিন্তা করি যে, তাঁহার রচনার বিষয় সাধারণতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

দর্শনশাস্ত্র, তখন ভাষার এই 'গুরুচণ্ডালী' মিশ্রণ দেখিয়া তাঁহার সাহসে অভিভূত হইতে হয়। বাংলা ভাষার নিতান্ত ঘরোয়া ইডিয়মগুলি যে দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচনে এমন করিয়া কাজে লাগিতে পারে তাহা কে জানিত। এই ঘরোয়া ইডিয়মগুলি মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় ভাষার জোর বাড়িয়া গিয়া বাংলা ভাষার শক্তির প্রতি পাঠককে অবহিত করে। 'সাধনা: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু অতীব দুরূহ। এই দুরূহ কাজে তিনি নিম্নলিখিত শব্দ ও ইডিয়মগুলি কেমন অনায়াসে ব্যবহার করিয়াছেন— কড়াক্কড়, বজ্রের বাঁধন ফস্কা গিঁরে, শক্তাশক্তি, রোজাকে দিয়ে ভূত ছাড়ানো, বীজবুনানি, গলাধাক্কা, যে কে সেই, বাপান্ত। আবার প্রয়োজন হইলে দু-চারটে ইংরাজি শব্দকেও প্রসন্ন মনে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দ-প্রয়োগে তিনি জাতিভেদ মানেন নাই।

বাংলা গদ্যরীতি-সৃষ্টির প্রথম হইতেই নানা বিরুদ্ধ উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার একটি প্রবণতা দেখা যায়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখক এই প্রবণতাকে তুষ্ট করিয়া সার্থকতার দিকে চালিত করিয়াছেন, ইহাই যদি বাংলা গদ্যরীতির অভিপ্রায় ও আদর্শ হয় তবে শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্যই অন্যতম। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায়ের গদ্যরীতির আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাংলা সাধুগদ্যের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিশাইয়াছেন বাংলা সাধারণ গ্রাম্য শব্দ ও ইডিয়ম, আর যোগেশচন্দ্র মিশাইয়াছেন পশ্চিম-রাঢ়ের নিজস্ব অনেক শব্দ ও ইডিয়ম। এই মিশ্রণের ফলে তাঁহার রচনারীতিতে একপ্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক শব্দ ও ইডিয়মগুলিও যে বাংলা গদ্যের শক্তি বর্ধন করিতে পারে, বাংলা সাহিত্যের আসরে সম্মানের আসনে বসিতে পারে, যোগেশচন্দ্রের গদ্যরীতি তাহার প্রমাণ। এই প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক ছিল। প্রধানতঃ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ভাষার সহিত সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া বাংলা গদ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, এই মিশ্রণে ঐশ্বর্য ও শক্তি যতই থাক্-না কেন, বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। বাংলার আঞ্চলিক ইডিয়ম ও শব্দগুলি সেই বৈচিত্র্যের অভাব দূর করিতে পারে। যোগেশচন্দ্র সেই পথ দেখাইয়াছেন। এখন বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দকুশলী সাহিত্যিকগণ অনায়াসে সেই পথ প্রশস্ততর করিতে পারেন।

এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যাইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্তমান ভারতীয় সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আইডিয়া-মিশ্রণের ফলে গড়িয়া উঠে, তাঁহার মতে এই বিষয়ের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। "ইউরোপীয় জাতিদিগের যতকিছু মহত্ত্বের সাধনা সমস্তই

প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা ; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন ... করিলেন।" তাঁহার কথা যে কত সত্য বাংলা সাহিত্য তাহার প্রমাণ। বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরানী পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ও ভারতীয় নিষ্কাম সাধনার মিশ্র উপাদানে রচিত। রবীন্দ্রসাহিত্য গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ভাবে সেই ধারাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

যোগেশচন্দ্র 'গল্প' প্রবন্ধটিতে গল্পের আভিধানিক ও সাহিত্যিক ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রাচীন ও অর্বাচীন গল্পের আদর্শে প্রভেদ দেখাইয়াছেন। তার পরে বাংলাদেশে মুখে মুখে যে-সব 'শোলোক' প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা সারিয়া আধুনিক বাংলা গল্প (ছোটোগল্প ও উপন্যাস) সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন।

পরাধীন জাতিকে অনেক প্রকার দণ্ড দিতে হয়, তার মধ্যে প্রধান একটি এই যে, যে-সব লোক বিধাতৃপ্রদত্ত বিশেষ প্রকার শক্তি বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, শক্তির মুখ্যক্ষেত্রে তাঁহারা কার্য করিবার সুযোগ পান না। গৌণ ক্ষেত্রে কাজ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের জীবনের সোনার ফসল বহুল পরিমাণে অফলা থাকিয়া যায়। আমাদের এই মন্তব্যের অন্যতম প্রধান নিদর্শন বিপিনচন্দ্র পাল। এমন মনীষা লইয়া এ যুগে অল্প লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে মনীষা সাহিত্যক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে সোনার ফসল ফলাইতে পারিত, তাহার অধিকাংশই নিয়োজিত হইয়াছে পলিটিক্‌সে, তিনি সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া রাজনীতি চর্চা করিবার ফলে দেশ স্থায়ী সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহা পরাধীনতার দণ্ড ছাড়া আর কি! 'বঙ্কিম-সাহিত্য' প্রবন্ধটি তাঁহার সাহিত্যবিশ্লেষণক্ষমতার একটি আশ্চর্য নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা কম হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশই সাহিত্যেতর আলোচনা। স্বল্প যে-কয়েকটি রচনায় বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এটি তাহাদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী যে thesis উপস্থাপিত করিয়াছে, বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল তাহারই antithesis, আর, আনন্দমঠ দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম এই দুইয়ের synthesis। এত সহজে বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্যসাধনার মূলকথা যিনি প্রকাশ করিতে পারেন তাঁহার মনীষায় অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। বাঙালী-সমাজের উপরে বঙ্কিমের সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাকে চরম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। "এক দিকে আনন্দমঠ একটা

অতি প্রবল স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়া দেয়। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে এই স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বকল্যাণ-কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আপনার সফলতা কিছুতেই আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য কুশলতাসহকারে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমন্বয় এখনও দেশ ভালো করিয়া ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যতদিন না বাঙালী স্বদেশপ্রীতির পথে আধুনিক যুগের উপযোগী কর্মযোগ-সাধনের এই সংকেতটি ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবে, ততদিন সে নিজের সভ্যতা এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বর্তমান যুগের বিশ্বধর্মকে আপনার সাধনা এবং সিদ্ধি দ্বারা ফুটাইয়াও তুলিতে পারিবে না। এখনও বাঙালী সে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আর যতদিন তাহা না হইয়াছে ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য শক্তি বাঙালীদিগের মধ্যে সজীব থাকিবেই থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি লইয়া যেমন আলোচনা হইয়াছে, দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রবন্ধ লইয়া তেমন হয় নাই। অথচ তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যের পরিমাণ বিপুল। তাঁহার রচিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের পরিমাণ খুব সম্ভব তাঁহার কাব্য নাটক ও উপন্যাসের চেয়ে কম নয়। শুধু পরিমাণ নয়, তাঁহার প্রবন্ধের শ্রেণীবৈচিত্র্যও বড়ো সামান্য নয়। ধর্ম রাজনীতি সমাজতত্ত্ব ইতিহাস সাহিত্য ভাষাতত্ত্ব— এমন বিষয় নাই যে বিষয়ে তিনি কিছু চিন্তা করেন নাই। বিবিধ সৌন্দর্যে ও গভীর মনস্বিতায়-পূর্ণ সাহিত্য রূপে তাহার বিচার করিতে হইবে। এ-সব প্রবন্ধ ক্রান্তদর্শী কবির কলমে লিখিত, সৌন্দর্যদর্শনের তৃতীয়নয়ন-বিশিষ্ট কবির কলমে লিখিত। ইহাতেই তাহাদের যথার্থ মূল্য। সাধারণ তথ্যবেত্তা প্রাবন্ধিক পদাতিক, সে বেচারা পায়ে পায়ে হাঁটিয়া বহু পরিশ্রমে যেখানে পৌছায় দৈবী কল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সেখানে এক পদক্ষেপে পৌছান। দু জনই এক লক্ষ্যে পৌছান, কিন্তু দুই পথে। একজনের পথ তথ্য ও যুক্তি, অপরের পথ কল্পনা ও সহৃদয়তা। এক জনে প্রাবন্ধিক, অপরে প্রাবন্ধিক হইলেও কবি।

যে-সব প্রবন্ধে লেখক আত্মন্যাস করেন, যেখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর গৌরব অধিক, ইংরাজিতে যাহাকে personal essay বলা হয়— রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ এবং সংকলিত 'আষাঢ়' প্রভৃতি সেই শ্রেণীর রচনা। আবার শান্তি-নিকেতন গ্রন্থে সঞ্চিত তাঁহার রচনাগুলিও এই-শ্রেণী-ভুক্ত। এগুলি অধ্যাত্মতত্ত্ব

হইলেও, এ-সব তত্ত্ব অনুভূতির দ্বারা লব্ধ বলিয়া এখানে তাত্ত্বিকের উপরে কবির জিত।

যে-সব গুণের জন্য রচনাকে আমরা সাহিত্য মনে করি, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মনে করি; সে-সব গুণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মতো রাজনীতি সমাজনীতি ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের রচনাতেও সুপ্রচুর। আরও একটি কথা। প্রজ্ঞা দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা সুদুর্লভ, রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী, কোনো কোনো শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে পুস্তকের ভূমিকা। এই প্রবন্ধে প্রজ্ঞা দ্বারা সত্য আবিষ্কারের রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনকালে এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল ছিল, ক্রমে সেটা শৈব প্রভাবে পরিণত হইয়াছে, বুদ্ধ কখন অজ্ঞাতসারে শিবে পরিণত হইয়াছেন, তার পরে দেখা দিল শাক্ত যুগ, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাবেরই জয় হইয়াছে। "ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে যথার্থ ভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্ত যুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানা ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল; বৈষ্ণব যুগে অযাচিত ঐশ্বর্য-লাভে সে আশ্চর্য রূপে চরিতার্থ হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এই-যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু এ সত্য প্রজ্ঞা-দ্বারা লব্ধ। বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটি খসড়া আঁকিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের কাজ নানারূপ তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এখন সেই কাজ করিতেছেন। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটিতেও কবিদৃষ্টির বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাই। পুরাতন ভারতীয় সভ্যতা নূতনের সংঘাতে আপনাকে বিব্রত বোধ করিতেছে। এখন তাহার সম্মুখে দুইটি রাস্তা খোলা। পুরাতনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যু, অথবা নূতনকে আত্মস্থ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া ওঠা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে শেষোক্ত পন্থাটি গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা, কাজেই ইহার মধ্যে সাহিত্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহার চূড়ান্ত ধারণা আছে মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, মানুষের মধ্যে একটি 'বড়ো আমি' ও একটি 'ছোটো আমি' পাশাপাশি বিদ্যমান। 'বড়ো আমি'র কলম হইতে যাহা বাহির হয় তাহাই সত্যকার সাহিত্য, কিন্তু বিপদ বাধে 'ছোটো আমি'কে লইয়া। মানুষের 'ছোটো আমি'টাও মাঝে মাঝে কলম চালায়, অনভ্যস্তের চোখে দুই কলমের লেখাই এক রকম বোধ হয়; এখানেই সাহিত্যবিচারে সংকটের সূত্রপাত। কেবল বিশেষজ্ঞ রসিকের পক্ষেই দুই আমির রচনায় প্রভেদ করা সম্ভব। 'নরনারী' প্রবন্ধটি পঞ্চভূত গ্রন্থের অংশবিশেষ, রবীন্দ্রনাথ লিখিত সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেকের মতে পঞ্চভূত সব চেয়ে সন্তোষজনক, এই গ্রন্থে এমন একটি পরিপূর্ণতা আছে যাহা অন্যত্র দুর্লভ। পঞ্চভূত নামে পাঁচটি নরনারীর অবতারণা করিয়া, কবির নিজেকে লইয়া ছয় জনে, তিনি দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। কোনো একজন পাত্র পাত্রী একটি প্রসঙ্গ তুলিতেই, অপর পাঁচজনে তাহার উপর পড়িয়া, বালকেরা যেমন কন্দুক লইয়া খেলা করে তেমনি আলাপ-আলোচনার খেলা শুরু করিয়া দেন। এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটা উঠিল বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য লইয়া। কিন্তু তর্ক আরম্ভ হইতেই দেখা গেল, ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ নয়, কাহারও কাহারও মতে প্রাধান্য পুরুষের। ক্রমে বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি ছাড়াইয়া আলোচনাটা নরনারীর শক্তির সীমা ও প্রকৃতির প্রসঙ্গে পৌঁছিল। সংসারে নরনারীর আপেক্ষিক প্রভাব ও গুরুত্বই প্রবন্ধটির যথার্থ আলোচ্য বিষয়। পঞ্চভূত গ্রন্থে অধিকাংশ প্রবন্ধেরই ইহাই ধরণ। প্রাথমিক বিষয়টা অনেক সময়ই মুখ্য বিষয়ে পৌঁছিয়া দিবার উপলক্ষ্য মাত্র। 'আষাঢ়' প্রবন্ধটিও এই ধরণে লিখিত। নবীন আষাঢ়ের বর্ণনায় সূত্রপাত হইয়া প্রবন্ধটি মনুষ্যজীবনের এক রহস্যময় প্রদেশে পদক্ষেপ করিয়াছে। কবি মনে করেন যে কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তির বিকাশ, কিন্তু কর্মহীনতার মধ্যেই বিকাশ মনুষ্যত্বের। আষাঢ় সেই কর্মহীন মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের সংসারের মধ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দকে কেহই সাহিত্যিক বলিয়া দাবি করিবেন না নিশ্চয়ই, তিনি যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। এ-সবই সত্য, কিন্তু তিনি যে অল্প পরিমাণ বাংলা রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই বাংলা গদ্যের একটি নূতন রীতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা যাহাকে কথ্য ভাষা বলি, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় স্বামীজির রচনায়। তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার বাহ্য লক্ষণগুলি নাই, ক্রিয়াপদ পূর্ণাঙ্গ— তৎসত্ত্বেও তাঁহার রচনাকে কথ্য ভাষাই বলিতে হয়। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড বেগ রচনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাতে এমন একটা চাঞ্চল্য দিয়াছে যে তাহাকে সাধুভাষারূপে

কল্পনা করা কঠিন। সাধুভাষা কিছু স্থবির, কথ্য ভাষা কণ্ঠস্বরের ছন্দঃস্পন্দে *স্বভাবতঃই বেগবান। আমাদের মতে ইহাই সাধুভাষা ও কথ্য ভাষার মৌলিক প্রভেদ।* আমাদের অনুমান সত্য হইলে, কথ্য ভাষার বাহ্য লক্ষণের অভাব সত্ত্বেও স্বামীজির বাংলা রচনাকে কথ্য ভাষার উত্তম দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। স্বামীজির 'বর্ত্তমান ভারত' আর রবীন্দ্রনাথের 'নূতন ও পুরাতন' দুইয়েরই বিষয় এক, দুইয়েরই সিদ্ধান্ত এক, বিষয় পুরাতনের সহিত নূতনের সংঘর্ষ। সিদ্ধান্ত, নূতনের সার অংশ গ্রহণ ও পুরাতনের সার অংশ রক্ষার দ্বারা বর্তমান বা নূতন ভারতকে সৃষ্টি করিয়া তোলা। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজি উভয়েই সংঘর্ষকে স্বীকার করিয়াছেন ; নূতনকে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, সেই সঙ্গে ভারতের শাশ্বত অংশকেও রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নির্বিচারে নূতনকে গ্রহণ করিলেও বিপদ, নির্বিচারে পুরাতনকে গ্রহণ করিলেও বিপদ ; এ দুইয়ের সমন্বয়েই কল্যাণময় ভবিষ্যৎ।

অনেক জানিলে তবেই সংক্ষেপে বলা যায়। গভীর ভাবে জানিলে তবেই সরল ভাবে প্রকাশ করা যায়— এই উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধাবলী। সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রাচীন সংস্কৃতি প্রভৃতি দুরূহ ও জটিল বিষয়কে সরলভাবে সংক্ষেপে প্রসাদগুণবিশিষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিতে রামেন্দ্রসুন্দরের জুড়ি নাই বলিলেই হয়। তাঁহার ভাষা নিরলংকার ঋজু ও স্বচ্ছ, 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটিতে সৌন্দর্য কি, মানুষের জীবনাভিব্যক্তিতে কোথায় তাহার স্থান, প্রভৃতি বিষয় বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে তাঁহার সিদ্ধান্ত আটটি সূত্রাকারে নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার চেয়ে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয় বলিয়া বিস্তারিত আলোচনায় ক্ষান্ত হইলাম।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মনীষী ব্যক্তি ছিলেন, নানা বিষয়ে তাঁহার প্রবেশ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুলভ সংবাদিকতাতেই শক্তির অপচয় করিয়াছেন। তাঁহার নাম ও খ্যাতি আজ কিংবদন্তির অন্তর্গত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার মনীষার পরিচয় বহন করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জীবনচরিতের মূলসূত্র' রচনাটি পড়িলে এই মনীষার ও তাঁহার রচনারীতির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্যার সিড্‌নে লী প্রণীত *Principles of Biography* পুস্তক অবলম্বনে জীবনচরিত-রচনার মূলসূত্র তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ইতিহাস ও জীবনচরিতে একটি মূলগত প্রভেদ আছে। ইতিহাসকে বলা যাইতে

পারে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের বিবরণ, জীবনচরিত ব্যক্তিগত বিবরণ। ইতিহাস যেন সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচরিত, আর জীবনচরিত হইতেছে the truthful transmission of personality। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ও ব্যাখ্যা। এই মূলগত প্রভেদ অনেকেই ভুলিয়া যান বলিয়া তাঁহাদের হাতে জীবনচরিত ইতিহাস ও ইতিহাস জীবনচরিত হইয়া ওঠে। বাংলা সাহিত্যে উচ্চাঙ্গ জীবনচরিতের সংখ্যা অতিশয় অল্প। জীবনচরিত-লেখককে ইতিহাসের পটভূমি-বর্ণনায় মনোনিবেশ করিলে চলিবে না, পটভূমিকে খসড়ায় আভাসিত করিয়া তদুপরি ব্যক্তিকে মুখ্যতা দান করিতে হইবে। উচ্চাঙ্গ জীবনচরিত লিখিবার ইহাই রহস্য।

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া, বাংলা সাহিত্যের অনেক অজ্ঞাত বা বিস্মৃতপ্রায় লেখককে শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিয়া বাঙালীর মনঃপ্রকর্ষ-সাধনে ও আত্মমর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবনের আবিষ্কার হইতেছে পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি। এগুলি প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের পূর্বতম জেলাগুলিতে রচিত। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য, শাখার সহিত ইহাদের একটি স্থূল পার্থক্য আছে। মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি হিন্দুসমাজের প্রভাবাধীন, সংস্কৃত অলংকারের প্রভাবও তাহাতে যথেষ্ট, আর এই-সব রচনার লেখকগণও সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি। পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলি পূর্বোক্ত প্রভাব হইতে মুক্ত (যদিচ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কোনো কোনো স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় ; খুব সম্ভব এই প্রভাব রচনাগুলির উপরে পরবর্তীকালে পড়িয়াছে।) কাজেই যখন প্রথম এই গীতিকাগুলি আবিষ্কৃত হইল, বাঙালী পাঠক ইহার নূতন সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের গুণপনা সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের অতিশয়োক্তি স্বীকার না করিয়াও বলা চলে যে, গীতিকাগুলির অনেক পালায় কবিত্ব, কল্পনাশক্তির বিকাশ ও ভাষার সৌন্দর্য আছে ; সর্বোপরি আছে সরল ভাবে গল্প বলিবার অসাধারণ নিপুণতা। আমাদের মনে হয়, এই গাথাগুলি আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমানা বাড়িয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্র রায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লেখক, জয়দেবের কবিত্ব প্রবন্ধটি প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, জয়দেবের গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ 'বহিঃপ্রকৃতিকতা' আর বিদ্যাপতির গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ 'অন্তঃপ্রকৃতিকতা'। জয়দেব নাকি সৌন্দর্যবর্ণনায় বহিঃপ্রকৃতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, আর বিদ্যাপতিতে প্রাধান্য অন্তঃপ্রকৃতির। সতীশচন্দ্র রায় এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, জয়দেব

প্রকৃতিবর্ণনাকে প্রাধান্য দিলেও অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনাই তাঁহার শেষ লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন যে, "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা যে 'বহিরিন্দ্রিয়ের' অতীত 'ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য' এবং 'বিলাসশূন্য' বলিয়া বঙ্কিমবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।" আমাদের মতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এক-শ্রেণীর কবি নহেন। জয়দেবকে বিদ্যাপতির সঙ্গেই এক-শ্রেণী-ভুক্ত করিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে inspiration-এর চেয়ে craftmanship-এর প্রবণতা অধিক। চণ্ডীদাস inspired কবি। জয়দেব ও বিদ্যাপতি সচেতন শিল্পী। যদিচ একজন সংস্কৃত ভাষায় ও অপরজন বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন, তথাপি এই দিক হইতে বিচার করিলে এক-শ্রেণী-ভুক্ত হইবার যোগ্য। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র কাহারও মতকেই সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। 'বহিঃপ্রকৃতিকতা' ও 'অন্তঃপ্রকৃতিকতা'র প্রশ্ন এখানে নিতান্তই গৌণ। দুজনেই এখানে সচেতন ও কৌশলী শিল্পী, ভাষা ও ছন্দের উপরে তাঁহাদের অসাধারণ দখল। তাঁহাদের প্রতিভা, ভাষা ও ছন্দ খেলাইবার প্রতিভা। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের আর একজন জুড়ি ভারতচন্দ্র। আমাদের মনে হয় সাহিত্যবিচারে (যাঁহারা গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলীকে ধর্মশাস্ত্র মনে করেন তাঁহাদের কথা আলাদা, এখানে আমরা সাহিত্যবিচার করিতেছি, শাস্ত্রবিচার করিতেছি না) নামিলে এইভাবেই তাঁহাদের কাব্যের আলোচনা হওয়া উচিত। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে লিখিত সাহিত্যের ইঁহারাই তিনজন শ্রেষ্ঠ সচেতন শিল্পী।

আদর্শ গদ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, ও যেন শিক্ষিত মার্জিতরুচি সমধর্মী বন্ধুগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মতো; তাহাতে উত্তেজনা নাই, ওজস্বিতা নাই, উচ্চকণ্ঠে বাগ্‌বিস্তারের প্রবণতা নাই— আছে ধীর-ভাবে, মৃদুস্বরে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান। ইহাকে আদর্শ গদ্যের রীতি মনে করিলে প্রমথ চৌধুরীকে সেই আদর্শ গদ্যের লেখক বলা যাইতে পারে। তাঁহার সমস্ত রচনার সুর খাদে বাঁধা, নিখাদ কখনও কোথাও ধ্বনিত হইয়াছে মনে পড়ে না। এ একটি মহৎ গুণ, আর খুব সম্ভব ইহার মূলে আছে তাঁহার মনের উপরে ফরাসী গদ্যের প্রভাব। বাঙালী প্রায় সমস্ত গদ্যলেখকের মন ইংরাজি গদ্যের প্রভাবে গঠিত। বোধ করি প্রমথ চৌধুরী এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। ফরাসী সাহিত্যে যে গুণ 'good taste' নামে পরিচিত প্রমথবাবুতে তাহা পাই। প্রমথবাবুর গদ্য-রীতিকে কথ্য ভাষা বলিলে যথেষ্ট হয় না, কারণ কথ্য ভাষাতেও শ্রেণীভেদ আছে। প্রমথবাবুর গদ্য শিক্ষিত মার্জিতরুচি সংস্কৃতিমান ব্যক্তিগণের আলাপ-আলোচনার কথ্য ভাষা। 'সবুজ পত্র' নামে পত্রিকা পরিচালনা করিয়া এই রীতিকে তিনি প্রচার

করিয়াছেন। আর শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও আরও পরবর্তী অনেক লেখকের মধ্যে এই রীতি স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। সাহিত্যিকের জীবন ও কীর্তি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে কিভাবে প্রকাশ করিতে হয় তাহার আদর্শ 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটি। ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বিলাসের কাব্য আখ্যা দিয়া যাঁহারা ভারতচন্দ্রের জীবনকেও বিলাসীর জীবন মনে করেন, এই প্রবন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হইবে। প্রমথ চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের জীবন দুঃখের জীবন ছিল, কিন্তু সে দুঃখ যদি তাঁহার কাব্যকে ক্লিষ্ট না করিয়া থাকে তবে তাহার একমাত্র কারণ বাস্তব জীবনের দুঃখের প্রভাবে তাঁহার মনের হাসি কখনও ম্লান হয় নাই। প্রমথ চৌধুরীর মতে ভারত-চন্দ্রের কাব্যের প্রধান রস হাস্যরস। এ বিষয়ে সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু কথাটি প্রণিধানযোগ্য।

বলেন্দ্রনাথের প্রধান ঐশ্বর্য তাঁহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা। ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাহিরে বড়ো একটা চোখে পড়ে না। শব্দাঢ্য বর্ণাঢ্য অলং-কৃত উপমাবহুল ভাষার কি চতুরঙ্গ ঐশ্বর্য। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা, ভাবপ্রকাশের একটা উপায় মাত্র। ভাবের তল্পি বহিয়া পীড়িত ও নিঃস্ব ভাষা তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র, তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বলেন্দ্র-নাথের ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিবিভূষিত, নানা-চিত্রাদি-সুশোভিত, কারুকার্যের মহিমায় উজ্জ্বল শিবিকার মতো; আর সেই শিবিকার বাহকদেরই বা কি সাবলীল গতি, সৌকণ্ঠও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তো অনবদ্যরূপা, কিন্তু তাহার শিবিকাখানিও তুচ্ছ নহে। শিবিকার তিরস্করণীর অন্তরাল-বর্তিনীর মূর্তি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়— বাস্তবিক, বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতোই। কণারকের মন্দিরের মতোই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতোই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ্য মদনোৎসবের অভ্যন্তরে যেমন সুকঠিন বৈরাগ্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের লীলাস্থল, শিল্পীর ইন্দ্রিয়বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র বাহিরে এমন ভাষা আর অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মতোই নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত। ভাষার এমন ছন্দঃস্পন্দ, এমন স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমা বাংলা সাহিত্য হইতে যেন লোপ পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান

যেন অনেক পরিমাণে ইতর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষা যে ইতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর 'প্রেমিকের দৃষ্টি' নাই। *নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভাষাকে দেখিয়া থাকেন। এখন বাংলা* ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে, নমনীয়তাও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, তাহা কি লোপ পায় নাই? ভাষার রাজকীয়তা আর নাই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম. এল. এ.'র স্তরে, বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্ত্র মাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। হয়তো কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সহিত রাজকীয় ভাষাও গিয়াছে। বহুজনের আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; তাহাতে পুরাতন ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের কিছু সংকোচ অপরিহার্য। বলেন্দ্রনাথের ভাষার 'রাজবদুন্নতধ্বনি' ছন্দঃস্পন্দকে বর্তমানের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ স্বভাবতঃই কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখিতে থাকেন। বলেন্দ্রনাথের ভাষার সেই ধ্বনি আর ফিরিবে না। কিন্তু লোপও পাইবে না। কণারকের মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না সত্য, কিন্তু সে ভগ্নাবশেষ যে অবলুপ্ত হইবে এমন সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বালুশয্যা অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভা সৌন্দর্য দেখিতে যাইবে; বলেন্দ্রনাথের ভাষার ঐশ্বর্য ভোগ করিবারও লোকের অভাব হইবে না।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া লেখক। বাংলা সাহিত্যের অনেক অনুজ লেখককে রবীন্দ্রনাথ গড়িয়া-পিটিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন। কিন্তু এত যত্ন, এত পরিচর্যা বোধ হয় আর কোনো লেখকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। ইহারই ফলে অতি অল্পবয়সে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনারীতি পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার চিন্তাও গভীরতা লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁহার রচনায় আছে, কিন্তু তাহার স্বকীয়তাও অত্যন্ত স্পষ্ট। অলংকরণ, আভিজাত্য, শব্দচয়ননিপুণতা ও প্রসাদগুণ মিলিয়া তাঁহার রচনায় একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কণারক প্রবন্ধটিতে এই-সব গুণের সুষ্ঠু সমাবেশ দেখা যাইবে। তাঁহার কণারক ও তৎশ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধ বাংলা ভাষার মণ্ডনশিল্পের অতিশ্রেষ্ঠ উদাহরণ; বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার বাহিরে ইহাদের জুড়ি মেলা সহজ নয়।

নব্যভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল শিল্পীগুরু নন, তিনি বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীও। তাঁহার রচিত, রাজকাহিনী নালক ঘরোয়া

জোড়াসাঁকোর ধারে প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বর্তমান প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে তিনি যে-সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাদের অন্তর্গত। 'শিল্প ও দেহতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে আসিয়া বস্তু কি ভাবে রূপান্তর গ্রহণ করে। মুখ্যতঃ মানবদেহের অ্যানাটমির দৃষ্টান্ত লইলেও, তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বাস্তবের একটি গাছে আর শিল্পীর অঙ্কিত একটি গাছে প্রভেদ থাকে। ঐ প্রভেদটুকুই শিল্পীর দান। ঐ প্রভেদের উৎকর্ষেই শিল্পীর প্রতিভার পরিচয়। ইতিহাসের ঘটনাকে লইয়া ঐতিহাসিকের কাজ, কিন্তু সেই ঘটনা ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ লাভ করে। ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক-উপন্যাসকর এক বস্তু লইয়া কারবার করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য এক নয়, পথও ভিন্ন, সেই জন্যই রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যদেহের অ্যানাটমি যথাযথ আঁকিতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য, কিন্তু শিল্পীর সেরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। তাঁহার হাতে অ্যানাটমি পরিণত হয় 'আর্টিস্টিক অ্যানাটমি'তে। অ্যানাটমি ও আর্টিস্টিক অ্যানাটমি ঠিক এক নয়, অথচ ভিন্নও নয়। এই যে একটুখানি রূপান্তর ঘটে তাহাই শিল্পীর দান, তাহাতেই শিল্পীর প্রতিভা, তাহাতেই বস্তু শিল্প হইয়া ওঠে। বস্তুর শিল্পে রূপান্তর-রহস্য সম্বন্ধে এই প্রাথমিক তত্ত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ 'শিল্প ও দেহতত্ত্ব' প্রবন্ধে।

রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার রসরচনা প্রবন্ধাবলীর চেয়ে অধিকতর পরিচিত। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে মনের আরেকটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয় আছে 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধে। তিনি বলিতে চান যে, কেবল বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অত্যাবশ্যক নয়, সকলের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। আমরা অনেক সময় সত্যকে যাচাই না করিয়াই গ্রহণ করি, ইহা নিতান্তই অ-বৈজ্ঞানিক প্রবণতা। সংসারের নিত্য কাজের জন্যও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ অত্যাবশ্যক এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগেই "ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে" বলিয়া তিনি মনে করেন।

'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' প্রবন্ধে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ কালিদাসের কাব্যের, সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সম্বন্ধটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সম্বন্ধ সেই শ্রেণীর— প্রথম প্রভাবজাত, দ্বিতীয় সমস্তরের প্রতিভা-জাত। রবীন্দ্রকাব্য প্রভূতভাবে কালিদাসের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস সমপর্যায়ের

প্রতিভা ও দৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই স্বভাবতঃই তাঁহাদের কাব্যের শিল্পকলায় ও কবিদৃষ্টিতে সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকে অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই এই গুরুতর বিষয়টি লইয়া আলোচনা করেন নাই। এই জন্যই এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করি।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে মোহিতলাল মজুমদার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মোহিতলালের একটি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, সেই দৃষ্টিক্ষেত্র যথেষ্ট প্রশস্ত না হইলেও তাঁহার মনীষায় উজ্জ্বল। তাঁহার মতামত অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য— কিন্তু সকলে সমান প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, বাঙালী-সমাজে ও বাঙালী-মনে একটি শুভ যুগান্তরের উদয় হওয়াতেই মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে এই শুভ যুগের মধ্যে আত্মসর্বস্বতা ও বস্তুসর্বস্বতা প্রবল হইয়া উঠিয়া বাঙালীর সমাজ ও মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার ফলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে। মোহিতবাবু যে সময়ের কথা বলিতেছেন, আমরা এখনও সেই সময়ের সন্নিকটে আছি, কাজেই তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়— ভবিষ্যৎকাল তাহার বিচার করিবে।

বর্তমান গ্রন্থে যে-সব প্রবন্ধ সংকলিত হইল, তাহার পাঠে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর মানসিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ অবস্থা, বাঙালী মনীষীগণের মনে যে দিগ্‌দর্শন দিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রারম্ভে দিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, বাঙালী-সমাজ একটা high seriousness মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিল, সেই সঙ্গে একটা sense of destiny-ও বটে। প্রথম ভাবটি তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহস জোগাইয়াছে, দ্বিতীয় ভাবটি নব্যভারতগঠনে তাহাকে উৎসাহিত ও চালিত করিয়াছে। এই দুই ভাবের প্রথম সূত্রপাত সাহিত্যে হইলেও স্বভাবতঃই ইহার সীমানা সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সেই ক্ষেত্রান্তরের সীমানায় আসিয়া আমরা থামিতে বাধ্য হইলাম।

বলা প্রয়োজন, আমার কোনো কোনো পূর্বরচনার কতকগুলি অংশ এই ভূমিকার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ-সংকলনে শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার সাহা নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। সর্বোপরি বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগের নিকট আমরা ঋণী। তাঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সূচীপত্র

হিমাচল-ভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি সিমলাতে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরীনাথ চাটুয্যেকে বলিলাম, "আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক্ করিয়া রাখ।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ[১] দিবস সিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা[২] সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, "তোমার ঘোড়া কোথায়?" "এই এলো বো'লে, এই এলো বো'লে" বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব আর সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।" আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, "ঝাঁপান উঠাও।" ঝাঁপান উঠিল, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল, হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আনন্দে, উৎসাহে, বাজার দেখিতে দেখিতে সিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমার কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কানিশ দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিশের উপরে একটি মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ। ঈশ্বরপ্রসাদে আমি তাহা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে যথার্থই— পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।[৩] আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না।

তথা হইতে ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্ব্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু[৪] গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল। সোজা খাড়া পর্ব্বত, নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কট পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থশালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেইখানেই অবস্থিতি করিলাম।

আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হম্ লোগকা রোটী বড়া মিঠা হ্যায়।" আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মক্কা-যব-মিশ্রিত একখানা রুটী লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল। রুখা সুখা গ.ম্কা টুকড়া, লোনা অওর্ অলোনা ক্যা? সির্ দিয়া তো রোনা ক্যা?[৫] খানিক পরে কতকগুলা পাহাড়িয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল, এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের একজনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চেপ্‌টা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমহারে মুখমেঁ ইয়ে ক্যা হুয়া?" সে বলিল, "আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল।" আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে গিয়া সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে।" সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ! আমি সেই পাহাড়ীদের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্নে একটা পর্ব্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলা লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময় শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।" সেই পর্ব্বতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপনার কষ্ট হইবে।" আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদণ্ডীর[৬] পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়; আমার যাইবার উৎসাহ সত্ত্বেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না।

তাহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পাণ্ডবদের মত তাহারা সকল

ভাই মিলে একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে।

আমি সেদিন সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।" এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের পথ, কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, ঊর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথসঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এক-জন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিনঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটী দুগ্ধ আনিল। কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুগ্ধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না।

প্রাতে শরীরে একটু বল আইল, ঝাঁপানীরা এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া সেই দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পরদিন[৭] প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে। অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ এক-প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা

হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।

হরগিজ.ম্ মেহ্‌রে তো অজ্. লওহে দিল্ ও জাঁ ন-রবদ্।

...

আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্ ও জাঁ জায়ে গিরিফ্.ৎ,
কে গর্ অম সর্ বে-রবদ্, মেহ্‌রে তো অজ্. জাঁ ন-রবদ্।
—দীবান্-হাফিজ্., ২৬৬।১,২

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য-অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুজ্ঘ্রীনামক পর্ব্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলাম[৮]। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান।

কোন পর্ব্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র-দ্বারা-স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত আপাদমস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য্য-অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তখনো আমি সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্যবসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায়, অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখা সকল শীতকালে বহু তুষারভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরো সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আলকাতরা[৯] জন্মে।

কতকদূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার-পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি[১০] চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল, এবং বলিল যে, "ইস্‌সে দুধ মিলেগা।" আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র

দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। সঁভ্না জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈঁ বিসর ন জাই,[১১] সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্ব্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। *মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য* কর্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবীফল-প্রত্যাশায় হল বহন-দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালিনামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুজ্ঘ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্ব্বতের তলে "নগরী" নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য-পর্ব্বত-তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্যপত্রের ন্যায় সূর্য্যকিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। এই শতদ্রুনদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে; তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহুপথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী সোহিনী হইয়া, তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গতকল্য সুজ্ঘ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও[১২] তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্নে নগরীনদী-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহাবেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায়তুল্য প্রস্তরখণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেণময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ-করতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্রসমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পরপারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকাভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ-মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে

স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে, সে পর্ব্বতের গহ্বর ; সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর-একটি ছেলে পর্ব্বতের উপরে সঙ্কটস্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ; তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তিসুখ দুর্ল্লভ।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্", পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষসকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনই তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, এবং উৎসবরজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুপ্রহরের সময় 'দারুণ ঘাট'-নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে[১৩] দারুণ ঘাটে

উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষারবর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসের তুষারবর্ষণ সিমলাবাসিদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু চৈত্র মাস না শেষ হইতে হইতেই সিমলা-পর্ব্বত তুষারজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করে।

২রা আষাঢ়ে এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন-নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখনো কখনো শীতল বায়ু-সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বততলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয়; পর্ব্বতচূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ়ে[১৪] ঈশ্বরপ্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমার সিমলার প্রবাস-ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম।

কিশোরী দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালী হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না। যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম, এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অনুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে, আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে, তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, "আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে, দরজা সব বন্ধ। আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাক্স পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছি।" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। যদি আমি তিন দিন পূর্ব্বে এখানে আসিতাম, তবে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হইত।

এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বতভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের

কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাসসুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম। ✓

খ্রী. ১৮৯৮

১ ৬ জুন ১৮৫৭।

২ ভারবাহী কুলীরা।

৩ শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকার মঙ্গলাচরণে আছে—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌॥

এখানে দেবেন্দ্রনাথ নিজের বাক্যের সহিত মিল রাখিবার জন্য কর্তৃকারক 'পঙ্গুঃ' লিখিয়াছেন।

৪ পাইন (pine) গাছ।

৫ হিন্দী প্রবচন। রূখা সূখা=রুক্ষ, শুষ্ক, অর্থাৎ ঘৃতলেশবর্জ্জিত। গ.ম্=কষ্ট। গ.ম্‌কা টুক্‌ড়া= কষ্টে লব্ধ রুটীর টুকরা। লোনা, অলোনা=লবণযুক্ত, লবণহীন। সির্ দিয়া=মস্তক দিয়াছি, অর্থাৎ জীবন দিয়াছি। প্রিয়তমের জন্য যে (ফকীর) প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, সে কাঁদিবে কেন? তাহার যেমন আহারই জুটুক, সে বিষয়ে সে বিচার করিবে কেন?

৬ হিন্দী 'পগ্‌দণ্ডী', অর্থাৎ পদরেখা; পায়ে পায়ে চলিয়া যে পথ হইয়া যায়।

৭ ১১ জুন ১৮৫৭।

৮ দেবেন্দ্রনাথের পত্র হইতে জানা যায় যে, সিমলা হইতে নারকাণ্ডা প্রায় ২০ ক্রোশ; এবং নারকাণ্ডা হইতে সুঙ্‌গ্রী ১২ ক্রোশ। সুঙ্‌গ্রীতেই আরোহণ শেষ হইল, ইহার পরে অবরোহণ।

৯ পাইন গাছ হইতে ধুনা ও তার্পিন জন্মে; আলকাতরা নহে।

১০ ছাগল ও ভেড়া।

১১ জপজী সাহিব, পোড়ী ৫, ৬, ৭। মূলের পাঠ 'একো দাতা'।

১২ ১৩ জুন ১৮৫৭।

১৩ ১৪ জুন ১৮৫৭।

১৪ ২৬ জুন ১৮৫৭।

আত্মচরিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার পাঠশালার ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল; কিন্তু, একবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। পাতুলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম। এবং পুনরায়, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্ব্বে, একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।

—শাকে, কার্ত্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত

হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও, আবশ্যক হয় নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে, সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেতসম্পাদনের জন্য, না করিতে পারিতেন, এমন কর্ম্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেন, যে, তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্ব্বদা, সর্ব্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। এক দিন, তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় ও স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি

গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট-চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান্, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া, তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল

সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামী পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, বটে ; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে পিতামহদেবসংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূল বৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজার-নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্ত্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন ; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদামহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে বড়দিদি ও ছোটদিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের

জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছু দিন, তাঁহার জন্য, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতি জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদদার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্ম্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন।

কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। ঐ পল্লীতে দুর্গাদাস কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন। রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎ ক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সে দিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর-নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে, আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে

আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব—এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক্‌, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড়প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে পিতৃদেব মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম।

কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম; বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎ পরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপ ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, এক দিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরু-মহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া "বেস বাবা বেস" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পিতৃ-দেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমা-খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য-বশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমায় ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত

কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে ; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

খ্রী. ১৮৯১

পাশ্চাত্যভাব

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ঐহিকতা

অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার-শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটীকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেই মাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়াছিল, সে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটীকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল যে, টিয়াটী পোষা। সে একটী শিশ দিল, শিকরে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপরে আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল— কে বলিবে যে এই শিকরে সেই শিকরে।

বাল্যকালের ঐ অদ্ভুতদর্শন চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কখন অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণসন্তানের হৃদয়ে এই বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জর্ম্মণদেশীয় রিথ্‌টর-নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তার শ্যেন পক্ষীর শিকার সম্বন্ধীয় উপমাটী বড়ই মিষ্ট লাগিল এবং প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসাও সেই উপমাটির বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিথ্‌টর বলেন, শ্যেন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রে শিকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার ইঙ্গিতমাত্রে ফিরিয়া আইসে, মনুষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্তমনে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পন্ন করিবে, আবার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। সমুদয় আর্য্যশাস্ত্রের শাসনও ঐরূপ। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ। ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েই সামঞ্জস্যবিধান হইয়া দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্য্য, এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ"।

কিন্তু শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আমাদিগের দেশে কতকটা ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্তির পথ দুইটীকে মিলাইয়া যে উভয়লোকহিতকরী ব্যবহারপদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকরী তাহা একেবারে বিস্মৃত হওয়া হইয়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, যাহারা প্রবৃত্তির পথে যাইতেছে, তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহারা নিবৃত্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারাও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটী পা স্থির থাকে, অপরটী অগ্রসর হয়, আবার সেইটী স্থির হয়, পূর্ব্বেরটী অগ্রবর্ত্তী হয়। অতএব গমনরূপ একটী কার্য্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটীই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তিপ্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তিপ্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চরিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্তপ্রবহণ ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসারণ রূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন-রক্ষাও ঐ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই দুইটী পরস্পরবিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের প্রভাবে পরমাণু-সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত-আকাশ-পরিব্যাপ্ত হইত, আবার বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যেরই বিস্তৃতি সম্ভবে না, সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপবিহীন হইয়া পড়ে। অতএব দুইটী বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগপৎ অবস্থানই জগতে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র শক্তির কার্য্য কোথাও স্থূলদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় না।

কিন্তু ব্যষ্টীভূত জগতের নিয়ম এইরূপ হইলেও, শাস্ত্রকারেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধ্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির বলই অধিক। ভগবান ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন।[১] সেই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবলা— নিবৃত্তি দুর্ব্বলা। শাস্ত্রকারেরা

উহাদিগের সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশে যেটি দুর্ব্বলা, উপদেশাদি-দ্বারা সেইটীর সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিবৃত্তি-পক্ষের শিক্ষাদানে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানেই পটু। এরূপ ভ্রমানুমানের আরও একটী কারণ আছে। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যথা ভগবান্ শঙ্করস্বামী, নিবৃত্তিমার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ করিয়াই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর ভেদবিচার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতাপ্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের শুভসাধিনী— শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতিসাধিনী নহে।

কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্র শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইতে পারে না। কোন সুদূরদর্শী শাস্ত্রকারের চক্ষে পারলৌকিক সুখসমৃদ্ধি, ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ-নরকাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া "ইহৈব নরকং স্বর্গঃ" এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও সংসার-মধ্যেই পূর্ব্বলোক, বর্ত্তমান-লোক এবং পরলোক তিনটি লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পূর্ব্বগত পুরুষেরা আমাদিগের পূর্ব্বলোক, আমরা বর্ত্তমান-লোক, এবং আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা পরলোক। যদি বর্ত্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক গুণে উৎকৃষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষেরা বর্ত্তমান-লোকদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিবেন না।

ফলতঃ পরোক্ষপ্রিয়, দেবস্বভাব আর্য্যশাস্ত্র, বর্ত্তমান-লোককে ভাবী বা পরলোকের সাক্ষাৎকারণ-স্বরূপ জানিয়া এবং সেই পরলোকের প্রতি বিশিষ্টরূপে স্নেহবান হইয়া তাহারই হিতার্থে সমুদয় কার্য্য-নির্ব্বাহের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শম-দম-যমাদির উপদেশ পরোক্ষদৃষ্টিমূলক, কিন্তু উহা ইহলোকেরও হিতসাধক। উহাদিগের উপদেশে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া আছে।

তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবাসী কিম্বা চীনদেশবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কথাবার্ত্তার সহিত ইউরোপীয় জাতীয় লোকের ব্যবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া দেখিলে ইউরোপীয়েরা যে সত্যসত্যই পরকালে বিশ্বাস করেন, তাহা বোধই হয় না। তাঁহাদিগের মধ্যে চিরকালাবধি ঐহিকতার প্রাবল্য;

আজি কালি উহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন উঁহাদিগের মধ্যে যে মতবাদ সাধারণে পরিগৃহীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সারভাগ এই—

সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখপ্রাপ্তির কাল বর্ত্তমান। সুখপ্রাপ্তির স্থান এই পৃথিবী।[২]

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে অবিকল ঐরূপ ঐহিকতা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছিল। চার্ব্বাক বা লোকায়তিক মতের সারাংশ সংগৃহীত হইয়া উক্ত হইয়াছে—

স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মাও নাই।

যতদিন বাঁচিবে সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে। শরীরটা পুড়িয়া ভস্ম হইলে উহার আর প্রত্যাগমন কোথায়?[৩]

অতএব ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যভাবের অবয়বীভূত ঐহিকতার প্রবেশে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখনকার ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ-সংসর্গ পূর্ব্বকালের সেই লোকায়তিক মতবাদের পুনঃ প্রাবল্যসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবে যতগুলি ব্যাপার সংস্কারকার্য্য বলিয়া উল্লিখিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটীও মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধির অনুকূল নহে। সকলগুলিই অত্যধিক পাশবভাবের অনুকূল, একটীও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটীও ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধের পক্ষ নহে। সকলগুলিই ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদক।

একজন অতি প্রধান মুসলমান মৌলবীর সহিত কথোপকথন-কালে তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজীনবিসেরা যত সংস্কারকার্য্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটীও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণই এই যে, এই-জাতীয় লোকেরা অন্যান্য-জাতীয়দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়দমনে সুশিক্ষিত— ইহারা কখনই নিতান্তই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দু জাতি এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে— এই গুণ থাকাতেই মুসলমানদিগের ভগ্নাবস্থা হইলেও হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই; তাহারা পুনর্ব্বার তেজ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এইবারে বুঝি হিন্দুর সেই চিরসঞ্চিত গুণের লোপ হইবে— হিন্দু একান্ত ঐহিকতার দাসত্ব পাইবে। ইন্দ্রিয়দমনমূলক না হইলে প্রকৃত সংস্কারকার্য্য হয় না।"

কথাটী অনেক দিনের, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের অনুরূপ। বোধ হয় সেই জন্য এখনও মনে রহিয়া গিয়াছে।

স্বাতন্ত্রিকতা

সকল সমাজেই দুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার একটীর নাম সামাজিকতা, অপরটীর নাম স্বাতন্ত্রিকতা বলা যায়। যে শক্তির প্রভাবে সমাজান্তর্গত পরিবারসমূহ পরস্পর-সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং কিয়ৎপরিমাণে এক-প্রকৃতিক এবং একাকার হইয়া যায়, তাহার নাম সামাজিকতা। আর যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সুখদুঃখ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-পূর্ব্বক পরস্পর-পৃথক্-ভূত থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজবিধির পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যায়, তাহার নাম স্বাতন্ত্রিকতা।

সমাজভেদে ঐ দুইটী শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন সমাজে সামাজিকতার আধিক্য, আর কোন সমাজে স্বাতন্ত্রিকতার আধিক্য হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকালাবধি সামাজিকতার সবিশেষ প্রাবল্য ছিল। ঐ সকল লোকেরা জন্মভূমি ও আত্মসমাজকেই সমুদয় ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের আস্পদ স্বরূপে জানিত। উহাদিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটীই যেন সাক্ষাৎ-পরমেশের স্থানীয় হইয়াছিল। ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্মকার্য্য আর কিছুই হইতে পারিত না এবং উহাই অক্ষয় স্বর্গলাভের এবং পুরুষার্থসাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত। উহাদিগের আরাধ্য এবং উপাস্য দেবদেবীগুলিও সমাজান্তর্গত বিশেষ বিশেষ শক্তির অথবা স্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রতিরূপ-স্বরূপ ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থির করিয়াছেন যে, উহাদিগের সামাজিকতাই অতি দৃঢ়ীভূত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং রোমীয়ের ছাঁচেই হইয়াছে —কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষা গ্রীস এবং রোম হইতে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপের বাহির হইতে আসিয়াছে। ঐ শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিজ-সমাজ-প্রসূত বা তাহারই ছায়াভূত নহে। উহা রোমীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের চরম দশায় প্রাদুর্ভূত এবং সর্ব্বজনীনপ্রায়। এই জন্য ইউরোপীয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুতেই নিবদ্ধ হয় নাই। গ্রীক এবং রোমীয়ের চক্ষে আত্মসমাজই যেমন সর্ব্বপ্রধান এবং অতিব্যাপক রূপে প্রতিভাত হইত, নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে, সমাজ সেরূপে প্রতিভাত হয় না। উহারও দোষগুণ বিচার করিবার উপযোগী একটা মানযন্ত্র নব্য ইউরোপীয় পাইয়াছেন এবং সেইজন্য সমাজের সংস্কারকার্য্য তিনি আপনার সাধ্যায়ত্ত জ্ঞান করেন। গ্রীক এবং রোমীয় মনে

করিতেন যে, সমাজ আপনার নিদানভূত সকল ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বস্বত্ব কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং ব্যক্তিবিশেষের সুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিসম্বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে সমাজের ততটা অধিকার সম্যক্ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য ইউরোপীয় সমাজে গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বাতন্ত্রিকতার অধিকার সমধিক বিস্তৃত।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গ তাঁহাদিগের প্রাচীন এবং নব্য সমাজের মধ্যে এই প্রভেদটী লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সকল প্রাচীন সমাজের প্রকৃতিই গ্রীক এবং রোমীয়দিগের কতকটা অনুরূপ হইবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজেও সামাজিকতার অত্যাধিক্য এবং স্বাতন্ত্রিকতার অতিন্যূনতা অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সেই জন্যই বলিতেছেন যে, ইংরাজ-সমাগমে ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের সমূহ-উপকার হইতেছে।

উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের কথাটী দুই দিক হইতে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। এক দিক এই— সামাজিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতার পরস্পর মর্য্যাদা কিরূপ? অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে কোন একটী সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না? অন্য দিক এই— ভারতবর্ষে ঐ দুই শক্তির মধ্যে কোনটী অযথা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আছে কি না? যদি থাকে সেটী কোন্ শক্তি? এই দুইটী কথার বিচার করিলেই ইংরাজ-সমাগমে আমাদিগের সামাজিকতার এবং স্বাতন্ত্রিকতার কিরূপ সীমানিবেশ হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের মধ্যে উদারতম ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। উহারা জানিত যে, আপনাপন সমাজের হিত-সাধনার্থে সকল কাজই করিতে পারা যায়— অর্থাৎ অপর সমাজের হানি করায় কোন দোষ হয় না। গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঐ জাতীয় লোকেরা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগের দেশাচার ও কুলাচার এবং দেশব্যবহার ও কুলব্যবহারকেই ধর্ম্মের নিদানভূত বলিয়া মনে করিত এবং ঐ আচার এবং ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিলেই তাহারা আপনাদিগকে সাধিত-পুরুষার্থ বলিয়া জানিত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ঐ কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও উহার কতকটা যাথার্থ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ হইয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞানলাভেও মনুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া প্রথমতঃ কুলাচারে পরে দেশাচারে এবং সামাজিক বিধিতে নিবদ্ধপ্রায় লক্ষিত হয়।

ধর্ম্মজ্ঞানের উদ্‌বোধক প্রীতি। সম্যক্ ন্যায়পরতার বিকাশও প্রীতিমূলক। প্রীতিটী প্রথমে স্বজনদিগের প্রতিই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। উহা আত্মপরিবার, গোত্র এবং সমাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। আজি পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ঐ অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে নাই। নিজ সমাজের বহির্ভূত বর্ব্বর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিত, নব্য ইউরোপীয়েরাও কি ইউরোপীয়েতর জনগণের প্রতি কতকটা সেইরূপ আচরণ করেন না? কিন্তু তাহা করিলেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্ম্মবুদ্ধির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি এবং উদারতা জন্মিয়াছে; এবং যে পরিমাণে তাহা জন্মিয়াছে সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিথিল হইয়াছে। পরবর্ত্তী বন্ধনের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধনের দৃঢ়তা ন্যূন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির উদ্‌গমে পূর্ব্বাবস্থার তীব্রতর সহানুভূতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে। এখন লোকে কুলাচার বা দেশাচার বা সমাজবিধি লইয়াই ন্যায়ান্যায়-বিচারের পরিসমাপ্তি করিতে পারে না— ঐ সকলের পরেও একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিধি দেখিতে পায় এবং কতকটা তাহার অনুযায়ী হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে গ্রীক ও রোমীয়ের সুদৃঢ় সামাজিকতার অভ্যন্তরে একটু স্বাতন্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া নব্য ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর করিয়া তুলিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক বা রোমীয়দিগের সমাজতন্ত্রতার ন্যায় অতি দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং আপনার অন্তর্নিবিষ্ট জনগণ ভিন্ন অপর সকলের প্রতি সহানুভূতিশূন্য? এ কথা মুখেও আনিবার যো নাই। সর্ব্বময়-ব্রহ্ম-বাদ-পরায়ণ হিন্দু— অপরদেশীয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতিবিশিষ্ট। সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি, দেশাচারের প্রতি এবং কুলাচারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধাভক্তি অতি প্রোজ্জ্বল বটে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ঐ গুলিতেই সম্বদ্ধ নহে। ঐ গুলি তাঁহার মূল ধর্ম্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়াই উহারা ধর্ম্ম এবং পালনীয়। মনু ধর্ম্মের লক্ষণে সদাচার এবং শাস্ত্রীয় বাক্যেরও অতীত একটি পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত॥

ঐ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বিশেষণটীর দ্বারা শাস্ত্রশাসনের এবং সাধু আচারের উর্দ্ধ-বর্ত্তী ধর্ম্মলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণগুলির দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণ হইল, অর্থাৎ যে কেহ আপনার হৃদয়-কর্ত্তৃক কোন কার্য্যে অভ্যনুজ্ঞাত হইলেই যে

তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইবে না এ কথাও বলা হইল। ফলতঃ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বলায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব ধর্ম্মতত্ত্বের উন্নতি-প্রভাবে সামাজিকতার বন্ধন যতটুকু শিথিল থাকার প্রয়োজন তাহা হিন্দুসমাজে হইয়া আছে। সুতরাং স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অনুদার কোন ধর্ম্মমতবাদের সংস্রবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ-মধ্যে স্বাতন্ত্রিকতার আর-একটী স্থল আছে। কুলাচার, দেশাচার এবং সমাজবিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে ঐগুলি এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আর উহাদিগের হেতুর বা তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান হয় না। এরূপ হওয়াতেও এক প্রকার অন্ধ সামাজিকতা জন্মে। শাস্ত্রে ইহার দোষ প্রখ্যাপিত হইয়া উক্ত হইয়াছে "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন যে প্রদেশে যেরূপ প্রয়োজন পড়িত তদনুযায়ী নূতন নূতন ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রবর্গের দ্বারা প্রণীত ও রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। কোন কোন স্থলে নব নব সংহিতাও জন্মিত; কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন সংহিতারই নূতনরূপ ব্যাখ্যা হইত। আর কখন বা মহাত্মব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া বহু-প্রদেশ-ব্যাপক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত এবং নূতন বিধির প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর ঐরূপ হইতে পায় না। এখন এ দেশের বিধিব্যবস্থা ইংরাজ-রাজেরই ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা জন্মিতে পারে না। যদি দেশীয় জনগণের প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপনকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সমাজের মুখাপেক্ষী মহানুভব ব্যক্তিদিগের সম্মিলন এবং চেষ্টা-সম্ভূত হয় এবং সেই সকল বিধি জনসাধারণ-কর্তৃক সমাজশাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং প্রতিপালিত হয় তাহা হইলেই সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার জীবন্তাব বিদ্যমান হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।

পরন্তু যাঁহারা ইংরাজ-সমাগমে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন, তাঁহারা সামাজিকতার অন্তর্ভূত উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বাতন্ত্রিকতার মধ্যে কোনটীর কথাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে ভিন্নজাতীয় রাজার অধিকারে অবস্থিত হইয়া আত্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিব্যবহারাদির প্রতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, সেই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ঐ স্বাতন্ত্রিকতাটা অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লোক-লৌকিকতা, রীতিব্যবহারাদির এক-একটা পদ্ধতি পড়িয়া যায়। ওগুলি প্রায়ই

তত্তদ্দেশের যথাযোগ্য হইয়া থাকে। ওগুলির পরিহারে বা পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকার নাই। প্রত্যুত পরিহার এবং পরিবর্ত্ত -চেষ্টায় সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হইয়া যায়। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি সহানুভূতি হইতেই উদ্গত এবং সহানুভূতির প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মসমাজ। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ত পানভোজনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধিনিষেধ প্রচলিত নাই। তথাপি উঁহারা স্ব-স্ব-সমাজ-প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করেন না। কোন ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না; তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, পাগড়ী চাপকানই এ দেশের যোগ্যতর পরিচ্ছদ। মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাজ তাহা ভোজ-কালে পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ সমাজ-প্রচলিত নিয়ম-সকল রক্ষা করিয়া চলাই ভাল।

স্বাতন্ত্রিকতার যেরূপ প্রবৃত্তিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান জাপানীয়দিগের ব্যবহার-দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তু উঁহারা যে ইউরোপীয় ব্যবহারের অনুকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্রাট্ এবং সচিবসভার অনুমোদিত হইলে, তবে অনুকরণ করেন। যাহার মনে যাহা আসিবে সে তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করিবে জাপানীয়দিগের মধ্যে এ প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানীয়দিগের ইচ্ছা হইল যে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায় টুপি ব্যবহার করে; তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিলে, সম্রাট তদর্থে অনুমতিপূর্বক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইউরোপীয় অনুকরণে টুপির ব্যবহার তাঁহার অনভিমত নহে। তাহার পর জাপানীয়রা ইউরোপীয় ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ। প্রতি ব্যক্তি -কৃত অনুকরণে সমাজের অবমাননা হয়, সমাজকৃত অনুকরণে অনেক স্থলে তাহার সজীবতাই বুঝা যায়।

চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজবিধির প্রয়োজনোপযোগী অন্যথা করা হয়। কিন্তু তাহাও সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাসম্ভূত হয় না। চীনীয় সম্রাট্ সকল বিধির বিধাতা। তিনি স্বশরীরে সমুদয় সমাজশক্তি ধারণ করেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমাজবিধির পরিবর্ত্ত হইতে পারে। দেবতাদিগের পূজাবিধিও তাঁহার আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট্-সভাও প্রচলিত সমাজ-বিধির অন্যথা এবং নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ।

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও একটী শক্তির স্থান আছে।

পরাধীনতা-নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত-সমাজ-ব্যাপক হইয়া নাই—উহা সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বাতন্ত্রিকতা অতি বিস্তৃতরূপ হইয়া সমাজের পূর্ণ সজীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি কখনই অপকারক বই উপকারক হইতে পারে না। এখন সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য এবং সম্মিলনই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতা অবশ্যপরিহার্য্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই— ১. যথায় সামাজিকতা-নিবন্ধন অপরাপর সমাজান্তর্গত লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ হয়, তথায় ধর্ম্মজ্ঞানপ্রণোদিত স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। ২. যে সামাজিকতার প্রভাবে সামাজিক নিয়মগুলির মূলীভূত হেতুসমূহ সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগেরও মন হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবশ্যক। ৩. সমাজ-বিধির পরিবর্ত্ত, সমাজের প্রতি পূর্ণ-সহানুভূতি-সম্পন্ন, সুদূরদর্শী মহাত্মাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। অপর সকলের সমাজসংস্কার-চেষ্টায় পাশবভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক নিয়ম এবং দেশাচারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকটিত হয় এবং লোকের মুখাপেক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধির ক্ষীণতা জন্মায়।

এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম সূত্রের উল্লিখিত যে স্বাতন্ত্রিকতা তাহা হিন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজপ্রদত্ত শিক্ষায় পুরাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধা-সঞ্চারে ঐ সকল প্রথার মূলীভূত হেতুসমূহ প্রকট হইতেছে না। অন্ধ-অনুকরণ-স্রোত মাত্র চলিতেছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক হইতেছে না।

খ্রী. ১৮৯২

১ পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ। কঠ

২ Happiness is the only good.
The time to be happy is now.
The place to be happy is here.

৩ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। ...
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

যাত্রা-সমালোচন

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসুন্দরের কথা

এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে গ্রামে একবার এই যাত্রা হইয়াছে, সে-গ্রামনিবাসীগণ সময় পাইলে কখন কখন তদ্‌বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিতে ক্রটি করেন না। অন্য যাত্রাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার রসজ্ঞতা-বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা -দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

নায়ক-নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কি কাব্য, কি নাটক, কি নাটকাভিনয়, এ সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্র। মনুষ্য-চিত্তবৃত্তি-মধ্যে বিশেষ বেগবতী এবং সুখকরী যে বৃত্তি, তাহা স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয় ইত্যাদি নামে পরিচিতা। একজনের প্রতি অন্যের আত্মাপেক্ষা আন্তরিক সমাদরকে এই নাম দেওয়া যায়। এই বৃত্তির পাত্রভেদে, বৈষ্ণবেরা সখ্য-বাৎসল্যাদি নানা প্রকার নাম দিয়াছেন এবং সে সকল নাম সাধারণেও চলিত। যে কারণেই হউক, ইহার মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয়ই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল কবি -কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং সকল নাটকে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর-যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবার স্পর্শ করে তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিষাদ কিরূপ, আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, চাঞ্চল্য কিরূপ, ধর্ম্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সহৃদয়তা কিরূপ, তদ্‌বিষয়ে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় কিছুই দেখা যায় না এবং তাহা দেখাইবার স্থানও এ যাত্রায় নাই। বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে তাঁহার বাস এবং দৌত্যকর্ম্মে মালিনীর প্রবৃত্তি, এই কয়েকটী অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ অংশে রসোদ্ভাবনের সম্ভাবনা? ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইবে? যাত্রায় এই অংশের শেষভাগে কখন কখন বিদ্যা-সুন্দরের মিলন পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে। ইহা রসসৃষ্টির উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সূর্য্যকিরণ প্রচণ্ড হইয়া উঠে; মা মা করিয়া দুইটা ঠাকুরাণী-বিষয়ক গীত গাইয়া যাত্রাকরেরা শেষ করিয়া দেয়।

অতএব বিদ্যাসুন্দরের প্রথম আলাপ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

আদিরসের তীব্রতা নাই। রসমধ্যে করুণরসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণরসে যাদৃশ মনুষ্য-চিত্তকে আলোড়িত করে, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। *এই জন্য জনসাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত* কৌশলক্রমে করুণরস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর তাহাকে বিরহ বা বিচ্ছেদ বলে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন-সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না, এক্ষণে বিচ্ছেদ কিরূপ, দেখা যাউক।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদযন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন; নাচিয়া তদ্‌বিষয়ক দুই-একটি গীত গায়িয়া থাকেন; অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুইটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ। এতদ্‌ভিন্ন যদি অন্যরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাও সামান্য। সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না, কাহারও নয়নাশ্রু পতিত হয় না, বিদ্যাও কাঁদে না, শ্রোতৃগণও কাঁদে না। "আমার উড়ু উড়ু কচ্চে প্রাণ" এই কথায় বা তদনুরূপ কথায় যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদযন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল, তাহার বেশী নহে।

সামান্য বিচ্ছেদ-সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মস্তকচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মসানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া, কাঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া, নাচিতে নাচিতে আড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীতে রসের স্রোতঃ বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে, রসিক শ্রোতাদিগের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বিদ্যার কাঙ্কাল কেমন দুলিতেছে! বেশ্যাস্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন, হৃদয়, ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া শ্রোতারা দুর্ভাগা সুন্দরের বিষাদ একেবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণবিষয়ক কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন? কেহ উত্তর করিতেছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মার্থে কালীয়দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থ নহে। এরূপ

শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা, তথাপি বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার এক স্থানের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু কৃষ্ণযাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেননা, কৃষ্ণযাত্রা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। তবে ইহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এতদংশেও কিছু ভাল, এই জন্যই আমরা সে প্রসঙ্গ করিতে সাহস পাইতেছি। বিশেষ যে দেশে কৃষ্ণ প্রধান দেবতা, কৃষ্ণলীলার কথা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, যেখানে গুরু কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছেন, কথক গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন— যেখানে আবাল বৃদ্ধ, আপামর সাধারণ, দোকানী গোসাঞি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে— যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ— যে দেশে মাঠে ঘাটে, বনে বাজারে, মন্দিরে নাট্যশালায়, বৈঠকখানায় বেশ্যালয়ে, চাষা-চুয়াড় নট-নটী বাবু-বেশ্যা ইতর-সাধারণ সকলেই অহরহঃ কৃষ্ণগীত গায়িতেছে— যেখানে গৃহচিত্রে কৃষ্ণ, গাত্রবস্ত্রে কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্য্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বধিয়া কি ফল ?

নাটকগুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বাবুদিগের মুখ চাহিয়া বিদ্যাসুন্দরের দুই-একটি গীত উদ্‌ধৃত করিয়াছি— বৃদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের মুখ চাহিয়া কৃষ্ণযাত্রার একটি গীতের উল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণ মথুরাধিপতি ; গোপ-কন্যা বৃন্দা দূতী তাঁহার আনয়নে যাইতেছে, তাহার কথায় রাজার গোচারণে পুনরাগমন করিবার সম্ভাবনা নাই— এজন্য দূতী দর্প করিয়া বলিল যে, যদি কৃষ্ণ না আসেন, তবে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিব।

কৃষ্ণকে বাঁধিবে ! রাধার এ কথা অসহ্য হইল—

আমি মরি মরিব, তারে বেঁধ না,
হে দূতি, তোর পায়ে ধরি, তারে বেঁধ না,
সে আমারি প্রিয়।
সে যেখানে সেখানে থাকুক,
তাহারে কেহ রাধানাথ বই তো বলিবে না

ইত্যাদি গীত সকলেরই অভ্যস্ত আছে, এজন্য সমুদায়াংশ উদ্‌ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

রাধার এই কথায় অনেককে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়। কৃষ্ণকে বাঁধিবে, এইটি কেবল কথায় মাত্র বলা হইয়াছিল ; রাধা তাহাতে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু সুন্দরকে

কেবল কথায় নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জু-সংযুক্ত করিয়া বাঁধিল, মসানে কাটিতে পর্য্যন্ত লইয়া গেল, তথাপি বিদ্যার কণামাত্রও দুঃখ হইল না, শ্রোতাদিগেরও দুঃখ হইল না; অশ্রুপাতের ত কথাই নাই। বিদ্যাসুন্দর-ভক্তগণ, বোধ হয়, এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যার প্রণয় অতি প্রগাঢ় বলিয়া যাত্রায় বর্ণিত হয় নাই। এই তুলনায় আরও বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্ব্বে যাত্রায় প্রথমে দেবতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, দেবতুল্য এবং ঋষি সাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেহতর মেতরাণী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করে।

সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয়-সুখসৌরভ-মাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। কিন্তু সে পরিচয় কবি ভিন্ন আর কাহারও দিবার সাধ্য নাই। তাহাতে কবির কল্পনাশক্তি আবশ্যক। যদি অপরে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই যাত্রায় যেরূপ বিদ্যাসুন্দরের পরিচয় আছে, সেইরূপ হইয়া পড়ে— অর্থাৎ মাহাত্ম্যের পরিবর্ত্তে রহস্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক এই যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক। মালিনী-সুন্দরের কথাবার্ত্তা কি বিদ্যা-সুন্দরের কথাবার্ত্তা উভয়ই সমভাবে রহস্য-পরিপূরিত। কখন কখন প্রণয়ীদিগের মধ্যে রহস্য কি কৌতুকালাপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতি সাধারণ। যে স্থলে প্রণয় গভীর, সে স্থলে উপহাস রহস্যাদি স্থান পায় না। কিন্তু এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাগ ত্যাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাগ্‌রোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। বিদ্যার কথাবার্ত্তা সহজেই অল্প; রহস্যের উত্তর না দিতে হইলে, তাঁহার গীতের ভাগ অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা, তাহার রঙ্গরস লইয়াই এই যাত্রা। কাজেই ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ বিদ্যা-সুন্দর উপলক্ষ মাত্র। বিদ্যাতে মালিনীর যৎকিঞ্চিৎ ছায়া আছে; কিন্তু বিদ্যা কিছুই নহে, না প্রণয়িনী, না উন্মাদিনী, না জড় না অন্য।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে করুণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এ দেশে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা কোন ক্রমেই সাধারণপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই যাত্রা সাধারণপ্রিয় হইবার আর দুই-একটি কারণ আছে। যে ভাষায়

ইহার গীতগুলিন রচিত হইয়াছে, তাহা সরল, অনায়াসেই অপর-সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্ভিন্ন সঙ্গীতেরও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। আর অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, এই যাত্রায় যতটুকু সামান্য কাব্যরস আছে, তাহাই এক্ষণকার *শ্রোতাদিগের বোধোপযোগী, তদতিরিক্ত হইলে তাহাদিগের বোধাতীত হইত।* যে রচনায় রসগ্রহ হয়, তাহাই ভাল লাগে।

আমরা এ পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে এই যাত্রার নীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার অধিক প্রয়োজন নাই ; আমরা যাহা বলিব, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালিনী, সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটি লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিনজনের মধ্যে কোন্‌টি অনুকরণীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় তাহার কন্যার চরিত্র হউক, অথবা সুন্দরের ন্যায় তাহার পুত্রের স্বভাব হউক। কেই বা প্রার্থনা করে যে, মালিনীর ন্যায় তাহার গৃহিণী হউক অথবা দাসী হউক। লোকে এরূপ প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটির মধ্যে কোনটিও আদর্শযোগ্য নহে, বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ষ ব্যতীত আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কখন কখন কবিরা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমত ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্দ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি ঘৃণা এবং ভয় উভয়ই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে অপকৃষ্ট হইতে উৎকর্ষ শিক্ষা হইল, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে অপকর্ষ সেরূপ চিত্রিত হয় নাই। কাজেই বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, যাত্রা কি নাটক উভয়ের কোনটিই শিক্ষার নিমিত্ত নহে, ইহা হইতে সৎশিক্ষা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। বিশেষতঃ যে স্থলে নায়ক-নায়িকা বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য, সে স্থলে ইহা দ্বারা অন্য আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কিন্তু এটি তাঁহাদের ভুল। যাত্রার বর্ণিত বিষয়, ধর্ম্ম-বিষয়ক হউক, নীতি-বিষয়ক হউক বা যাহাই হউক, আরও অধিক হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতের ছন্দে, বিশেষতঃ সুরে তদ্‌বিষয়ে কতক সাহায্য করে। আর "আদিরস" বর্ণন থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমত নহে। কেবল বিদ্যা-সুন্দরের ন্যায় নায়ক-নায়িকা হইলেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব।

অতএব যাত্রা নাটকের নায়ক-নায়িকা দ্বারা যে নীতি কিঁ ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না, এমত নহে।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা কেবল পুরাণব্যবসায়ী কথক আর যাত্রাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাণব্যবসায়ীরা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। এক্ষণে যাত্রাওয়ালারা দেশের শিক্ষক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে যাত্রার আলোচনা আমরা করিলাম, সে যাত্রা যেখানে সমাদৃত, তথাকার শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা একপ্রকার অনুভূত হইতে পারে।

সকল প্রকার যাত্রার কথা

কলিকাতায়, এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে, ভদ্র লোক এক্ষণে যাত্রার প্রতি হতাদর হইয়াছেন বটে, কিন্তু যাত্রাই এক্ষণকার গ্রাম্য উৎসব। তদুপলক্ষে বারইয়ারী, তদুপলক্ষে ভিক্ষা, তদুপলক্ষে চুরি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকরেরা উপাস্য ব্যক্তি; তাহাদের আনিতে হইলে উপাসনা করিতে হয়।

এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ বোধ হইবে যে, বাঙ্গালার আধুনিক যাত্রা অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা এত তাহার আদর কেন? যাত্রা শুনিতে লোকের এতই বা ব্যগ্রতা কেন? বস্তুতঃ আধুনিক যাত্রার সর্ব্বদাই প্রশংসা শুনা যায়। কিন্তু প্রশংসা, সকল সময় গুণের পরিচায়ক নহে। অনেক সময় বরং তাহার বিপরীত বুঝায়। যিনি প্রশংসা করেন, তিনি যদি স্বয়ং গুণগ্রাহী হন, তবেই তাঁহার প্রশংসা গুণব্যঞ্জক, নতুবা সন্দেহস্থল।

"অমুক অধিকারী বড় যাত্রা করিয়াছে, মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার উপলক্ষে কেমন তামাদি ও নাতকজারী ঘটাইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কথায় নাতকজারী ঘটান অল্প গুণপনা নহে। পরমানন্দ কি শ্রীদামশুভল প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাকরের প্রশংসা কর, কিন্তু তাহারা কি এরূপ নাতকজারী ঘটাইতে পারিত? সাধ্য কি! তাহারা এরূপ আইন-আদালতের কথা কখনও জানিত না।" আধুনিক যাত্রার এই এক-জাতীয় প্রশংসা।

"গত রাত্রে দূতী এক চক্র শব্দ লইয়া কি চমৎকার গুণপনা দেখাইল। রথচক্র, রমণীচক্র, নয়নচক্র, প্রেমচক্র, চক্রীর চক্র এইরূপ কত চক্র সাজাইল। এমন যাত্রা কি আর হয়! এ যাত্রা শুনিলে কথা শেখা যায়, অভিধান-পাঠের ফল হয়।" এই আর এক-জাতীয় প্রশংসা।—

এই সকল প্রশংসা শুনিলে অনেকেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের যাত্রার অবস্থা বড় অপকৃষ্ট, এবং শ্রোতৃগণের রুচি ততোধিক অপকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইবে। রুচি সম্বন্ধে কতকগুলিন কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে

আর অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই। আপাততঃ কেবল যাত্রার অভিনয় সম্বন্ধেই দুই-একটি কথা বলিবার অভিলাষ। কিন্তু আমরা যাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিতেছি, তাহা এ দেশীয় অন্যান্য নৃত্যগীত-পদ্ধতি পক্ষেও বর্ত্তিবে।

নৃত্য ॥ যাত্রার প্রসঙ্গ হইলে অগ্রেই নৃত্যের কথা মনে পড়ে। সুর, তাল, লয়, মান, বেশবিন্যাস, কথাবার্ত্তা, অঙ্গভঙ্গি, সকলই মনে হয়, কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয়, বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে, "বিহালাওয়ালা"। নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি হইত না।

যাত্রায় মেহতর নৃত্য করে কেবল নেসার ভরে। কিন্তু আর সকলে কেন নৃত্য করে, তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর থাকিতে পারে। ভিস্তি নৃত্য করে বুঝি জলের ভরে, মালিনী নৃত্য করে বুঝি বয়সের ভরে, বিদ্যা নৃত্য করে বুঝি যৌবনের ভরে, রাধা নৃত্য করেন বুঝি প্রেমের ভরে, রাবণ নৃত্য করেন বুঝি মুণ্ডুর ভরে, কিন্তু সীতা, কৈকেয়ী, ভগবতী, হস্তী, জাম্বুবান্, অশ্ব প্রভৃতি কেন নৃত্য করে, কে বলিতে পারে?

কিন্তু এক কথা আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে; কীর্ত্তনের ছলে অনবরত নয়নাশ্রুবর্ষণ করিয়াছে; প্রণয়ভরে, স্নেহভরে বাঙ্গালা অনেক কাঁদিয়াছে। সন্ধ্যা-সমীরণের ন্যায় একাকিনী বনে, উপবনে, মর্ম্মপীড়ায় অনেক কাঁদিয়াছে। শেষ অনাথিনী নিরুপায় হইয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে সাগর-সলিলে মিশাইয়া গিয়াছে। আর সে বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা এক্ষণে নূতন। বাঙ্গালা এক্ষণে বালক। সেই জন্য এত নৃত্য। বালক আপনিও নৃত্য করে, আবার বৃদ্ধ পিতামহকেও নৃত্য করিতে বলে। বালকের নৃত্য আবশ্যক, আমাদের শিরা, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী সকলই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্য আবশ্যক।

যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালনজনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালনজনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জাকর নৃত্য! বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে, এই জন্য এই নৃত্য আপনি দেখে, কন্যাকে মাতাকে দেখায়, বালকবালিকাকে দেখায়, আবার বাহবা দেয়। বাহবা কাহার প্রাপ্য? বোধ হয়, বাহবা আমরাই পাইতে পারি।...

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় খেমটা ছিল না। পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি যে-সকল

কালীয়দমন-যাত্রা আছে, তাহাতে এই নৃত্য প্রচলিত নাই। কোন কোন দলে লোকরঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই ঘৃণিত নৃত্য স্বতন্ত্র নর্ত্তক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মালিনী কি বিদ্যার ন্যায়, দূতী কি রাধিকা খেমটা নাচেন না। কালীয়দমন-যাত্রায় যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে বাঙ্গালার নৃত্য-প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল এবং সে নৃত্য নিতান্ত গাম্ভীর্য্যশূন্য ছিল না, কিন্তু এই আধুনিক খেমটানাচ কোথা হইতে আসিল? কে আনিল? অথবা তাহা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। যে দেশে তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশে দেবার্চ্চনায় পঞ্চ মকার আবশ্যক, সে দেশে খেমটার জন্ম হইবে অসম্ভাবনা কি? খেমটা বাঙ্গালার নৃত্য; বাইদিগের নৃত্য মহারাষ্ট্রীয়। খেমটা তান্ত্রিক, মহারাষ্ট্রীয় নৃত্য পৌরাণিক। পুরাণের ন্যায় এই নৃত্যের গাম্ভীর্য্য আছে।...

আহ্লাদের বিষয় এই যে, যথার্থ ভদ্রলোকের বাটীতে আর "খেমটার নাচ" স্থান পায় না; প্রায় "বারোয়ারি তলা"য় হইয়া থাকে। তাহাও আর অধিক দিন থাকিবে না।

সুর॥ যে নৃত্য লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে, এক্ষণকার সুর সেই নৃত্যের প্রতিপোষক এবং উদ্দীপক। বাঙ্গালার আর পূর্ব্ব সুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তম্ভিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোক-প্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে আতর দূরে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মগন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গালার সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নৃত্যানুযায়ী সুর হইয়াছে।

মনের অনেক প্রকার যন্ত্রণা বাক্যে প্রকাশ হয় না, তাহা কেবল সুরে প্রকাশ হয়। দুঃখ যত গভীর, ততই বাক্যের অতীত। ব্যথিত অন্তঃকরণমধ্যে কিরূপ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, বাক্যে তাহা দেখিতে পায় না; দেখিতে পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্য অন্ধ, বাক্য অসম্পূর্ণ। এই জন্য যে গ্রন্থকর্ত্তা কেবল ব্যথিত ব্যক্তিকে কতকগুলা কথা বলাইয়া তাহার গভীর মর্ম্মপীড়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন। ব্যথিত ব্যক্তি স্বয়ং আপনার যন্ত্রণা বাক্যে বিবৃত করিতে পারে না। "আমি মরিলাম" "আমি গেলাম" এ সকল কথা অতি সাধারণ, সর্ব্বদাই শুনা যায়। অজীর্ণ হইলেও লোকে "আমি মলাম" "আমি গেলাম"

বলে। গভীর মর্ম্মপীড়ার এ ভাষা নহে; তাহা স্বতন্ত্র। কেহ মর্ম্মপীড়ার কথা অন্যকে বলিতে চাহে না, তাহা কেবল আপনার নিকট আপনি বলিতে ইচ্ছা করে। আপনি বক্তা, আপনি শ্রোতা। কিন্তু সে স্থলে বাক্য ব্যবহার হয় না, কেবল স্বর ব্যবহার হয়। স্বর যেন তাপিত অন্তরের একমাত্র ভাষা। সন্তানশোকে সন্তপ্ত দুঃখিনী ভূমিতলে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করে, সে ক্রন্দন কেবল স্বর। অনেক সময় সে স্বরের সঙ্গে কোন বাক্য-সংযোগ থাকে না, অথচ সেই মর্ম্মভেদী স্বর শুনিয়া তোমার অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তোমার হৃদয় বিস্ফারিত হইল, তুমি সেই স্বরের অর্থ বুঝিতে পারিলে; তুমি ধীরে ধীরে নয়নাশ্রু মুছিলে। "আমি মরিলাম" এই ভাব বাক্যে সর্ব্বদা শুনিতেছ, অথচ তাহাতে কর্ণপাতও কর না কেন? আবার বাক্য প্রয়োগ না করিয়া কেবল স্বরে সেই ভাব জানাইলে তোমার অন্তর আর্দ্র হইয়া আইসে, তাহাই বা কেন? বাক্যে যাহা শুনিলে, তাহা অনেক সময় মিথ্যা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু স্বরে তাহা কখনই হয় না। বাক্য অনেক সময় মৌখিক, স্বর সকল সময় আন্তরিক। স্বরে যদি তুমি চঞ্চল না হইলে, তবে বুঝিতে হইবে যে সে স্বর উদ্দিষ্টভাবব্যঞ্জক নহে, তাহা বেস্বর।

আন্তরিক প্রত্যেক ভাবের এক-একটি স্বতন্ত্র স্বর আছে। শোকের স্বর পৃথক্, হর্ষের স্বর পৃথক্। পৃথক্ বলিয়াই পৃথক্ পৃথক্ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের যাত্রাকরগণ তাহা অনুধাবন না করিয়া হর্ষ-বিষাদ একই স্বরে গাইয়া থাকে, এই জন্য আমাদের গীত বেস্বরা।

কিন্তু আমাদের রাগরাগিণী ভাবব্যঞ্জক বলিয়া রাষ্ট্র নাই। কোন্ রাগিণীর দ্বারা শোক প্রকাশ হইবে, কোন্ রাগিণীর দ্বারা উন্মত্ততা প্রকাশ হইবে, তাহা সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা বলেন না। কিন্তু তাহা না বলুন, কোন রাগ বা রাগিণী তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গায়িতে পারিলে তাহা স্থির হইত। কিন্তু এক্ষণে কোন রাগরাগিণী সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাওয়া যায় না। যখন তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাইত, কিম্বদন্তী আছে, তৎকালের সঙ্গীতবিদেরা যে কোন ভাব ইচ্ছা হইত, তৎক্ষণাৎ স্বরের দ্বারা শ্রোতার মনোমধ্যে তাহা উদ্দীপন করিতে পারিতেন। এমন কি, বন্য-জন্তুদিগের অন্তর পর্য্যন্ত আর্দ্র করিতে পারিতেন। কোন কোন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তির এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে যে, কেবল মনুষ্যচিত্ত নহে, স্বরজ্ঞের নিকট পূর্ব্বে জড়-পদার্থ পর্য্যন্ত আজ্ঞাকারী ছিল। মেঘ আসিয়া বৃষ্টি করিত; অগ্নি আসিয়া দগ্ধ করিত; একবার এক স্বরজ্ঞ আপনার আহূত অগ্নিতে আপনি পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। চমৎকার কথা! ইহার মর্ম্ম অসীম! এই সকল কিম্বদন্তী অমূলক হউক, অগ্রাহ্য

হউক, হাস্যাস্পদ হউক, কিন্তু সুরের অসাধারণ শক্তির প্রতি লোকের যে বিশ্বাস আছে, এই কিম্বদন্তী তাহার পরিচায়ক।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যে উন্নতি হইয়াছিল, বোধ হয়, শিক্ষাদোষে এক্ষণে তাহা অনেক লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার সঙ্গীতব্যবসায়িগণ কেবল রাগিণীর পর্দ্দা লইয়া বিতণ্ডা করেন; অমুক রাগিণীর "মধ্যম যান", অমুক রাগিণীতে মধ্যমবর্জ্জিত। তাঁহারা এইরূপে কেবল রাগিণীর পর্দ্দা শিক্ষা করেন, রাগিণী শিক্ষা করেন না। ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার কেবল ইষ্টক চিনিয়া ক্ষান্ত হন, অট্টালিকার আকার দেখেন না। পর্দ্দা-প্রতি অধিক মনোযোগ হওয়ায় রাগিণীর মূল উদ্দেশ্য ক্রমে অদৃশ্য হইয়াছে। আবার "ডাগরবাণী" "খণ্ডারবাণী" প্রভৃতি "বোল বাণী"র সৃষ্টি হওয়ায় সেই অদৃশ্যতার আরও সাহায্য করিয়াছে। শেষ রাগিণী সঙ্করজাতীয় হইয়া সকল লোপ করিয়াছে। এক রাগিণীর স্কন্ধের উপর আর-এক রাগিণীর মস্তক বসিয়া এক নূতন রাগিণী সৃষ্ট হইল। হর্ষব্যঞ্জক সুরের স্কন্ধের উপর বিষাদব্যঞ্জক সুরের মস্তক বসিল; গুণিগণমধ্যে "বাহবা" পড়িয়া গেল। গণেশের অনুকরণ হইল। গণেশ গায়ক, গণেশের স্কন্ধে হস্তীর মুণ্ড।

এক্ষণে বাঙ্গালার সুর প্রায় এইরূপ। এ রাগিণীর দুইটি পর্দ্দা, ও রাগিণীর চারিটি পর্দ্দা লইয়া আমাদের সুর। ইহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ। আর্য্যের ব্রহ্মা অনার্য্যের মনসা লইয়া আমাদের দেবতা। মুসলমানের চাপকান্, ইংরাজের ট্রাউজার লইয়া আমাদের পোষাক। সংস্কৃত ধাতু এবং পারস্য নাম লইয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষা। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালার পূর্ব্ব সুর লোপ পাইয়াছে। এক্ষণকার আর প্রায় কোন সুরই আন্তরিক ভাব -প্রবাচক নহে, এই জন্য যে ভাবের গীত হউক, কোন একটা সুরে গাইলেই হইল। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, শ্রোতা ও গায়ক এক্ষণে রুচি সম্বন্ধে তুল্য।

এক্ষণে বাঙ্গালা গীতে যে কয়েকটি সুর ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সঙ্করজাতি হউক, অসম্পূর্ণ হউক, লঘু হউক, তাহাতে আমাদের স্বভাবের কিঞ্চিৎ ছায়া পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে শোকাকুল নহি, আমরা নিরানন্দ নহি, আমরা এক্ষণে উল্লাস-প্রিয়। আমাদের সুরেও উল্লাসের ছায়া আছে। উল্লাস আনন্দ নহে, উল্লাসে গাম্ভীর্য্য নাই, আমাদের সুরও সেইরূপ। সুরের নাম পৃথক্ পৃথক্ আছে। কিন্তু সে-সকল সুর প্রায় এক-জাতীয় হইয়াছে। বাঙ্গালায় আর বড় শোকের সুর নাই। কুচিহ্ন। শোকে সহৃদয়তা জন্মে, ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অদৃষ্টে ঘটে না; শোক পবিত্র; শোক স্বর্গীয়। শোক আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের নৃত্যের গাম্ভীর্য্য নাই; সুরেরও গাম্ভীর্য্য নাই। সুর স্বভাবব্যঞ্জক। আমাদের সুর সামান্য; আমরাও সামান্য। লক্ষ্ণাউয়ের ওয়াজাদালিও সামান্য; যখন তাঁহার মর্ম্মকথা তিনি আদ্ধায় গায়িয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক শক্তি তখনই বুঝা গিয়াছিল। তিনি বুলবুলি হইয়া এক সূক্ষ্ম শাখায় বসিয়া মস্তক হেলাইয়া অর্দ্ধমুদিতনয়নে আদ্ধা গায়িতেছিলেন। তিনি গরুড়ের গীত শুনেন নাই। গরুড় গীত গায়— সাগরসন্নিহিত উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া উচ্চ স্বরে গীত গায়। সাগর শিহরিয়া উঠে; দুলিয়া উছলিতে থাকে; সাগরে তরঙ্গ উঠে; মেঘমালা ঝুলিয়া পড়ে। সন্তানদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া মায়াদেবী ঊর্দ্ধ নেত্রে সেই উচ্চ চূড়ার প্রতি সভয়ে চাহিয়া থাকেন। গরুড় প্রতিভা। তাহাই বিষ্ণুকে একবার স্বর্গে, একবার পাতালে লইয়া যাইত। লক্ষ্ণাউয়ের নবাব বুলবুলি। তাঁহার এক সুর। আমরাও হর্ষ-বিষাদ এক সুরে গাই। আমাদের শোকতাপ যদি থাকে তাহা অতি সামান্য, সেই জন্য আমাদের সুরও সামান্য।

সুর ব্রহ্ম! চমৎকার কথা। যিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তিনি সুর বুঝিয়াছিলেন। মহাদেব গায়ক! আরও চমৎকার কথা। সুর মহামৃত মহাদেবের কণ্ঠের যোগ্য। শ্রোতা কে? মনুষ্য নহে, সিংহ নহে, পর্ব্বত নহে, সাগর নহে। এ সকল সামান্য, ক্ষুদ্র। মহাদেবের গীত গর্জ্জিল; দেবলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক অতিবাহিত করিয়া মহাসুর চলিল। দূরে কোটি কোটি সূর্য্য মহাসুরে প্লাবিত, কম্পিত, মহাসুর তথাপি প্রধাবিত! অনন্ত আকাশে মহাদেবের মহাসুর প্রধাবিত। চিরকাল প্রধাবিত। সময় অনন্ত, আকাশ অনন্ত, সুর অনন্ত। অনন্ত। অনন্তের অর্থ অনুভব হয় না, মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মহাদেব গায়ক; শ্রোতা অনন্ত। মহাদেব কোথায় বসিয়া গায়িতেছেন? হিমালয়ে নহে। হিমালয় ক্ষুদ্র স্থান। তথায় বসিয়া বেদব্যাস, বাল্মীকি গান করুন। হিমালয় মহাদেবের যোগ্য নহে। তথায় ভীষ্মদেব বাস করুন। মহাদেবের স্থান কোথা? প্রতিভাশালী ব্যক্তির অতলস্পর্শ অন্তরে তাঁহার একমাত্র স্থান।

গীত॥ সে কথা এক্ষণে যাউক। সুর এবং বাক্যে গীত। সুরে ভাব উদ্দীপন করে, বাক্যসংযোগে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হয়। সুরে তোমার মন আকর্ষণ করিল, তুমি স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলে, চিত্ত চঞ্চল হইল, নিকটে তোমার শিশু ক্রীড়া করিতেছিল, তুমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলে। সুর বড় মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; সন্তানকে আদর করিয়া থাক, এক্ষণে আরও আদর করিতে ইচ্ছা হইল। এমত সময়ে সুরে বাক্য সংযোগ হইল। গায়ক গাইল—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।

তোমার স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তুমি আপন মনের কথা আপনি বুঝিতে পারিলে। গীত কৃতকার্য্য হইল।

আমরা অনেকে আপন মনের কথা আপনি বুঝিতে পারি না। তাহা কবিরা আমাদের বুঝাইয়া দেন। আমরা কেবল মনের বেগ অনুভব করি মাত্র। একজন সামান্য ব্যক্তি যদি প্রেমাসক্ত হয়, প্রণয়ের অতি অল্প মাধুরী সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে। প্রণয়পাত্রীর দর্শনে সুখ, তাহার অদর্শনে অসুখ, এই মাত্র সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে। কিন্তু প্রণয় সাগর। সকলের অন্তরে সেই অগাধ সাগর, সেই দুর্দ্দম সাগর উছলিতেছে। প্রেমাসক্ত ব্যক্তি তাহার বেগে কখন হর্ষিত, কখন বিষাদিত হইতেছে; অথচ সেই সাগরে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহার কোনটিই সে ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না। তাহারে একটি তরঙ্গ দেখাও; গাও—

দেখিয়া পালটি দেখি
তবু আঁখি তিরপিত নয়।

প্রণয়ী সামান্য হইলেও তৎক্ষণাৎ এই তরঙ্গ চিনিতে পারিবে। তাহার প্রণয়পাত্রীকে সে কতবার অনিমিষ-লোচনে দেখিয়াছে, সর্ব্বদা দেখিতেছে, তথাপি তাহার নয়নের পরিতৃপ্তি নাই। কিন্তু তাহা সে আপনি জানিত না। কবি তাহা জানিতেন। প্রণয়ীকে প্রণয়ের আর-একটি নিকটস্থ তরঙ্গ দেখাও। গাও—

নব রে নব, নিতুই নব,
যখনই হেরি তখনই নব।

প্রণয়ী মাত্রেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। যিনি প্রণয়পাত্রীকে নিত্য নূতন না দেখিয়া থাকেন, তিনিও এ কথা বুঝিতে পারিবেন, কবি তাহা জানিতেন। স্বয়ং কখন প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকুন বা না থাকুন, কবি প্রণয়ের সকল ভঙ্গি জানেন, সকলের অন্তর জানেন; কবি অন্তর্য্যামী। কবি ব্রহ্মা। কবি সৃষ্টি করেন। সরমা ব্রহ্মার মানসকন্যা, সীতা বাল্মীকির মানসকন্যা, ডেসীডিমনা সেক্ষপিয়রের মানসকন্যা।

যিনি অন্তরের কথা জানেন না— যিনি আশার উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা জানেন না— যিনি স্নেহের কোমলতা, শোকের গভীরতা, যুবতীর পবিত্রতা জানেন না— তিনি কবি নহেন। তিনি গীত বাঁধিবার অনধিকারী, অনধিকারীরাই এক্ষণে আমাদের যাত্রার গীত বাঁধে। জেলেমালা, কুমার, কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির

মধ্যে যে-কেহ বর্ণের মিল করিতে পারিল, সেই মনে করিল, আমি গীত গাঁথিলাম; যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন, আমি গীত গাইলাম শ্রোতারা তাহা শুনিয়া মনে করিলেন, আমরা গীত শুনিলাম। বস্তুতঃ কথার বা বর্ণের মিল ব্যতীত আধুনিক গীতে আর কিছুই নাই। গীতে কেবল বর্ণ বাছিয়া এক-একটি করিয়া গাঁথা হয়। "বী" শব্দের পর "ণা" শব্দ গাঁথা গিয়াছে, অতএব এই দুই শব্দ মধ্যে মধ্যে গাঁথিলে গাঁথনির বড় শোভা হইবে। "বীণা" শব্দ অল্প অল্প ছেদ দিয়া গাঁথা গেল, গীত অপূর্ব্ব হইল।

ও বীণা, বাজ বীণা, হরিনাম বিনা
ইত্যাদি

গীত শুনিয়া শ্রোতৃগণ ধন্য ধন্য করিলেন; কেহ বা সিকি দিলেন, কেহ বা পয়সা দিলেন, কেহ বা পুরাতন বস্ত্র দিলেন। গীতগায়কের উপযুক্ত পারিতোষিক হইল।

যাত্রায় সমস্ত রাত্রি গায়িতে হইবে, অতএব অনেক গীত আবশ্যক। সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, ভাবপূর্ণ হউক আর না হউক, আবশ্যক হউক আর না হউক, গীত গাঁথিতে হইবে, গায়িতেও হইবে। সুন্দর বর্দ্ধমানের রাজপুরী প্রবেশ কিরূপে করিবেন, যাত্রাওয়ালা এই ভাবে আর্দ্র হইয়া গীত বাঁধিলেন।—

রাজার বাড়ী পাকা কোটা,
চারিদিগে প্রাচীর আঁটা,
বল মাসী কেমন ক'রে যাব।
ইত্যাদি

এই আশ্চর্য্য গীত শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবা পড়িয়া থাকে। "কপাট আঁটা" থাকিলে পুরে প্রবেশ সুকঠিন, এই ভাবটি তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। ভাব অপূর্ব্ব, শ্রোতৃবর্গের রুচিও অপূর্ব্ব।

আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়া লোকের পরিতৃপ্তি সাধন করা। যে-সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে সেই-সকল চিত্তবৃত্তিকে ঘৃণিত ও অপবিত্র করিতেছেন। বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয় নরকের প্রণয়। কৃষ্ণ-রাধার প্রণয় প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ-রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে কবির গুণে তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।

যাঁহারা আধুনিক যাত্রার নৃত্যগীত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মহাপুরুষ। আবার যে মহাত্মারা অভিনেতৃগণের বেশভূষা দেখিয়া বা কথাবার্ত্তা শুনিয়া মোহিত হয়েন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী।

কেলুয়া ভুলুয়ার সঙ্গে যে মেতরাণী আইসে, যাত্রায় রাণীর প্রয়োজন হইলে সেই উঠিয়া দাঁড়ায়; মেতরাণীর পর রাণীর পদ আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কথায় বার্ত্তায় রাণী ও মেতরাণীতে বড় প্রভেদ নাই, পরিচ্ছদে কিছু থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু যাত্রাওয়ালারা তাহা বড় জানে না; তাহারা রাণী কখন দেখে নাই, আপনাদিগের পরিবার দেখিয়া রাণীর ভাব-ভঙ্গি অনুভব করিয়া রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আপন প.রবারের অনুকৃতি সাজাইয়া দেয়। দর্শকেরা সেই রাণীকে অন্য স্থানে দেখিলে হয় ত জেলেনী কি মালিনী ভাবিতেন, কিন্তু যাত্রায় তাহাকে রাণী ভিন্ন অন্য ভাবিবার উপায় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে কার্য্যগতিকে তাহাকে কখন মেতরাণী, কখন খেমটাওয়ালী, কখন বাজীকর বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা পরিচয়ে বুঝিয়া লইতে হয়, পরিচ্ছদে নহে। কোন অবস্থাতেই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন হয় না। রাণী মেতরাণীর এক পরিচ্ছদ। সকল অবস্থাতেই সালুর শাটী বা ঢাকাই শাটী।

রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান্, আর তৈলাক্ত জরীর টুপি। সেই পরিচ্ছদে নকিব বা জমীদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন। একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদই লোকের পরিচায়ক। কে যোদ্ধা, কে পদাতিক, কে জজ, কে শিল্পী, তাহার পরিচয় পরিচ্ছদে পাওয়া যায়। এই কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমাদের যাত্রা-সম্বন্ধে ইহা খাটে না। আমাদের যাত্রায় কি রাজা কি দাস সকলেই এক-পরিচ্ছদ-ধারী। চাপকান্ তাহার মধ্যে প্রধান। বাজীকরের "বনমানুষের হাড়" স্পর্শমাত্র সকলের পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ যাত্রাকরের চাপকান্ পরিধান-মাত্র সকলের রূপান্তর করে। রাজা সাজিতে হইবে, চাপকান্ আবশ্যক। নৃসিংহদেব সাজিতে হইবে, সেই চাপকান্ আবশ্যক। হনুমান্ সাজিতে হইবে, আবার সেই চাপকান্ আবশ্যক। বুঝি চাপকান্ পরিলে হনুমানের মত দেখায়।

আমাদের যাত্রাকরেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয় ত ভূমিকর্ষণ করিত বা নৌকা চালাইত কিম্বা ভারবহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একবার সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি কতকগুলি যুবা বাবু যাত্রাকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপর যাত্রাকরদিগের ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া মার্জ্জিতরুচির উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; আমরা আহ্লাদিত-চিত্তে তাহা দেখিতে গেলাম; পথে শুনিলাম, সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে, আমাদের আরও আহ্লাদ হইল। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি, মোগলাই পাগড়ি মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত, চস্মা নাকে,

হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতকগুলি লোক কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পরে শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যেই একজন রাম, একজন লক্ষ্মণ, আর সকলে পারিষদ। আমরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম। সুশিক্ষিত যুবারা ভাবিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল-সদৃশ ছিলেন। তিনি চস্‌মা নাকে দিতেন, মুসলমানদিগের মত পাগড়ি মাথায় দিতেন, সাহেবদিগের মত আলবার্ট চেন পরিতেন। আমাদের অদৃষ্টই মূল!

আর একবার একদল কেরাণীর অভিনীত যাত্রায় দেখা গিয়াছিল, সীতা রেসমের রাঙ্গা রুমাল মাথায় বাঁধিয়া নাচিতেছেন। সূর্য্যের কিরণ লাগিলে মেছোবাজারের অধিবাসিনীরা যেরূপ ভঙ্গিতে রুমাল মাথায় দিয়া চিবুকনিম্নে গ্রন্থি দেয়, সীতা সেইরূপে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। আমরা একজন যুবা বাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, রাত্রে সূর্য্যকিরণের ভয় নাই, রুমাল সেজন্য বাঁধা হয় নাই, তবে ওষ্ঠলোম ঢাকিবার নিমিত্ত ওরূপ করিয়া বাঁধা হইয়াছে।

যেরূপ পরিচ্ছদ, তাহার অনুরূপ কথাবার্ত্তা। রাণীই হউন আর মেতরাণীই হউন, একই পরিচ্ছদ; রাণীই হউন আর মেতরাণীই হউন, একইরূপ কথাবার্ত্তা। পরস্পরের যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইলে পরস্পরের কথা স্বতন্ত্র হইবে, তাহা যাত্রাকরেরা বড় জানে না। যাত্রাকরেরা কেন? অনেক আধুনিক নাটক-প্রণেতারাও তাহা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা মনে করেন বুঝেন, দেখা গিয়াছে, তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝেন যে, কথাবার্ত্তা স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থার লোককে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করান। তাঁহারা কোন ইতর লোককে কথা কহাইতে হইলে ইতর ভাষায় কথা কহাইয়া থাকেন, কোন ভদ্রলোককে কথা কহাইতে হইলে সাধুভাষা প্রয়োগ করান, কিন্তু যে স্থলে উভয়েই ভদ্রলোক কি উভয়েই ইতর লোক, উভয়েই একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করে, সে স্থলে, বড় গোলযোগ হয়; ভাষার মর্ম্মও এক হইয়া পড়ে।

স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র গতি, স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের ভাষা এক হইতে পারে, কিন্তু ভাষার মর্ম্ম স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা আমাদের দেখাইয়া দিলে, আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহা স্বয়ং দেখাইতে পারি না। তাহা কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমাদের যাত্রাকরেরা প্রতিভাশালী নহে, তাহাদের নিকট এ-সকল নির্ব্বাচনের প্রত্যাশা করি না। এমত বলি না যে, শ্রীরামচন্দ্রের মত তাহারা কথা কহিতে পারিবে, বা লক্ষ্মণ কথা কহিলে তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি একেবারে লক্ষ্য হইবে না। যাত্রায় কি গ্রন্থে বক্তাদিগের প্রকৃতি রক্ষা করা অতি কঠিন।…

খ্রী. ১৮৭৫

শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম : শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক-সাহায্য-প্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণপথে আসিল—

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন—

Full many a lady
I have eyed with best regard ; and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues
Have I liked several women ;
... ... but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে-কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়— কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই-সকল কামনায়, নানা বিলাস-বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা ও মিরন্দায় এই কালিমা নাই ; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন— সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নবমল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণ-কারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নবমল্লিকার উপর ; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর ; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহগমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায়

হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন— লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form :—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে-সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই— অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine; for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are, then, most humble; I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শ-শূন্য ছিল ; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্য-হৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে— এক স্থানে কণ্বের তপোবন— অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন— অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা -চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, *ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।* যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত-সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই— মিরন্দা সে সকল জানে না ; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিতচিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw ; the first
That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন

বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, একপ্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—*শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল* নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

by my modesty,—
The jewel in my dower,—I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ—

Hence, bashful cunning!
And prompt me, plain and holy innocence!
I am your wife, if you will marry me;
If not, I'll die your maid: to be your fellow
You may deny me; but I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা-ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও-জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহানুচিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলায় যে আলাপ—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত

গৌরব নাই— মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই— কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি— একটু একটু চাতুরী আছে— যথা "অদ্ধপধে স্থমরিঅ এদস্‌স হথত্তংসিণো মিণালবলঅস্‌স কদে পড়িণিবুত্তম্হি।" ইত্যাদি। *একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—*

নমু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"— এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে— বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি— অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখা দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত-মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে— সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে— রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ-করিয়া-প্রেম-করা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে— তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়— "অসন্তোসে উণ কিং করেদি" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল— "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"— সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ— দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন

শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে— তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী, এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়: শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল— কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর-এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া— কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধূ।
এক্কক্কস্ সঅ চরিএ ভণাদু কিং এক্ক এক্কস্‌সিং॥

তুলনীয়া— কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন— উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া— কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল— উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর অত্যাচার -পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময় ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর-অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—

কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্ট -দোষে বা -গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া— কেন না, উভয়েই পরমস্নেহশালিনী— উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে-সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক-উপন্যাস-নবন্যাস-প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহম্ভোঃ" শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎ-সংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি— প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে", তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্‌স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,
What shall I do to win my lord again?

Good friend, go to him ; for, by this light of heaven,
I know not how I lost him. Here I kneel :—

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই— অভিমান নাই— অবিনয় বা অস্নেহ নাই— দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক-মুহূর্ত্ত-জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে— কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে-সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি -বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা— আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি— সাহিত্য-সংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা-শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্নজাতীয়ে ভিন্নজাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্নজাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয়-দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর-একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে— তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-

প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড— কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক— ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান-কাব্য ; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না ; কেন না, এরূপ উপাখ্যান-কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল— অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি ; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক— শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান-কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে— মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই— ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না, যথা :—

> ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
> বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না ; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র ; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত ; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

খ্রী. ১৮৮৭

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লিখিবার ভাষা

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী ককনী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য[১] গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদী-দিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক বা না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা -হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী— যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা— তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না— পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।[২] আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?— আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল— পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি— কিন্তু পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ওসকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?— বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না? ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?— আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে, জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়— মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন-করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার

সময় বলিবে, "হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া"। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা-বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত-সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন-জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন

না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব-প্রত্যয়ান্ত এবং য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা— একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা— গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা— জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা— মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি", কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই "খেউরি" শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম

সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণে প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে— তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব" "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আর আমরা দেখি না। যদি কোন ধনবান ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা

মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেইমত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাবপূরণ-জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? "মাধ্যাকর্ষণ" বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। "গ্রাবিটেশ্যন্" বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য— অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য— তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত

অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত— ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া, আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন-পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্যজ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায় অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য— সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে ? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত

সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই— নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে— যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে— তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে— কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে— লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

খ্রী. ১৮৯২

১ পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত— এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে; চণ্ডিদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকারী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

২ যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি এক ছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই— তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

আমার মন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার মন কোথায় গেল ? কে লইল ? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল ? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার 'মনচোর' কাহাকে পাইলাম না ? তবে কে চুরি করিল ?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চি-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুট-বুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময় কাংস্যময় কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর -বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ডমণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেষণে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন

দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামনের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না— আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না— নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়ে বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে; তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে— প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনী আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুন্‌বি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম— সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব— সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। একজন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই-জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোধ্নী। একজন গব্যরস সৃজন করেন, আর-একজন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীরকৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীরকৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীরকৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে— বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল— তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না— এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই— আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই— এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না— কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম— পরের হইলাম না, এইজন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রীপুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে

পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে; মানসম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে— শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম, করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধনমান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে

বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না— কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"[১] উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্যসম্পদ্ বড় ভালবাসেন— ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন— তাঁহারা আসিয়া এ দেশের বাহ্যসম্পদ্-সাধনেই নিযুক্ত— আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে— সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য-সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে— দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল— দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখে বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও— কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদপত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্‌চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্। বাহ্যসম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্। টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে! ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকাবৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝন্‌ঝনিতে ভারতবর্ষ পূরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ্। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল্ তন্ত্র হইতে এ পূজার

মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদপত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদপত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা করি। বাজা, ভাই, ঢাক ঢোল— ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্। বাজা ভাই কাঁসিদার— ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের[২] নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটা কতক কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্যসম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না— আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি— কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি— সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী

নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই; সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ-নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসেব বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

খ্রী. ১৮৭৫

১ বাগসম্পাদ্।

২ পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে, পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িঘুড়ি, পোযাক এবং বেশ্যা— এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

সাধনা : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশের পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক রহস্যে একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিলেই আমাদের দেশের রোগের মূল যে কোন্‌খানটিতে তাহা চিকিৎসকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। রোগটি বড় সহজ নয়— তাহা পক্ষাঘাতবিশেষ।

বৈদিক সময়ে আমাদের দেশের পিতৃপুরুষদিগের মনে কৃত্রিমতার আবরণ যেমন ছিল না বলিলেই হয়, এখন আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক তার বিপরীত! এখন দেখিতে পাওয়া যায়— খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলা ফেরা সকলই কৃত্রিম ধর্ম্মাবরণে আবৃত! কৃত্রিম শব্দের অর্থ এখানে কপট নহে; যাহা সহজ শোভন নহে —যাহা কষ্টকল্পিত— তাহারই নাম কৃত্রিম— ইংরাজিতে যাহাকে বলে artificial। যেখানেই দেখিবে— কড়াক্কড় কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের বেশী বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, সেইখানেই জানিবে বজ্রের বাঁধন ফস্কা গিরে— অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে, অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত অমুক দণ্ডে দেবারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অমুক দণ্ডে অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে, অমুক দণ্ডে অতিথি-সংকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে— বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিবে— এইরূপ শক্তাশক্তি কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; —কী? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী— বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে তিন দিনে সাঙ্গ হইয়া যায়; সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা পিতৃতর্পণাদি কতকগুলি মুখস্থ শব্দ উচ্চারণ মাত্র; এবং পূজা-উৎসবাদি আর কিছু নয়— পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া লওয়া, একপ্রকার রোজাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো!

যেমন বলিলাম— বৈদিক কালে— ঋষিদের দেবতাস্তব তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিল; তাহা মুখস্থ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ছিল না; তাঁহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত না। ক্রমে হইল, অমুক সময়ে অমুক যজ্ঞে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে— অমুক যজ্ঞে অমুক প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে— অমুক যজ্ঞে এইরূপ পশু এবং এতগুলা পশু এইরূপে হত্যা করিতে হইবে— এইরূপ কত যে বাল্যক্রীড়া তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদের কারণ আর কিছুই না।— তিনি যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তা বই, তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিলে কখনই এ কথা কাহারও মনে তিলার্দ্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকালের লৌকিক

প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সেই দিকে আর-একটু মাত্রা ঝোঁক দিয়াছিলেন, সেই-গতিকে চারি দিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক। বুদ্ধদেবের তপস্যার প্রভাবে সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার চকিতের ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল— দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারতব্যাপী দেশীয় ঐক্যবন্ধন অভিব্যক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার দেখা দিয়াছিল! কিন্তু হইলে হইবে কি— তখনকার সেই সৌভাগ্যের কাল আমাদের দেশের ভাবী দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানির মুখ্য সময়— সাময়িক কার্য্য সময়ে হওয়া চাই— সেই মুখ্য সময়টিতে যদি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন্ হইবে; অতএব দেও বুদ্ধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া— বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্ম্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের কীর্ত্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও! যাগযজ্ঞের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হউক! অনেক বৎসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধুম লাগিয়া যাক! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের শুষ্ক মুখ হর্ষকিরণে সমুজ্জ্বল হউক! এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিব্যাধি নির্ব্যথা হইয়া গেল— সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও রহিল না— জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ব হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল! আবার আমাদের দেশ যে-কে-সেই! পুরাবৃত্তের অঙ্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই শুখাইয়া মরিল। এক দিকে 'আমি ব্রাহ্মণ আমি মস্ত লোক' 'আমি ক্ষত্রিয় আমি মস্ত লোক' এইরূপ কৌলিক বড়ত্ব, আর-এক দিকে 'আমি শূদ্র আমি ক্ষুদ্র লোক' এইরূপ কৌলিক ছোটত্ব; এক দিকে প্রভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ, আর-এক দিকে অভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ— দুয়ের বেগাতিশয্যের মাঝখানে পড়িয়া জনসমাজের হস্তপদ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। এই-গতিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া একটা যে বিজ্ঞান-সামগ্রী তাহা আমাদের দেশে জন্মিতেই অবসর পাইল না। কৃত্রিম ধাঁচার ধর্ম্মবন্ধনে লোকের হাত-পা বাঁধা থাকিলে কেহই স্বাধীন ভাবে কোনো কার্য্য করিতে পারে না;— আর যে কার্য্য স্বাধীন ভাবে কৃত না হয়— পুরাবৃত্তের বাজারে সে কার্য্যের বিশেষ কোনো মূল্য থাকিতে পারে না। রাজারা প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত কোন্ মুহূর্ত্তে কী কাজ করিবেন তাহা শাস্ত্রে সবিস্তরে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে— যে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা মানিয়া চলিলেন সেই রাজা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিলেন, আর যিনি তাহার একচুল এদিক্ ওদিক্ করিলেন তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন! এইরূপ যেখানে

কৌলিক প্রথা মানিয়া চলা না-চলার উপরে রাজাদের সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতি যশ-অপযশ নির্ভর করে, সেখানে কাজেই জাতির গুণাগুণই ব্যক্তির গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এবং পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজের কোনো স্বাধীন কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কালিদাসেও রঘুবংশের সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গুণবর্ণনায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়—

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥···
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।

এইরূপ শাস্ত্রীয় বন্ধনে বাঁধাসাঁধা কার্য্য ছাড়া, স্বাধীন-ভাবে কোনো রাজা যদি খুব একটা ভাল কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন (যেমন বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন), তবে তাহা এ দেশের পুরাতনপথাবলম্বী ইতিহাস-লেখকের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিতে পারে না।

লোকের বড়ত্ব ছোটত্বের দুইটি বিভিন্ন ধরণের পরিমাণ-দণ্ড— জন্ম এবং কর্ম্ম, জাতি এবং কীর্ত্তি, ভূ-ধাতু এবং কৃ-ধাতু। আমাদের দেশে ভূ-ধাতু কৃ-ধাতুর হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে এমনি-একটা কাঠের পুতুল বানাইয়া তুলিয়াছে যে, আমাদের এখানে কৃ-ধাতুকে লইয়া যতকিছু নাড়াচাড়া— যতকিছু ক্রিয়াকর্ম্মের আড়ম্বর— সমস্তই এক প্রকার পুংলোবাজিরই সামিল। আগাগোড়া সবই তারে-ঝোলানো কাঠের পুতুলের কাণ্ড— তার আবার ইতিহাসই বা কী আর পুরাবৃত্তই বা কী। কথাটি এই যাহা বলিলাম, ইহা আমার নিজের মনঃকল্পিত কথা নহে— ইহা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐরূপ মর্ম্মবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস সকল শাস্ত্রেরই প্রাণের মধ্য হইতে ভূয়ো-ভূয় বাহির হইতে দেখা যায়। দেখো-না কেন— রাশি-রাশি মুখস্থ শাস্ত্রবচনের এবং অসংখ্য খুঁটিনাটির ভারে প্রপীড়িত হইয়া, কর্ম্ম এমন যে ভাল সামগ্রী, তাহাও আমাদের দেশে একপ্রকার যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুশাসিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করে যে, কী দর্শন কী পুরাণ কী তন্ত্র সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়াছে— কর্ম্মবন্ধন। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আলস্য এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; তার সাক্ষী 'shackles of indolence', অবসাদের শিকল, আর, কর্ম্মই কেবল সেই জড়তার বন্ধন খুলিয়া দিতে পারে, তা ছাড়া আর কেহই তাহা পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে এ কি বিপরীত— কর্ম্ম নিজেই বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন তিনি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন, যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইলেন, তবে আর বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কী?

কর্ম্মমাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিলে দ্বিতীয় কর্ম্মটিও বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্মবন্ধন ঘুচাইবার জন্য তপ-জপাদির সাধন আবশ্যক, তবে তপ-জপাদি কর্ম্মের বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তৃতীয় কর্ম্ম-সাধনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পার না; কেননা— তুমি বলিয়াছ কর্ম্ম মাত্রই বন্ধন। তপ-জপাদি না হয় সোনার বন্ধন, চুরি-ডাকাতি না হয় লোহার বন্ধন; কিন্তু বন্ধন দুইই। হদ্দ তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, সৎকর্ম্ম করিলে অসৎকর্ম্মের লোহার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোনার শৃঙ্খল জড়ানো হয়; কিন্তু তাহাতে কী? লোহার শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সোনার শৃঙ্খল জড়ানোকে কিছু আর মুক্তিসাধনের উপায় বলা যাইতে পারে না। একটা পক্ষীকে লোহার পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সোনার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্ম্মবন্ধন, তবে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুক্তির জন্য যতই যিনি সাধ্যসাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন জলে পড়িলে কূলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যতই হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়, হাত-পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া যায়, তেমনি মুক্তির জন্য সাধনা করিলেও কর্ম্মবন্ধন— না করিলেও স্বভাব-সুলভ সংসারবন্ধন— বন্ধনের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ভাবিয়া দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, 'কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন' এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন-বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে— ১. কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, যেমন যাগযজ্ঞাদি; ২. নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যেমন চুরি-ডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে-- কী? না, নিষ্কাম কর্ম্ম। শাস্ত্রে বলে আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইহারা বলেন, এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; তা ছাড়া, নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর-এক কথা বলে— সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়বিধ ধর্ম্মেরই, ধর্ম্ম মাত্রেরই, একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; তা

বই মুখে এক, মনে আর, অথবা কাজে আর— এ ভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে। না তাহা কাম্য কর্ম্ম, না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণীভুক্ত। চতুর পরামর্শদাতাকে একজন খাঁটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেন যে, তুমি বলিতেছ মুখে 'পুত্রং দেহি ধনং দেহি' এবং মনে 'কিছু দিতে হবে না মা, ছেড়ে দেহি'— ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম! মানিলাম যে, তোমার মনের মধ্যে ধনের কামনা নাই, পুত্রের কামনা নাই, যশের কামনা নাই; কিন্তু মায়া-ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইবার কামনা আছে তো! এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না!' আমরা তাই বলি যে, নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে ভিন্ন— তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—সংসারাসক্তি; নিষ্কাম কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক— বৈরাগ্য, অথবা যাহা একই কথা— ভগবদ্‌ভক্তি!

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্ম্ম ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা, ভগবদ্গীতা বলেন: কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ। 'কর্ত্তব্য' এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম— সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য— কথা একই, কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফলকামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেকে মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস-কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ-পাষাণে গঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হচ্চে অনুরাগের ঠিক উল্টো— মুখ-শিট্‌কোনো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ-সোপানের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ; তাঁহাদের কাছে বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ, বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া একই কথা। এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু-না-কিছু ত্যাগস্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু ত্যাগস্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না— সেটি এই যে, লোকে 'ত্যাগস্বীকার করিব' বলিয়া ত্যাগস্বীকার করেও না— করিতে পারেও না। ত্যাগস্বীকার যিনি যখন করেন, তখন, একটা বিষয়ের ভালবাসা-সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগস্বীকার করেন; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে ত্যাগস্বীকার

করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে, কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ— অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা -ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। এইজন্য আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ, এবং কাহার উপরে কোন্‌টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্যমঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পঁইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে— ১ প্রাণানুরাগ, অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ; ২ গৃহানুরাগ, অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার একপ্রকার মানসিক প্রাণ, ইহা বলা বাহুল্য); ৩ কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ; ৪ দেশানুরাগ; ৫ সার্ব্বভৌমিক অনুরাগ, অর্থাৎ সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; ৬ ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগ-সোপানে যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, কেহ বা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; আবার, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড়জোর এক ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারে; তা বই, দুই-তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক, ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকালে স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত-না সদুপদেশ প্রদান করিলেন— সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল একই অভিন্ন কারণে ঈসাকে ইহুদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারতবাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল; সে কারণ আর কিছু না— নীচের পংক্তির লোক দুই-তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পারে না, ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধদেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিল— তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ

অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মেরই একটি প্রচ্ছন্ন উপশাখা। সে যাহাই হউক, দোঁহার প্রবর্ত্তিত দুই সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম পৃথিবীর দুই মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্তস্থানে ছট্‌কিয়া পড়িল— বুদ্ধের ধর্ম্ম পূর্ব্বপ্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল, ঈসার ধর্ম্ম পশ্চিমপ্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল।

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কী হইবে! ইতিহাসের রহস্যটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো; তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা ক্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ সশরীরে না হউক সদলে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না— লোকদিগকে কৃত্রিম ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া! যাগযজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবাসী লোকদিগকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধের হৃদ্‌গত সঙ্কল্প ছিল, এবং ফারিসীয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহুদী জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার হৃদ্‌গত সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, ঈসার ধর্ম্ম ঘূর্ণাবায়ুর ন্যায় ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

যেদিন বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতী-মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পূর্ব্বসাগরে ঝম্প প্রদান করিল, সেই দিন মাতা-ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণকে বলিলেন— 'বুদ্ধদেব তোমাদিগকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্তপদ হইতে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে! বুঝিয়াছি— তোমরা মুক্তি চাও না, তোমরা চাও বন্ধন! তথাস্তু! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক! স্বাধীনতা তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া বাঁচিয়া অস্পর্শীয় ম্লেচ্ছদিগের গৃহ উজ্জ্বল করুক! যেমন তোমরা বন্ধনপ্রিয় তেমনই তোমাদের দশা হউক, সেই ম্লেচ্ছদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক।' দেখিতে-না-দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেঘ মুসলমান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্যুৎক্রীড়া এবং মস্তকের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল— সেই এক দিন! এবং তাহার পরে গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশ দিক্ ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন— এই একদিন! এইরূপে (দেশের অন্ধীভূত

নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া ভয়-আশা এবং আশা-ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না; আমরা আরো বন্ধন চাই, আরো বন্ধন চাই! আবার আমরা, গাঁয়ে মানুক্ না-মানুক্, আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন যেখানে একটু আধটু আলগা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার গিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতেছি। যদি আমাদিগকে কার্য্যগতিকে সমুদ্রযাত্রা করিতে হয়, তবে মৃত শাস্ত্রকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা চাই; তাকাইয়া না থাকিলেই নয়, তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য! মৃত শাস্ত্র কী আর বলিবে— তাহার পিছনে লুকাইয়া থাকিয়া পাণ্ডারা বলেন 'হাঁ, সমুদ্রযাত্রা করিতে পার, তবে কি না—' ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! ইহাঁদের এইরূপ দুই নায়ে পা দেওয়া ভাষাকে— যদি-কিন্তু-তবে-কিনা প্রভৃতিকে যাঁহারা অব্যর্থ বেদবাক্য মনে করেন, তেমন লোক আজিকের বাজারে খুবই কম; বাঙ্গালা মুলুকে তো নাই-ই, সমগ্র ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ! এসব হচ্চে আর কিছু না— ইংরাজিতে যাহাকে বলে policy! কখনো কখনো যেমন দেখা যায় যে, ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়া মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ ছাড়িয়া আফিম ধরে, অবশেষে মদও চলিতে থাকে আফিমও চলিতে থাকে— ইহাঁদের পলিসীও তেমনি! ঊনবিংশ-শতাব্দীয় সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন এড়াইবার মানসে ইহাঁরা শাস্ত্রীয় কৃত্রিম বন্ধনের গিরা শক্ত করিয়া আঁটিবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইতেছেন। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, দুই কৃত্রিম বন্ধন পরস্পরের পানে চোক টেপাটেপি করিয়া শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করিতেছে! শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলিতেছেন যে, 'আমাদের আশ্রিত অনুগত থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া বিলাতে যাইতে পার, খানা খাইতে পার, সবই করিতে পার, তাহার জন্য চিন্তা কী!' ঊনবিংশ-শতাব্দীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলেন যে— 'গোবরের বটিকা দশ গ্রেণের পরিবর্ত্তে এক গ্রেণ এবং তাহার অনুপান সের-ভর সূপ— এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়! তাহাই অনুমতি হোক।' শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলেন— 'তা সেরূপ ব্যবস্থা আমরা দিতে না পারি এমন নয়— তবে কিনা—! যাই হোক— তুমি দুর্ব্বল অধিকারী, তোমার জন্য, সকলের জন্য নয়, শুধু কেবল তোমার জন্য, আমরা তোমার ইচ্ছানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থা দিতে কোনো হানি বোধ করি না— অতএব তথাস্তু!' এরূপ পলিসী পাড়াগেঁয়ে দলাদলিতে খুবই কাজে লাগিতে পারে ইহা আমি বিলক্ষণই জানিতেছি; কিন্তু এটাও তেমনি

জানিতেছি যে, এরূপ পলিসীতে ভারত উদ্ধার করিতে যাওয়া এক-আধ ছিলিমের কর্ম্ম নহে! ইহাঁদের পলিসীর আর-এক উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে বল নাই সেখানে বলের একটা প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া কৌশলে কার্য্যোদ্ধার! মানিলাম যে, একটি কচি বালককে সোলার সাপে ভয় দেখানো যাইতে পারে, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া বিস্‌মার্ক বোনাপার্ট এবং প্রভু ক্লাইবের চেলাদিগকে তেমনি করিয়া ভয় দেখাইতে যাওয়া— পলিসীটি কিছু যেন অতিরিক্তমাত্রা বলিয়া বোধ হয়! পৃথিবীতে যে সময়ে উন্নত বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্যের জ্ঞানানলশিখা দিন দিন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে সমুত্থান করিয়া যোজন যোজন দূরে জ্যোতির্মণ্ডল বিস্ফারিত করিতেছে— সেই সময়ের এই প্রকট দিবালোকে ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে কতকগুলা জরাজীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড— যাহার প্রাণ যাহাকে ফেলিয়া পালাইয়া অনেক কাল হইল প্রেতলোকে ঘরবাড়ি ফাঁদিয়া সুখে বসবাস করিতেছে— মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিবার নামও করে না— সেই শবদেহটাকে বীর-পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাকে জলন্ত সত্যের অভিমুখে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, এবং আপনারা দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'ভ্যালা মোর বাপ! মুখের এক ফুঁয়ে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে, এক ফুঁয়ে!' বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্-প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের পেষণ-যন্ত্র হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদয়েরা, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া— তাহার শাঁস কোনো কাজের হইল না জল কোনো কাজের হইল না— তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত-পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন। এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়— কত না জানি দেশের উপকার সাধন হইতেছে! টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে, ফোঁটাহীন ললাটে ফোঁটা আবির্ভূত হইতেছে, বিলাত-ফের্ত্তারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন— দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে? ইহাঁরা এই এতগুলা ব্যক্তি, আর, জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন— দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কী মনে হয়? মনে হয় যে— অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন-ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না, ইহুদীরা ঈসাকে চিনিল না, সেই কারণেই বা রামমোহন

রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কী? তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী মহান্ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'ওটা বিধর্ম্মী— ওকে দূর করিয়া দেও!' এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ধূলা-কাদা ইঁট-পাট্‌কেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ-সোপানে যিনিই যত উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করুন না কেন— একটি নিয়ম কিন্তু সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়; সেটি এই যে, নীচের পঁইটা না মাড়াইয়া উপরের পঁইটায় পদনিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে, আর আর-একজন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তা বই এরূপ কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঁইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্ত্তে চতুর্থ পঁইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারাবাহিক প্রকরণ-পদ্ধতি আছে, তাহা এই—

যে-কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না— কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুখাইয়া মরে না— বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধাবীর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে সমরক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পরদিন প্রত্যূষে রণভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন-বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে; কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-

প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্টকবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকসিত হয়— নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকসিত হয় তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে, তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশপ্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রস পান করিয়া মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রস পান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রস পান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ; ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, এক দিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রসপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর-এক দিকে যেমন পল্লবপুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রসপ্রবাহ পরিশোধন করে, তেমনি নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপরের ধাপের অনুরাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরিশোধন করে; গৃহানুরাগ-কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে; কুলানুরাগ দেশানুরাগকে পরিপোষণ করে, দেশানুরাগ কুলানুরাগকে পরিশোধন করে; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুরাগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; আর এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াসক্তি অথবা কাম; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না, অনুরাগ হইতে দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন, রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন, অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ—গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব চেয়ে বেশি; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং

বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয়; এইরূপে, এ-বাড়ির প্রতি অনুরাগ এবং ও-বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক হইতে পারে— তাহা কী উপায়ে? উপায় আর কিছু না, গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া। এ-বাড়ি এবং ও-বাড়ির মাঝখানে মনোমালিন্যের যত-কিছু অন্ধকার সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায়; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক-ইতিবৃত্ত এই— প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয়; তৃতীয়তঃ, কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পঁইটায় এ যেমন দেখা গেল— কুলানুরাগের পঁইটাতেও তাই; আমাদের দেশে হিঁদুমুসলমানের মধ্যে যত-কিছু মনোমালিন্যের জ্বর-জ্বালা, দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিই তাহার একমাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক-রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়— অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পঁইটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে, তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের বাড়াবাড়ি, অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি; যেখানে আমিটি এবং আমারটিই সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটির আর সব ভাল কেবল টি'টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব'টাই) বিষের খানি। অনুরাগের নীচের নীচের পঁইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, উচ্চ উচ্চ পঁইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষদাঁতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে। বিষদাঁতের আকার-প্রকার

ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয়; গৃহানুরাগ বিষদাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র যদি বলে 'এরা আমার বাড়ির ছেলেমেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না' তবে তাহার অর্থই এই যে, আর কারো বাড়ি বাড়িই নহে! কুলানুরাগ যখন বিষদাঁত বাহির করিয়া বলে 'আমি ব্রাহ্মণ— নৈকষ্য কুলীন —অমুকের সন্তান।' তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষদাঁত বাহির করিয়া বলে 'আমি ইংরাজ' তখন তাহার অর্থ এই যে, তুমি নিগর— তা তুমি লোহার আফ্রিকা দেশেই থাকো আর সোনার ভারতবর্ষেই থাকো, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ মিশানো রহিয়াছে; আর, অনুরাগের সঙ্গে এইরূপ অন্ততঃ দু-ফোঁটা এক-ফোঁটা বিষ মিশানো না থাকিলে পৃথিবীর জিহ্বায় তাহা আলুনি-আলুনি ঠেকে। তবে, অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের ধাপে বিষের যেমন সাঙ্ঘাতিক প্রকোপ, উপরের উপরের ধাপে তা অপেক্ষা তাহা মাত্রায় অনেক কম; তা ছাড়া, অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষ, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, ঈশ্বরানুরাগ; তা ভিন্ন আর-আর সমস্ত অনুরাগই জগৎসংসারকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে—আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষ। কারো কাছে 'আমিটি'ই কেবল আপনার, আর সকলেই পর; কারো কাছে, আমিটি স্ত্রীটি পুত্রটি কন্যাটি ভাইটি ভগ্নীটি পর্য্যন্ত আপনার, তদ্ভিন্ন আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বজাতি পর্য্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর; কারো কাছে আমিটি হইতে স্বদেশ পর্য্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর। এই প্রণালীতে লোকে অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের পঁইটা হইতে উপরের পঁইটায় পদার্পণ করিতে থাকিলে তাহার আত্মপক্ষ ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতে থাকে—তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু পক্ষিশাবক যতদিন না মুক্ত আকাশে উড়িতে শেখে ততদিন তাহার পক্ষবিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না; ততদিন তাহার উত্থানের সঙ্গে পতন জোড়া লাগানো থাকে। লোকে যতদিন না ঈশ্বরানুরাগের মুক্ত সমীরণে উত্থান করে ততদিন তাহার আত্মপক্ষের সঙ্গে একটা-না-একটা পরপক্ষ জোড়া লাগানো থাকিতেই চায়; ততদিন হয় এ-বাড়ির দ্বারের সম্মুখে ও-বাড়ি, নয় এ-জাতির দ্বারের সম্মুখে ও-জাতি, নয় এ-দেশের দ্বারের সম্মুখে ও-দেশ, অষ্টপ্রহর চক্ষু রাঙাইয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইতে থাকে! কেবল ঈশ্বরানুরাগের পঁইটায় জগৎশুদ্ধ সকলেই আত্মপক্ষীয়—সেখানে পরপক্ষের মূলেই দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহার কারণ এই যে, স্বদেশীয়

রাজ্যের বাহিরে যেমন বিদেশীয় রাজ্য, ঈশ্বরের রাজ্যের বাহিরে তাঁহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজ্য স্থান পাইতে পারে না ; যেহেতু ঈশ্বর আত্মপর সমস্ত ব্যাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমস্তেরই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এইজন্য ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ এই যে, ত্রিজগতে কেহই তাঁহার পর নহে ; তাহার সাক্ষী চৈতন্য-মহাপ্রভু মুসলমানকে দলে লইতে ডরান নাই, রামমোহন রায় বিলাতে যাইতে ডরান নাই, ঈসা জেলে মাল্লা এবং পব্‌লিকান প্রভৃতি ঘৃণিতসম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরান নাই। কিন্তু হিঁদুয়ানির বড়াই যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা পরিচয়-লক্ষণ এবং বিজাতির প্রতি বিরাগ যাঁহাদের বৈরাগ্যের চরমসীমা, তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্য ঐ পর্য্যন্ত ! ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ-সংসারের মধ্য হইতে একটি কোনো ব্যক্তি অথবা একটা কোনো পরিবার বা জাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষরূপে আসক্ত হওয়ার নামই লোকে জানে অনুরাগ-বন্ধন ; কিন্তু যে বিশ্বব্যাপী অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকলেরই প্রতি সদ্ভাবের ক্রোড় পাতিয়া দেয়, তাহাকে চক্ষের সমক্ষে বিরাজমান দেখিলেও খুব একজন পাকা জহরী ব্যতীত যে-সে লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া লোকে ভাবে যে, 'এ আবার কিরূপ অনুরাগ ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা। সকলকে ভালবাসা আবার কিরূপ ? সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান। এ তো অনুরাগ নহে, এ একপ্রকার বিরাগ ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি— অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না !' বাস্তবিক এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের নাম হইয়াছে— বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা— আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহপত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না ; তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন, 'ও মা ! সোনার স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাত্নী ফেলিয়া যে লোক যুদ্ধে যাইতে পারে সে সবই পারে, তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন— তাহার আবার অনুরাগ !' এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোক-বিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কী ? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র, সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হন— কেন না, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কী অর্থে বৈরাগ্য এবং কী অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা তাহা

এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুদ্ধ কেবল আমিটি এবং আমারটি লইয়া অনুরাগের যে একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমিটি আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেন না আমিটি আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে) এই অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে সমস্ত জগতের সহিত আমিটি এবং আমারটির সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি —টি-ধ্বনিটি— পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি-ধ্বনিটি আর কিছু না— বিষয়াসক্তি। বিষয় শব্দের অর্থই হচ্ছে— মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে, মনের একপ্রকার বালিশ; সাধুভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায়; কাজেই, সেই বিষয়টির সীমার বাহিরে যাহা-কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত অনুরাগ; তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম; এইজন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ, অথবা যাহা একই কথা— বিশুদ্ধ প্রেম।

অনুরাগ-সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া আসে। তাহার প্রমাণ এই যে, আদুরে ছেলের মায়ের বিষ অপেক্ষা পাড়াগেঁয়ে কুলীন সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম, কুলীনের কুলোপানা চক্রের ফোঁস-ফোঁসানি অপেক্ষা মানোয়ারি গোরার মুখের বিষ অনেক কম— হদ্দ ড্যাম্ নিগর-টা আস্‌টা, তার বেশী নয়! তাও আবার অর্দ্ধেক মুখে, অর্দ্ধেক পেটে। পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পাড়া সরগরম করা কুলীন সন্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি। এটা সত্য যে, কুলীনের মুখের আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ বই নয়, গোরা-লোকের বাল্যক্রীড়া কালা-লোকের মৃত্যু। কিন্তু হইলে হইবে কী— এটাও তেমনি দেখিতেছি যে, ষাঁড়ের শৃঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিঁপড়ের কামড়ে কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; অথচ বিষাক্ত বলিতে আমরা কেটো পিঁপড়ের কামড়কেই বিষাক্ত বলি, শৃঙ্গের আঘাতকে নহে। অধিক কী আর বলিব, দেশানুরাগের গালাগালিও দেশ-ঘটিত, কুলানুরাগের গালাগালিও কুল-ঘটিত! কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হচ্চে বাপান্ত, দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হচ্চে দেশান্ত— যেমন ড্যাম নিগর প্রভৃতি সাদর সম্ভাষণ! এখন জিজ্ঞাসা করি— বিষ বেশী কার?

বাপান্তের না দেশান্তের? অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পণ করে, ততই তার বিষ নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; আর যতই তাহা সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণ কোটরে প্রবেশ করিতে থাকে ততই তার বিষদাঁত গজাইয়া উঠিতে থাকে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না— নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর-পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর-এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পঁইটায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

অতঃপর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাধনের মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

কুলানুরাগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভবপর আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তিদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভবপর প্রতীচ্য দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। সংক্ষেপে, প্রতীচ্য ভূখণ্ডের দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের কুলানুরাগ, হিতানুষ্ঠানের মূল-প্রবর্ত্তক।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারি দিক হইতে মুহুর্মুহু এইরূপ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে যে, 'সব গেল, সব গেল, কিছুই আর থাকে না!' কাঁদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর-এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ততক্ষণ দেশের অরাজক-অবস্থা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক-অবস্থার প্রতিবিধান-মানসে মৃতরাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাখে! কুলানুরাগ এবং দেশানুরাগ দুয়ের মাঝখানে অরাজকতার মুলুক, ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি; কিন্তু তার

সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে সিংহাসনে বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যদি কুলানুরাগের নীচের পঁইটা হইত, তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে, 'হে ভ্রাতৃগণ, দেশানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!' কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে, কুলানুরাগ তো দেশানুরাগের উপরের পঁইটা নহে— দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পঁইটা। কাজেই উপদেষ্টার মুখে উল্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, 'কুলানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর।'

কিন্তু আমাদের দেশে দেশানুরাগের বড়ই এক্ষণে দুর্গতি। এক্ষণে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি পনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিঙাইয়া দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত-সকল প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে; অথচ দেশানুরাগ যে কী পদার্থ তাহা তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছে না— কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের আবরণের মধ্যে তাহারা স্বার্থের মায়াবী রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মহাত্মাদিগের যশোরশ্মির অভ্যন্তরে তাহারা নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে— আর এখন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্তু হইলে হইবে কী— দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের নিকটে অপরিচিত। কুলানুরাগের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া যেমন তাহারা দেশানুরাগের পঁইটায় পা দিবার উপক্রম করিতেছে, আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা নীচের ধাপে নামিয়া পড়িতেছে; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে— নামিয়া পড়িতেছে গৃহানুরাগে! ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে।

আসল কথা এই যে, দেশানুরাগকে আমরা যে হাত বাড়াইলেই মুঠার মধ্যে পাইব এরূপ এক্ষণে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে রাজবংশীয় লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের কত-না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইরূপ অনেক বর্ষের অনেক রক্তারক্তির পর দেশানুরাগ চরমে জয়লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ এক্ষণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত; আমাদের দেশে কুলানুরাগই দেশানুরাগের উপরে জয়লাভ করিল। ব্রাহ্মণদিগের

পাকচক্রে বুদ্ধের সমস্ত সঙ্কল্প তাঁহার জন্মভূমিতে নিষ্ফল হইল; সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল; সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অরণ্যে প্রস্থান করিল; এবং লোকসমাজে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের যজন-যাজন একাধিপত্য করিতে লাগিল।

কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। অতীতকালে যাহা ছিল তাহা ছিল, যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্ত্তমানকালে আমাদের আছেই বা কী আর আমাদের করিতে হইবেই বা কী, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

আমাদের আছে যাহা, তাহা ভরপূরই আছে; নাই যাহা তাহা মূলেই নাই; আছে কী? না, কুলানুরাগ; নাই কী? না, দেশানুরাগ।

এক্ষণে আমরা, 'করিব তবে, কী? আমরা কি দেশানুরাগের মায়ামৃগ অনুসরণ করিয়া সারা হইব? তাহা যদি করি, তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে একূল ওকূল দুকূল হারানো— আমাদের ললাটে অবশ্যম্ভাবী। অকর্ম্মণ্য কুলানুরাগ যদিচ আমাদের দেশের একপ্রকার জ্বর-বিকার, কিন্তু জ্বর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে— এইটি জানিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জাতীয় গৌরব সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে যাহা আমাদের ছিল তাহাও যাইবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও পাইব না; তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানু-পৌত্রেরা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে যে— ছিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পড়িলেন (Darwinএর মতানুযায়ী) মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ!

তবে কি আমরা কুলানুরাগকেই সর্ব্বস্ব করিব? তাহা যদি করি তাহা হইলে প্রবল কালস্রোতের উজানে আমাদের সমাজের গতি হইবে, জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাইবে, মোহান্ধ কুলগরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে; সেই অন্ধ আনাড়ির হাতে আমরা যদি ধনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি তবে নৌকাডুবি অনিবার্য্য!

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ-হিংসার তরঙ্গে দোদুল্যমান ভীষণ সমুদ্র; তাহা হইতে ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কুলকেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল। দূর হইতে আমাদের এইরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, কুল সে অতি ভয়ানক স্থান— নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছে, তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকালের আশ্রয়দুর্গ।

বাস্তবিক, কুলানুরাগ দেশানুরাগের নীচের পঁইটা বই উপরের পঁইটা নহে।

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ

কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলাক্রমে তাহা করে, তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি ; কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি ? করিবার মধ্যে করি কেবল— গাঁয়ে মানে না আপনি-মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার অথবা, যাহা একই কথা, হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ ! কখনো বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল-রাজা হই, তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে ?— এ'কে জাতে তুলিতেছি, ও'কে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি, এ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি, ও'কে সমাজে চালাইয়া লইতেছি— এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া (মহাবীর ডন্‌কুইক্‌সোট্ আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ-শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড় জোর এই যা সম্ভবে, এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল 'দেশানুরাগ' ! তবে তাহার এখনো ঢের বাকি, আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব, আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে। বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে— টাকাটা সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে ; টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না— বামন-কায়েতের কুল-মর্য্যাদা, তাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর-সাধারণ যে-সে লোকে মনে করিলেই 'পেট্রিয়ট' নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস খুব সস্তা বটে, কিন্তু তাহার বিসমোল্লায় গলদ্। বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশানুরাগ, আর সোনার পাথরবাটি— দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে, সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না ; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ— ভগবদ্‌ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ। এই স্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই— যেন ভগবদ্‌ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বার হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্‌গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্‌ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই আমি এখানে বলিতেছি ভগবদ্‌ভক্তি ; আর তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই ; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত-কিছু সংসার-ধর্ম্ম

কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের রাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের সেরা কাজ— এই কাজটি এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলানুরাগ এ-পক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল; বৈরাগ্য অনুভয় পক্ষের নির্ভরস্থল। বৈরাগ্যের মুক্তসমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই; সেই সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে— তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধাসিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান-বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে— এই পর্য্যন্ত; ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন! ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্তসমীরণ হইতে উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ দ্বারা জয় করিতে হয়, অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়, পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়— তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বাৎলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিমন্দির দেখিয়া ভয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার মন তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া রহিয়াছিল, ততদিন তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে উপবীত— দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হন নাই। অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্‌ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাসশিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষী— সমুদ্রের মাঝখানে

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি;
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল।[১] ব্রাহ্মণ জাতির প্রধানধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং এ কাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন— দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাবসুলভ কার্য্যনৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা— প্রত্যুৎপন্নমতি! দুর্ব্বুদ্ধি-কন্যা আত্মঘাতিনী পলিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজগোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধুলা দিতে পারে, কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ! পলিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা-বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে হাঙ্গামা কোনোমতে ঢুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে; কিন্তু কেমন করিয়া যে তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না। একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বরবাদের জয়ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে, মাতা— ভারতভূমি! পিতা— স্বয়ম্ভূ ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের যত-কিছু মহত্ত্বের সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর-এক. ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্‌ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন! তাঁহার কাজ ফুরাইল— আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সেদিন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এক-ফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না— অথচ আমরা 'যায় সেকাল হায় সেকাল' করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নূতন একতরো হাসেন-হোসেনকে আসরে নামাইতেছি— ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিয়া ওঠা দায়! হাসেন-হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফাল্‌তো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি মায়া-চাতুরী ছাড়ো— পলিসী ছাড়ো! সাহসে ভর করিয়া এ-পক্ষ এবং ও-পক্ষের মধ্যস্থলে, এ-দেশ এবং এ-কালের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও; সেই

পারিতাম না। হৃদয়ে কি নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি নূতন জগৎ আসিত! এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হউক একদিন হইবেই হইবে। এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য।

অপর দিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্নি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একাকী ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার পদবীর অনুসরণ করিয়া তাঁহার যৌবন-সুহৃদ্‌গণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদের প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে কয়েকপ্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন। প্রথম, যুবকগণের ধর্ম্মশিক্ষার্থ ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত; তাহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন। ঐ সকল উপদেশ দ্বারা অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধি-ধারী যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

দ্বিতীয়, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তদগ্রেই যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কেশব এক সুহৃদ্-গোষ্ঠী স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের জন্য বসিতেন। সেখানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের সুহৃদ্‌গোষ্ঠীর সঙ্গতসভা নাম দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গতসভা রাখিলেন। এই সঙ্গতসভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির অদ্ভুত উৎস-স্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্মোন্নতিপ্রার্থী হইয়া সঙ্গতের আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত তাহা সর্ব্বতোভাবে আচরণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। এক-এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাঁহাদের জ্ঞান থাকিত না; রাত্রি ৯ টার সময়ে বসিয়া হয়ত ২ টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; কোথা দিয়া যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এরূপ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা,

এরূপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী সৃষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চিরদারিদ্র্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ইঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তির উৎস-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

সঙ্গতসভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। এই ভাব অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন। এ দিকে যুবক ব্রাহ্মদলে অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতি-ভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নবীন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থ-সাহায্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল; কলিকাতা কালেজ নামে এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; তাহা নবীন ব্রাহ্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল; এবং সর্ব্ববিধ সদালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধুসভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজসংস্কার-বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলেই নারীজাতির উন্নতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে। সঙ্গতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটী প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনুসারে নবীন ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্নী ভগিনী কন্যা প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্নী বা ভগিনীর শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটী স্ত্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের নানা উপায় অবলম্বন করেন; এবং তাঁহাদের কয়েক জনে মিলিত হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। সে পত্রিকা অদ্যাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।

১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটী স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দিলেন; তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্নীকে নববেশে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা লইয়া চারি দিকে মহা সমালোচনা আরম্ভ হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্নীকে লইয়া গবর্ণর জেনেরালের বাড়ীতে বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও স্ত্রীস্বাধীনতা-বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল।

যাহা হউক, প্রাচীন দলের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, ইঁহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্য্যের একতা বহুদিন রহিল না। নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্য্যতঃ উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান-ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র করিলেন; "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল।

১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা ভারতের নানা প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চর্চ্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান দ্বারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের তরঙ্গ

উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি হিন্দু-পেট্রিয়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল।··· আমাদের মন যখন অল্পাধিক পরিমাণে উত্তেজিত, তখন, ১৮৬০ সালের শেষভাগে, "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ-ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা-সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল, রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।···

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁহার নাটক-সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় হইল।···তিনি কর্ম্মসূত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাঁহার ন্যায় নানা স্থানে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার এই ভূয়োদর্শন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র-সকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।···

দীনবন্ধু যেমন তাঁহার নাটকগুলির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে নবভাব ও বাঙ্গালির মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এই কালের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দিলেন— তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন যেমন চিরাগত রীতিপাশ ছিন্ন-করতঃ বঙ্গীয় পদ্যসাহিত্যকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব আকাঙ্ক্ষা ও নব শক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্যসাহিত্যে সেই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারী হইয়া ধনীগৃহের রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কারভারে প্রপীড়িতা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও একদল ইংরাজী শিক্ষিত কাব্যানুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িতা বঙ্গভাষাকে কিরূপে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেম, এবং তাঁহারা আলালী ভাষা নামে একপ্রকার তাজা তাজা বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই নব ভাষার জন্মদাতা ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকা" এই ভাষার ভেরীনিনাদ ছিল। কিন্তু ঐ আলালী ভাষা গ্রাম্যতাদোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা "টক্ টক্ পটাস্ পটাস্ মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে— টিট্‌কারি দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিয়া লেজ মুচড়াইয়া সপাং সপাং মারিতেছে" ইত্যাদি ভাষা যে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যতাদোষ ঘটে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না।

ইহার পরে হুতোমের নক্‌সা প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্‌সা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও গ্রাম্যতাদোষের উপরে উঠিতে পারে নাই।

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ-পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস-রচনাদ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর-এক সুমহৎ বিপ্লবের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়। ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহাদের "দর্পণ"-নামক পত্রের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু "দর্পণ" ইংরাজদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বারা লিখিত বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের পথপ্রদর্শক। তিনিই ১৮২১ সালে সংবাদ-কৌমুদী নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঐ "কৌমুদী"তে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোকশিক্ষার একটী প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ-নিবারণ লইয়া হিন্দুসমাজের

সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দুধর্ম্মের পক্ষগণ "চন্দ্রিকা"-নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম-রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৌমুদী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্রিকা তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয়-সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে; এবং তদ্দ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী ঠিক সংবাদপত্র ছিল না। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাই তাহার মুখ্য কার্য্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার "প্রভাকর" "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্র-সকল গ্রহণ করিয়াছিল। "ভাস্কর" গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। এতদ্ব্যতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিকা হইতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়— যথা, মহাজন দর্পণ, চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞানদর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞান-সঞ্চারিণী, রসসাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, রসমুদ্গার, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ও দুর্জ্জনদমন মহানবমী।

ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবীর অনুসরণ করিয়া "রসরাজ" ও "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ভ করিল যে তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সুখের বিষয়, অচির কালের মধ্যে দেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারি দিকে ছি ছি রব উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়া গেল।

বোধ হয় এই ছি ছি রবটা হৃদয়ে থাকাতেই এ সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজীপত্রের মধ্যে হরিশের Hindoo Patriot, রামগোপাল ঘোষের Bengal Spectator, কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer, কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

১৮৫৮ সালে "সোমপ্রকাশে"র অভ্যুদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের জন্মের

অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও তৎপরে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত "রহস্য-সন্দর্ভ" বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাহা যদিও ঠিক সংবাদপত্র ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্ত পত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে।

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্তু তাহা আলালী ভাষাতে লিখিত হইত, ইহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়া একটা রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয়ের গাম্ভীর্য্য। সংবাদপত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিদ্যাভূষণ জানিতেন, তাঁহার উক্তির মূল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক হইল, কিন্তু মূল্য হইল বার্ষিক দশ টাকা; তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধ্যন্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই কারণেই এই কালের মধ্যে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চর্চ্চা বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই। ভিতরকার কথাটা এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদপত্রের প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ নির্ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। সেই তেজস্বিতা, সেই মনুষ্যত্ব, সেই ঐকান্তিকতা, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেই সত্যনিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাতা সহরে হোমিওপ্যাথির

আবির্ভাব ও তৎসম্বন্ধে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজাবাবুর কার্য্য। ডাক্তার বেরিণি সাহেবকে অবলম্বন করিয়া রাজাবাবু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাঁহারই সংশ্রবে আসিয়া অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিতেছিলেন। ইহাঁদের অনেকে পরে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশবিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্ত্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; এবং তৎ-সঙ্গে-সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্ব্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন। এলোপ্যাথির সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎকৃষ্টতর— লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা নহে, কিন্তু মত-পরিবর্ত্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়া দিয়াছিল।...

তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হইতে এম্ ডি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। ঐ সালেই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্ত্তীর প্রযত্নে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখা নামে একটি শাখা-সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। ঐ নিন্দাবাদ রাজাবাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেন্দ্রলালের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইণ্ডিয়ান ফিল্ড্-নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্রলালকে মর্গান (Morgan) সাহেবের লিখিত হোমিওপ্যাথি-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করেন। সমালোচনার্থ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালের মনে হয় যে, কার্য্যতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা না দেখিয়া সমালোচনা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজাবাবুর সহিত তাঁহার কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীই উৎকৃষ্টতর প্রণালী বলিয়া মনে হইল। ১৮৬৬ সালের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন সহরের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্ত্তা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ

সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দ্দিষ্টতা-দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান-প্রদর্শিত প্রণালী উৎকৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার্ নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, "ডাক্তার সরকার, থাম থাম— আর-একটী কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।" তৎপরে সহরের এলোপ্যাথি দল ডাক্তার সরকারকে একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসকসভা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীরের পদভরে কাঁপিতে লাগিল। বাস্তবিক, তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা এই সকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্ বীরপ্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষের গুণে।

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপ্যাথিকে কিরূপ উঁচু করিয়া উঠাইলেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটী কথাতেই প্রকাশ। তিনি যখন এ দেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার হোমিওপ্যাথ বন্ধুগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্য যখন উদিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভা পায়। মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়!" অতএব অপরাপর নেতাদিগের ন্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীর ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর-এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা ন্যাশনাল পেপার -নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় মেলা -নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটী প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন হইতে

অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদলাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনের দিকে আনা কর্ত্তব্য। লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদপত্রে দুঃখপ্রকাশ করিতেন; বন্ধুবান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন; এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফল-স্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্রসংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সঙ্গীতাদির চর্চ্চা, স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ, প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্রসংক্রান্তিতে একটী মেলা খোলা স্থির হইল। দেশের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব উদ্যোগকর্ত্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ক্রটী করেন নাই।

১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয়-সঙ্গীত "গাও ভারতের জয়" সুগায়কদিগের দ্বারা গীত হয়। আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন; এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে-সুপরিচিত মনোমোহন বসু মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন করেন— "ভারতবর্ষের এই একটী প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্য্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। সুখের বিষয়, এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত

হইয়াছে। ইহার পরে মনোমোহন বসু প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায় সঙ্গীত রচনা করিয়া দুঃখ করিলেন—

কতকাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে
ইত্যাদি

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপালবাবু ইহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়।

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা-সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। বলিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীন-বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবির্ভূত করিয়াছিল, সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন প্রথম শিক্ষিতদলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটী আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের রুটী খাইতে পারে বা কে চর্ম্মপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া খাইতে পারে।

ক্রমে ঢাকা কালেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিত দলের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ-সকল যতই পূর্ব্ববঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সহরে নব নব কার্য্যের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপন, বালিকা-বিদ্যালয়-স্থাপন, বিধবাবিবাহের আন্দোলন প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল।

দুর্ব্বাসার শাপ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক দুর্ব্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সে কথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে। শকুন্তলা যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সঙ্গে বার বছরের ছেলে, তখন মনে সব ঠিক আছে, তবু রাজা বিবাহটা একেবারে অস্বীকার করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নয়, শকুন্তলাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর ছেলেটাকে 'হোৎকা' বলিয়া 'হাতী' বলিয়া গালি দিলেন। শেষ শকুন্তলা যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল যে, 'তুমি উহাকে সত্যই বিবাহ করিয়াছ'। লোকে দৈববাণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল; তখন তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন এবং বলিলেন, মনে থাকিলেও লোকলজ্জার ভয়ে বলিতে সাহস করি নাই।

কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন-কি, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন। যখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি শকুন্তলাকে লইতে স্বীকার কেমন করিয়া করেন? যাহারা দেখিতেছে, তাহারা রাজার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিহারী বলিলেন, "আহা, আমাদের রাজার কি ধর্ম্মজ্ঞান! এমন রূপ! স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! মুখের কথায় আপনার হইয়া যায়। শুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহাকে লইতেছেন না।" শকুন্তলা যখন কপট শঠ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন, বলিতেছেন, "তুমি ঘাসে ঢাকা কুয়া, ধর্ম্মের কাচ করিয়া বসিয়া আছ" ['ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো'], তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "দুষ্মন্তের চরিত্র ত আমরা সবাই জানি, তবুও তাঁহার ভিতর যে শঠতা আছে, কখন দেখি নাই।" যাঁহারা থিয়েটারে দেখিতেছেন, তাঁহারা শাপের কথা জানেন। তাঁহারাও রাজার কোন দোষই দেখিতে পাইতেছেন না, বরং তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে দুষ্মন্তকে 'কাপুরুষতা'র দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটী খুব খুলিয়াছে। অঙ্গুরী পাইয়াই রাজার যেমন সব কথা মনে পড়িল, অমনি তাঁহার ঘোরতর অনুতাপ হইল। প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল আর তাঁহাকে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই

অনুতাপ, এই যন্ত্রণা, এই অধীরতায় রাজার চরিত্র বেশ খুলিতে লাগিল। বোকা বিদূষক নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। যে সকল কথা এ সময়ে চাপা দেওয়া উচিত, বোকাটা সেই সব কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজার স্বভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিল কে? সানুমতী আর নাটকের প্রেক্ষককুল। এই সময়ে আবার সদাগরের মরার খবর আসিল। সে আঁটকুড়া ছিল, বিদূষক যে কথাটা মনে করাইয়া দেয় নাই সেটাও মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল, আমি 'অপুত্রক' অথচ আমার পুত্র হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। আমি ছেলেটী হেলায় হারাইয়াছি! তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; এতটা অধীর হইলেন যে, মাতলি তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই ভয় পাইলেন, ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় গেলে কোন কাজই পাওয়া যাইবে না। তাই বিদূষককে মারিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কণ্বের আশ্রমে প্রথম দেখার সময় সকলে রাজার ভাব দেখিয়াছেন। লতাকুঞ্জে গান্ধর্ব্ববিবাহের সময়ও রাজার ভাব দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। বিশেষ নিন্দা করারও কিছু ছিল না। শকুন্তলাকে তাড়াইবার সময়ও তাঁহার আর-এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা আছে। রাজা চেষ্টা করিতেছেন, মনে পড়িতেছে না। শকুন্তলার কথাবার্ত্তা-আকার-প্রকারে শকুন্তলা যে তাঁহাকে ঠকাইতে আসিয়াছে, এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না; ঠিক তাহার সব কথা বিশ্বাসও করিতে পারিতেছেন না। কারণ, নিজের সে সকল কথা একেবারেই মনে নাই। সন্দেহ পূরাই হইতেছে, অথচ সন্দেহ করিলে চলিতেছে না। এখনি মীমাংসা করিয়া হয় শকুন্তলাকে ও শকুন্তলার ছেলেকে আপনার বলিয়া লও, না হয় উহাকে যাইতে বল। ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। রাজা তখন কি করিবেন? যাইতে বলাই ঠিক মনে করিলেন। করিলেনও তাই। ইহাতে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারেন না। লইলে বরং দোষ দিত, কলঙ্ক হইত।

যে অবস্থায় রাজা পড়িয়াছিলেন, তাহা যে একটা বিষম সমস্যা, কে অস্বীকার করিবে? ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, "তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ।" ঋষিদের রাজাকে ঠকাইবার কি কারণ আছে? কেন তাঁহারা একটা মিছা হাঙ্গামা লইয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে হস্তিনায় আসিবেন? সুতরাং বিশ্বাস করিবার বেশ কারণ রহিল। আর-এক দিকে আবার শকুন্তলার আকার-প্রকার-কথাবার্ত্তায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে বোধ হয়, সে দুষ্ট শঠ বা কপট বা ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু রাজা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিজের কথা তাঁহার

একেবারে মনে নাই। যদি কাহারও মনে থাকিবার কথা হয়, তবে শকুন্তলার ও তাঁহার নিজের। রাজা মনে মনে বলিলেন ইহারা মনে করাইয়া দিক, আমি লইতেছি। শকুন্তলা আঙটী খুঁজিলেন, নাই। একটা উপায় ছিল, সেটা নাই। কত কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিছুই হইল না। সেই কথা মনে পড়িল না। কেমন করিয়া পড়িবে? শাপ হইয়াছে যে, পাগল যেমন আগের কথা পরে মনে করিতে পারে না, তেমনি বুঝাইয়া দিলেও, মনে করাইয়া দিলেও, তোমার কথা রাজার মনে পড়িবে না। স্থতরাং পাহাড়ে মাথা কুটিলেও যেমন পাহাড়ের কিছুই হয় না, ব্রহ্মশাপের বিরুদ্ধে শকুন্তলার এত চেষ্টা, এত বলা-কহা, সব বৃথা হইয়া গেল। ব্রহ্মশাপও নড়িল না, রাজারও মনে পড়িল না। রাজা কি করিবেন? শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন।

আঙটী হাতে পড়িবামাত্র শাপের অবসান হইল, সব কথা রাজার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মনে বড়ই যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অগ্নিশরণে শকুন্তলার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ব্যবহার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল ও তাঁহার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। তিনি, যে আঙটী আনিয়াছে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন, বসন্তের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। অগ্নিশরণে শকুন্তলার তরফ যত কথা বলা হইয়াছিল, সব সত্য বলিয়া ধারণা হইল। যে মাছ ধরিয়া আনিয়াছে, সে ইন্দ্রঘাটের জেলে। আর গৌতমী বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রঘাটে শচীকুণ্ডের জলস্পর্শের সময় আঙটী পড়িয়া গিয়াছে। বুড়ীর কথা ত ঠিকই হইল। আর তিনি কি করিয়া সেই সত্যবাদী বুড়ীকে বৃদ্ধতাপসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে সামান্য স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া গালি পাড়িয়াছেন। শকুন্তলা হরিণের কথা মনে করাইয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়ে নাই। তিনি শকুন্তলাকে কাকের বাসায় কোকিলের মত ডিম ফুটাইতে আসিয়াছ বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি এখন বিদূষককে নির্জ্জনে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। এ কথা বলায় রাজার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কিন্তু রাজা যে তপোবনে শকুন্তলা নামে এক তপস্বীর মেয়েতে আসক্ত হইয়াছিলেন, সে কথা ত বিদূষকও জানিত, সে কেন বলে নাই? তাহার কারণ, রাজা একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তপস্বীর মেয়ের কথাটা পরিহাস মাত্র, সত্য কথা নয়। মিথ্যা কথার ফল ফলিবেই ফলিবে। নহিলে বিদূষক যদি রাজা আসিতেই জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমিও এলে, তোমার সে শকুন্তলার কি করে এলে? তাহা হইলে ত এত বিভ্রাট না হইলেও না হইতে পারিত।

রাজা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। শকুন্তলা অতিথি-

সেবায় অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি পাইলেন। নইলে শুদ্ধ শকুন্তলার দোষে রাজার শাস্তি কেন হইবে? প্রমোদবনে রাজার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হইয়াছে, লোক তাঁহার দুঃখে দুঃখীই হইয়াছে। তাঁহার কষ্টে, অনুতাপে, করুণ রোদনে লোকের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর যখন শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রয়ে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, তখন সে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। শকুন্তলার তাঁহাকে চিনিতে যতটুকু দেরী হইয়াছিল, তাঁহার ততটুকুও হয় নাই। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র না? নহিলে রক্ষামঙ্গল শুদ্ধ আমার ছেলেকে কে আর অপবিত্র করিতে পারিবে!" ইহাতে চিনিতে যে একটু দেরী হইয়াছিল, বেশ বুঝা যায়। রাজার কিন্তু কিছুই হয় নাই। দেখিবামাত্র বলিলেন, এই সেই শকুন্তলা। যদিও তখন কঠোর নিয়ম করিয়া শকুন্তলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একটী চুলের বিনুনী পিছন দিকে ঝুলিতেছে; আর একখানি আধময়লা বাকল পরিয়া আছেন; তথাপি রাজা দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি যে আমায় দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলে, তাহাতে বুঝিলাম, তোমার প্রতি আমি পূর্ব্বে যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভালই হইয়াছে।" শকুন্তলার তখনও ভয় ভাঙ্গে নাই, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'এখন আমার আশার সঞ্চার হইল। রাজার বোধ হয় রাগ গিয়াছে। দৈব বোধ হয় আমার অনুকূল। ইনি সেই আর্য্যপুত্রই বটেন।' রাজা বলিলেন, "রাহু গ্রাস করিলে চাঁদের কিছুই থাকে না, রাহুর হাত হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সঙ্গে মিলিত হন, তেমনি কোন রাহু আমার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে রাহুও মরিয়া গিয়াছে, আর তুমিও আমার সম্মুখে উপস্থিত।" এখন শকুন্তলার ভয় পূরা ভাঙ্গিল। "আর্য্যপুত্রের জয়" বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন, "জয় বলিতে গিয়া তোমার যদিও কথা বাহির হইল না, আমার কিন্তু খুব জয় হইল। কারণ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম।" বলিতে বলিতে রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে জন্য আমার উপর আর রাগ করিও না। আমার তখন কি যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে আপনার মঙ্গল আপনি বুঝিতে পারে না। যে কাণা তাহার মাথায় ফুলের মালা দিলেও, সে সাপ মনে করিয়া, মালা দূরে ফেলিয়া দেয়।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য শেষে সুফল দিলেও তখন বোধ হয় দুরদৃষ্ট দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নহিলে আপনি আমার প্রতি এত সদয়, তবুও তখন এত

বিরূপ হইলেন কেন?" এতক্ষণ রাজা পায়ে পড়িয়া ছিলেন, এখন উঠিলেন। শকুন্তলা— "আমার কথা আপনার মনে পড়িল কিরূপে?" রাজা— "আমার দুঃখ একেবারে ঘুচিলে সে কথা বলিব। তুমি যখন কাঁদিয়া আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে, যখন তোমার চক্ষের জল তোমার অধরের উপর পড়িয়া অধরকে ক্লেশ দিতে লাগিল, তখন আমি তাহার দিকে চাহি নাই, উপেক্ষাই করিয়াছিলাম। আজ আবার তোমার চোখের পালকে জল দেখিতেছি। আমি উহা মুছিয়া দিয়া নিজের দুঃখ দূর করি" বলিয়া তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তখন রাজার হাতে সেই আঙটী দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ, এই সেই আঙটী।" রাজা বলিলেন, "এই আঙটী পেয়েই আমার সব কথা মনে পড়িল।" "সে সময় দুর্লভ হইয়া এই আঙটীটাই অনর্থ বাধাইয়াছিল।" "তবে এ আঙটী তোমার আঙ্গুলেই থাকুক।" "না আমি উহাকে একেবারেই বিশ্বাস করি না।" বলিতে বলিতে মাতলি আসিল ও সকলকে কশ্যপের নিকট লইয়া গেল। কশ্যপের নিকট রাজা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শকুন্তলাকে সম্মুখে পাইয়াও মনে হয় নাই, পরে আঙটী দেখিয়া মনে হইল এ কি রকম? দুর্ব্বাসার শাপের কথা রাজাও জানিতেন না, শকুন্তলাও জানিতেন না। মুনি সে কথা বলিয়া দিলে দুজন সব খবর বুঝিতে পারিলেন। আগাগোড়া সব ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল, আবার দুজনের যেমন ছিল; তেমনি হইল

এ ব্যাপারে রাজার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে ছাড়া কমে না। রাজার যখন ধারণা ছিল, বিবাহ করি নাই, মনে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বীরের ন্যায় সেই ধারণামত কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যখন মনে হইল, বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আবার বীরের মত কার্য্য করিলেন। পায়ে পড়িয়া শকুন্তলার কাছে মাপ চাহিলেন, বিবাহ স্বীকার করিলেন। ছেলে ও স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে রাজার চরিত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শকুন্তলাও দুর্ব্বাসার শাপে যথেষ্ট বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে এত কোমল, এত নরম, এবং সব ব্যাপারে এত কাঁচা করিয়া গড়িয়াছেন যে, তিনি দুই তিনটী সঙ্গী ভিন্ন শকুন্তলাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম দুটী সখী ছিলেন, তারপর দুটী ঋষির শিষ্য ও গৌতমী। একা শকুন্তলাকে ষ্টেজে আনিতেই পারেন নাই। শকুন্তলা পাপ কাহাকে বলে জানেন না। আদরের মেয়ে আদরেই আছেন, সংসারের কঠোরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কঠোর শাপ তাঁহাকে কঠোর দুঃখ জানাইয়া দিল। সংসার যে বড় নিদারুণ, সংসারে

যে পান থেকে চূণ খসিবার যো নাই, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন। একটী আঙটী— তা্ও আবার যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না'। সেই আঙটী না দেখাইতে পারিলে, যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বস্ব দিবেন বলিয়া বিবাহ করিয়াছেন— তিনিও যে এই সামান্য জিনিসটা না থাকায় চিনিতে পারিবেন না, গরীব শকুন্তলার এতটা জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে ? সে আঙটীটাকে যত্ন করিয়া রাখিল না। বড়ই কষ্ট পাইল। শেষ রাজা যখন আবার সেই আঙটী তাহার আঙ্গুলে পরাইতে গেলেন, সে বলিল, "আর না, ও আঙটীটাকে আমি বিশ্বাসই করি না।" দোষটা আঙটীর হইল। দুঃখের দায়ে পড়িয়া শকুন্তলা এখন একটু শক্ত হইয়াছেন, এখন আর সে আদরের মেয়ে নাই। সে একাই রাজার সঙ্গে দেখা করিল। রাজা ক্ষমা চাহিলে যথোচিত উত্তর দিল। কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনও হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন। রাজা চোখের জল মুছাইতে আসিলে, কত কি বলিয়া বাধা দিলেন না, আর সে আঙটীটাকে বিশ্বাস করিলেন না। এইরূপে শাপে দুজনেরই চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি ? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে যে-কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্ব্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সেকালের কর্ত্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলভোগ ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ্ হইলে সে ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লাল সেন মরিলেন— ব্রহ্মশাপে। কত রাজা উৎসন্ন গেলেন— ব্রহ্মশাপে। এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন— ব্রহ্মশাপে। এত বড় বাহ্‌মনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল— ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত ব্রহ্ম-শাপে। কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞানশকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।

রচনা : বঙ্গাব্দ ১৩২৪

বিজ্ঞানে সাহিত্য

জগদীশচন্দ্র বসু

জড়জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্য্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড়জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম-জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদু স্পর্শ ও মৃদু আঘাত—ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্ত্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, হাসির পরিবর্ত্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ-সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্যক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গালাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার

সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ্ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্ত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ-প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ, জ্ঞান-অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গেসঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন

করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্যসাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ রাসায়নিক জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে উদ্ভিদ্‌কে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক-না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব রসায়নতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন, 'যেন নহে— এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ-স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই-একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্ম্মি-সঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা এক দিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্ত্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ মৃৎবর্ত্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোক-পুঞ্জও বহু দূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ, দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য-আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতীরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতনরাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ্‌রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই-চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্য ভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া

দেয় না। আর, লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ -জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ্-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ— সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ, এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়— সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় কোন প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত-পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি

তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি-সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুন্ন হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত— অশিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানসসিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক— প্রথমতঃ, গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান; দ্বিতীয়তঃ, গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা -নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এইজন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি— সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সেসব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোন মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

যদি গাছ লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা তো দিবাস্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতাসঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। এ কথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার-নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি-না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের

সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময়গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর-এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এই দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম "বৃক্ষজীবন যেন মানব-জীবনেরই ছায়া"। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার-কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ-অন্ধকারে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি। কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ

করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদ্‌কে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষদ্ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দির রূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্ব-প্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার-স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

রচনা : খ্রী. ১৯১১

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্কিম-সাহিত্য

বিপিনচন্দ্র পাল

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এখনও বাংলার শিক্ষিত লোকেরা পাঠ করিয়া থাকেন। রসসৃষ্টির হিসাবে তাঁহার উপন্যাসগুলির আদর ও আলোচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থও সাহিত্যের হিসাবেই আজিকালকার লোকে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এসকল গ্রন্থের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ দিকে কতটা পরিমাণে যে বাংলার বর্ত্তমান যুগকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এ কথাটা সকলে জানেন না; অতি অল্প লোকে ইহার অনুধাবন করিয়া থাকেন।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজীসাহিত্যের প্রভাবে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজিকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাদের অব্যবহিত পুরোবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের মতন ইংরাজীসাহিত্যের চর্চ্চা করেন বলিয়া মনে হয় না। স্কুল-কলেজে যতটুকু ইংরাজী পড়া হয়, অনেকে ইংরাজীসাহিত্যের ততটুকু পরিচয়ই পাইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া অতি অল্প লোকেই এখন ইংরাজী-সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সেকালে আমাদের ইংরাজী-নবীশেরা ইংরাজীসাহিত্যে একেবারে মজিয়া থাকিতেন। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা তখনও তেমন হয় নাই। দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই অবসরকালে কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন। ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তখনও এসকল পুরাতন পুঁথির বিচার-আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। কথা ও কাহিনীরূপেই লোকে কাশীরামের ও কৃত্তিবাসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আজিকাল আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও চরিত্রের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে কাশীরাম ও কৃত্তিবাসকে যে গৌরবের আসন দিতে আরম্ভ করিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের সে মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেক্সপিয়র বা মিল্টনের কথাই নাই, চসার প্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজী কবির সঙ্গে এক আসনে বসিতে পারেন, এমন কোনও বাঙ্গালী কবি আছেন, সেকালে আমরা ইহা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। বঙ্কিম-যুগের পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, কাদম্বরী, শকুন্তলা, এবং উত্তররাম-চরিত পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু কেবল পরীক্ষা পাস দিবার জন্যই অধিকাংশ লোকে এগুলি পড়িতেন। রসসৃষ্টির দিক দিয়া আমাদিগের

মধ্যে তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে "বঙ্গদর্শনে" সেক্সপিয়র এবং কালিদাসের তুলনায় সমালোচনা করেন, এবং উত্তররাম-চরিতের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়া রসসৃষ্টির দিক দিয়া ভবভূতির একটা অতি উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যেই ড্রাউডেন প্রভৃতি সমালোচকদিগের গ্রন্থে এরূপ উচ্চাঙ্গের সমালোচনা পাঠ করিতেন। সেই কষ্টিপাথরে সংস্কৃত বা বাংলা -সাহিত্যকে কষিয়া বিশ্বসাহিত্যে তার স্থান ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ যে উচ্চ আসন পাইবার অধিকারী, ইহা তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর কল্পনাতেও আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের পরিষদে লইয়া যান। আর তখন হইতেই বাঙ্গালী স্বদেশের সাহিত্যের আদর করিতে আরম্ভ করেন।

সেকালে আমাদের ইংরাজী-নবীশেরা ইংরাজীসাহিত্যতেই মসগুল হইয়া ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে কষিয়াই তাঁহারা যাবতীয় সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন। সেক্সপিয়র এবং মিল্‌টন তাঁহাদের চক্ষে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন। ইঁহাদের পদপ্রান্তে বসিতে পারেন, বাংলা দেশে কোনও কবি তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। বৈষ্ণব কবিগণ তখনও বটতলায় আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। বৈষ্ণব কীর্তনীয়ারা স্বল্পবিস্তর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন বটে, কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তখনও য়ুরোপের আমদানী খৃষ্টীয়ান ethics'এর বা ধর্ম্মনীতির আওতায় পড়িয়া ছিলেন। মহাজন-পদাবলীর আলোচনায় তাঁহাদের অধিকার জন্মে নাই। ইন্দ্রিয়বিকারের ভাষায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ সাত্ত্বিক বিকারের যে অপূর্ব্ব ছবি তাঁহাদের পদাবলীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার খোঁজ এখনই বা ক'জনে রাখেন? তখন আমাদের ইংরাজী-নবীশ ethics-বাদীরা তাহার যে কোন সন্ধানই পান নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এককালে মহাজন-পদাবলীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী এসকল অপূর্ব্ব রসসৃষ্টির কোনও খোঁজই তখনও পান নাই। বাংলা ভাষাতে যে বয়স্ক ও সুবিজ্ঞ সুধীজনের পাঠোপযোগী কোনও পুস্তক আছে, একথা অনেকের ধারণাতেই আসে নাই।

এইরূপ অবস্থায় প্রথম যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' প্রকাশিত হইল, তখন ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালী একটা নূতন গৌরবে ভরিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবি-প্রতিভা কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং একথা স্বীকার এবং প্রচার

করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী গুপ্ত কবিকে কোনও শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবির সঙ্গে তুলনা করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারেন নাই। 'মেঘনাদবধ' প্রকাশ হইবা মাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী মাইকেলকে মিল্‌টনের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালী কবি মধুস্থদনের কবি-প্রতিভাকে মিল্‌টনের কবি-প্রতিভার এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া একটি অভিনব স্বাজাত্যাভিমানে ফাঁপিয়া উঠিলেন। এতদিনে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী একখানি পাঠোপযোগী শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু মেঘনাদবধের গৌরব যত লোকে করিতে লাগিলেন, তত লোকে তাহা পড়িতে পারিলেন না। বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়া সহজ ছিল না। ইহা ছাড়া মেঘনাদ-বধের অলোকসামান্য শব্দসম্পদের উপরেও তখন পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকার জন্মে নাই। অভিধান না খুলিয়া অনেকস্থলে মেঘনাদবধের অর্থগ্রহণ অসাধ্য ছিল। সখের পড়াশুনা করিতে যাইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিধান খুলিয়া দেখাও সম্ভব ছিল না। এই সকল কারণে মাইকেলের কবি-যশ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ততটা পরিমাণে তাঁহার কাব্যের পঠন-পাঠন শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। মেঘনাদবধে বাঙ্গালী এইমাত্র বুঝিল যে বাংলা ভাষার এবং বাঙ্গালী-মনীষার বিশ্বসাহিত্যে যাইয়া বসিবার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল এই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা নহে; কিন্তু আপনার অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুভবেতে এই কথাটা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

২

বোধহয় 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট বলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। কাব্যে যেমন সেক্সপিয়র এবং মিল্‌টন ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীর অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, উপন্যাসে ওয়াল্টার স্কট তাঁহাদের চিত্তকে সেইরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং দুর্গেশ-নন্দিনীর সঙ্গে স্কটের উপন্যাসের সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালী একটা অভিনব আত্মাভিমান বা স্বাজাত্যাভিমান অনুভব করিতে লাগিল। মেঘনাদবধ সংস্কৃত কোষের সাহায্য ব্যতিরেকে বোঝা অসাধ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও তখনও পর্য্যন্ত শব্দাড়ম্বর প্রকাশের লোভ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি মোটের উপরে তিনি যে নূতন বাংলা এমারতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা

যাইত। সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিত্তকে বিদেশীয় সাহিত্যের ও বিজাতীয় ভাবের মোহ হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত করিয়া আধুনিক বাংলার সাহিত্যের এবং স্বাদেশিকতার গোড়া পত্তন,করিয়াছিলেন।

৩

মোটামুটি বঙ্কিম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত— ১. উপন্যাস, ২. ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩. রাষ্ট্রনীতি ; আর এই তিন বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের মধ্যে নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণা জাগাইতে চেষ্টা করেন। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী এবং মৃণালিনী এক শ্রেণীর ; বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল আর-এক শ্রেণীর ; এবং আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম অপর শ্রেণীভুক্ত। প্রথম তিনখানিকে রোমান্স্ (romance) বলা যায়। সকল দেশেই নরনারীর চিত্তে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন মানুষী প্রবৃত্তির খেলার উপরেই রোমান্স্ গড়িয়া উঠে। এই প্রবৃত্তির খেলাতে মূলতঃ স্বদেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-প্রতীচ্য প্রভৃতি দেশগত বা জাতিগত কোনও প্রকারের প্রখর প্রভেদ থাকে না। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, জগৎসিংহ, ওস্‌মান্ ইহাঁরা এদেশের পোষাক পরিয়া এদেশের ভাষায় দেশী রকমে ও দেশী ঢঙে নিজেদের চরিত্রকে পাঠকের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য পোষাকে, অন্য ভাষায় ও অন্য ঢঙেও ইহাঁরা যে ভাবের খেলা খেলিয়াছেন তাহা এমনি সুন্দররূপে ফুটিতে পারিত। কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সম্বন্ধেও একথা খাটে। এই তিনখানি উপন্যাস সার্ব্বজনীন মানুষী প্রবৃত্তির সাধারণ ভূমির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিতে বাংলার বা ভারতের বৈশিষ্ট্যের তেমন প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। কিন্তু এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানবতার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকি। এখানে বাঙ্গালী মেয়ে সামাজিক অবরোধের ভিতরেও কতটা পরিমাণে যে স্বাধীনতা ভোগ করে, এবং নিজের প্রকৃতির বা বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কতটা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অভ্যুদয়কালে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের জাতকে বড় হীন বলিয়া মনে করিতেন। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া সর্ব্বদাই মাথা হেঁট করিয়া থাকিতেন। তখনও সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা য়ুরোপের কোনও জ্ঞানলাভ

করেন নাই। ইংরাজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্যেই সেকালে তাঁহাদের য়ুরোপের মনুষ্যত্বের এবং য়ুরোপীয় সমাজের যা-কিছু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। য়ুরোপের এই ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাসে এদেশের চিত্রপটেও যে য়ুরোপের সাহিত্যসৃষ্টির মতন উৎকৃষ্ট রসমূর্ত্তি গড়িয়া তোলা সম্ভব, ইহা দেখাইয়া বাঙ্গালীর অন্তরের এই আত্মগ্লানিটা নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনী সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই একটা অতি বড় কাজ করিয়াছিলেন। আর কোনও কিছু না করিলেও এই তিনখানি উপন্যাসের দ্বারা তিনি বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ— সকলেরই যে যথাযোগ্য পথে আত্মচরিতার্থতা-সাধনের অধিকার আছে, এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী সমাজে এই সত্যটা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের নামে প্রকাশ্যভাবে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ মানবপ্রকৃতির নামে পরোক্ষভাবে সেই সংগ্রামেই অসাধারণ শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

৪

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রসসৃষ্টিকে কেবল আরও উন্নত এবং পরিস্ফুট করিয়া তোলেন তাহা নহে, কিন্তু সার্ব্বজনীন মানবতার ভূমি হইতে এগুলিকে পৃথক করিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের এবং বাঙ্গালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাজাইয়া তোলেন। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীতে, সুন্দরী এবং শৈবলিনীতে, ভ্রমর এবং রোহিণীতে আমরা কেবল সাধারণ নারীত্বের সার্ব্বজনীন মূর্ত্তিই দেখি না, কিন্তু সার্ব্বজনীন নারীত্ব কোন্ আকারে কিরূপে বাংলার মাটি, বাংলার জলবায়ু, বাংলার ঘাট মাঠ, বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে, ইহাও প্রত্যক্ষ করি। প্রতিদিন যে পথে-ঘাটে বেড়াই, যে নদী-তরঙ্গ এবং সাঁঝের আকাশ দেখি, তাহাই যখন আলোক-ছবিতে কিম্বা সুনিপুণ চিত্রকরের তূলিকায় ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে, যে রূপ দেখিতে পাই পূর্ব্বে তাহা দেখি নাই। আর দেখি নাই এই জন্য যে, সেদিকে কোনদিন লক্ষ করি নাই। এত সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রাতঃসন্ধ্যায় ঘুরিয়া বেড়াই ছবি দেখিবার পূর্ব্বে ইহা বুঝি নাই। বুঝি নাই বলিয়া তাহার মর্য্যাদা করি নাই। কিন্তু যেদিন ইহার ছবি দেখিলাম সেদিন হইতে এই চিরপরিচিত পথ-ঘাটের

দাম যেন বাড়িয়া গেল। ঠিক এইরূপে বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে তাহার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের মূল্যটা বাড়াইয়া দিল। এতদিন বাঙ্গালী ভাবিত যে য়ুরোপীয় সমাজে এবং পাশ্চাত্ত্য জাতীয় লোকদিগের পারিবারিক জীবনে যে রস ও আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে, হতভাগ্য বাঙ্গালী-জীবনে তাহা সম্ভবে না। বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস প্রচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন— বিবিধ রসের উৎস ও রসমূর্ত্তির উপকরণ কেবল য়ুরোপেই যে আছে তাহা নহে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাহা আছে। বাঙ্গালীর চোখ নাই বা প্রাণ নাই বলিয়া দেখিতে পায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলার সমাজ বাংলার ঘরকে আধুনিক শিক্ষিত রসপিয়াসু বাঙ্গালীর নিকটে আদরের বস্তু করিয়া তুলিলেন। এইভাবে এই তিনখানি উপন্যাসের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নবযুগের নবীন সাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন।

৫

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীতে সার্ব্বজনীন মানবপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে আত্মচরিতার্থতার পথে বাহিরের বন্ধন-মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই ভোগের পথ যে সোজা পথ নয়, বাহিরের বন্ধন ছিঁড়িলেই যে এই ভোগের পথে যাইয়া মানুষ সম্যক আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না, এ পথে পদে পদে কত বিঘ্ন কত বাধা, আত্মচরিতার্থতা লাভ করা দূরে থাক্, আত্মহত্যার যে কত আশঙ্কা— বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি ইহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক য়ুরোপীয় evolution বা অভিব্যক্তিবাদের ভাষায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিকে রসরাজ্যে মানবের আত্ম-চরিতার্থতার অভিব্যক্তিধারাতে thesis-এর অবস্থা বলা যায়। বিষবৃক্ষ প্রভৃতিকে এই অভিব্যক্তিধারাতে antithesis-এর অবস্থা বলা যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে সহজ রস-বিলাসের ছবি দেখিতে পাই। এখানকার কথা সহজ ভোগ। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযমের ও সমাজশাসনের একটা প্রবল বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি— এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এই তিনখানি ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে কোনও সন্ধির কথা বা সমন্বয়ের সঙ্কেত নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে এই সন্ধি বা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং

সীতারামের বিশেষত্ব। কেবল রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী বা সীতারামের রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীদিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্ম্মযোগে দীক্ষিত করা। সেকালের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের আত্মঘাতী ইহসর্ব্বস্বতার প্রভাব নষ্ট করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিবার জন্যই এই কর্ম্মযোগ প্রচারের প্রয়োজন ছিল।

৬

ইংরাজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের অত্যন্ত ইহসর্ব্বস্ব এবং পরমার্থবিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের যাঁহাদের ভিতরে স্বাভাবিকী আস্তিক্যবুদ্ধি বলবতী ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই তখন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে যাইয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি-সাধনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। দেশের অধিকাংশ ইংরাজী-নবীশেরা কোনও প্রকারের ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারিতেন না। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয়ান নীতিবাদ বা ethics-এর প্রভাবও ইঁহাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের সকল উপন্যাসেতেই এই নীতিবাদটা বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। এইজন্য আমাদের সেকালের ইংরাজী-নবীশেরা সাংসারিক ভোগবিলাস-সাধনেই নিজেদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াও গোবিন্দলালের মতন ভোগবিলাসকেই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনে বরণ করিয়া লইতে পারিতেন না।

সুতরাং ভোগেতে আত্মসমর্পণ করিয়া চরমে গোবিন্দলাল যে পথ ধরিয়া ধর্ম্ম ও ভক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে পথে চলিবার প্রেরণাও অধিকাংশ লোকের মধ্যে আসিত না। এইরূপে শিক্ষিত সাধারণে বাহিরে কতকটা নীতির বা moralityর বন্ধন মানিয়া চলিলেও ভিতরে ভিতরে ইহসর্ব্বস্ববাদী বা secularist এবং materialist হইয়া পড়িতেছিলেন। য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদ একটা তাজা জিনিষ। য়ুরোপীয় প্রকৃতি হইতেই তাহা আপনার শক্তিতে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর প্রকৃতির ভিতরের প্রেরণায় যে বস্তু ফুটিয়া উঠে, তাহা আপাতঃ-দৃষ্টিতে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা কল্যাণের শক্তি লুকাইয়া থাকে। আমাদের দেশের ইংরাজী-নবীশদিগের ইহসর্ব্বস্ববাদ অনেকটা ধার-করা জিনিষ ছিল। ইহাতে য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ববাদের প্রাণতা ছিল না; অথচ সেকালের ইংরাজী শিক্ষা ইহার দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃতিনিহিত আধ্যাত্মিকতাকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিতেছিল। য়ুরোপীয়দিগের ইহসর্ব্বস্ববাদ তাহাদের স্বধর্ম্ম ছিল। আমাদের এই ধার-

করা ইহসর্ব্বস্ববাদকে নষ্ট করিতে না পারিলে, হিন্দুর হিন্দুত্ব, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, আমাদের স্বদেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে— এই দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে, ভোগের এবং বৈরাগ্যের মধ্যে, প্রবৃত্তিধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সমসাময়িক শিক্ষিতসমাজের ইহ-সর্ব্বস্বতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠাকল্পে, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম রচনা করেন।

৭

ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগেতেই ভারতের সনাতন সাধনা, প্রবৃত্তি বা ভোগ এবং নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য এই দুইএর একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরে মানুষের সহজ ভোগপ্রবৃত্তির সঙ্গে বৈরাগ্যধর্ম্মের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারামের সৃষ্টি করেন। আর এই কাজটি করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রাচীন গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মসন্ন্যাসকে একটা নূতন ও উন্নততর সোপানে তুলিয়া লয়েন। প্রথমে যাগযজ্ঞাদিই কর্ম্ম ছিল। তার পরে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন কর্ম্ম-যোগের নূতন অভিব্যক্তিরূপে প্রচারিত হয়। তারপর ভক্তিপথে ইষ্টদেবতার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি এবং তাঁহার লীলার অনুসরণ শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ বলিয়া বিহিত হয়। ভগবদ্‌গীতার কর্ম্মযোগ এই ধাপ পর্য্যন্তই উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন ভারতের কর্ম্মযোগের অভিব্যক্তিকে আর-একটা অভিনব এবং উদার সোপানে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করেন। তিনি লোকশ্রেয়কে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাই আধুনিক কর্ম্মযোগ। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথেই গীতোক্ত কর্ম্মযোগকে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারামের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু লোকশ্রেয় কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ লোকের পক্ষে এই লোকশ্রেয় কেবল একটা ভাবে বা ভাবুকতাতেই পর্য্যবসিত হয়। বাস্তব জীবনে প্রতিদিনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মধ্যে ইহা আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ হইলেই কেবল এই বিশ্বতোমুখী আদর্শের অনুসরণ কার্য্যতঃ সম্ভব হয়। যতক্ষণ এই বিশ্বমৈত্রী-সাধন না হইয়াছে, ততক্ষণ বিশ্ব-সেবা বা বিশ্ব-মানবের কল্যাণসাধন-চেষ্টা কখনও সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে না,

ভাবুকতাতেই আবদ্ধ হইয়া রহে। কোন একটা সত্য প্রেমের প্রেরণা জাগাইতে না পারিলে মানুষ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পথে পা ফেলিতে পারে না। কখন কখন মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়াই নিষ্কাম প্রেমের উদ্বোধন করিতে পারে। কিন্তু এ বড় কঠিন পথ; শাণিত ক্ষুরধারের মতন সূক্ষ্ম ও দুর্গম। কিন্তু এই নিষ্কাম প্রেমের এবং নিষ্কাম কর্ম্মের একটা সুগম এবং প্রশস্ত পথ স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশের প্রতি মানুষের মমত্ববুদ্ধি স্বভাবতঃ জন্মিতে পারে। এই মমত্ববুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ স্বদেশের সেবা করিতে যাইয়া কোন প্রকারের নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণ না করিতেও পারে— করাটা দুষ্পরিহার্য্য বা অপরিহার্য্য নহে। ইহা দেখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবী-চৌধুরাণীতে এবং সীতারামে দেশমাতৃকার প্রতি নির্ম্মলা ভক্তির উপরে আধুনিক নিষ্কাম কর্ম্মের বা কর্ম্মযোগের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই দেশপ্রীতিই এই তিনখানি উপন্যাসের মূলসূত্র। আর এইজন্যই আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম বাংলার নূতন স্বাদেশিকতার শাস্ত্র হইয়া আছে।

৮

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আদর্শে কোন প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না; থাকিলে এই স্বদেশপ্রীতির উপরে তিনি লোকশ্রেয়ের এবং লোকশ্রেয়ের উপরে তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ-সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। আনন্দমঠে তিনি দেশ-মাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশসেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা অতি প্রধান কথা। একদিকে আনন্দমঠ একটা অতি প্রবল স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান জাগাইয়া দেয়। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে এই স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বকল্যাণকামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আপনার সফলতা কিছুতেই আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য্য কুশলতা-সহকারে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া এই কথাটাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমন্বয় এখনও দেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যতদিন না বাঙ্গালী স্বদেশ-প্রীতির পথে আধুনিক যুগের উপযোগী কর্ম্মযোগ-সাধনের এই সঙ্কেতটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবে, ততদিন সে নিজের সভ্যতা এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান যুগের বিশ্বধর্ম্মকে আপনার সাধনা এবং সিদ্ধি দ্বারা ফুটাইয়াও তুলিতে পারিবে না।

এখনও বাঙ্গালী সে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আর যতদিন তাহা না হইয়াছে ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য্য শক্তি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সজীব থাকিবেই থাকিবে।

রচনা : বঙ্গাব্দ ১৩৩০

গল্প

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আমরা শৈশবে 'শোলোক' শুনতাম। শোলোক ব'লবার জন্যে পিসী জেঠাই আয়ীকে ধ'রতাম, মিনতি ক'রতাম। অনেকে জানতেন, কিন্তু ব'লতে জানতেন না। প্রবীণা প্রাচীনারা ব'লতে পারতেন। দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মাকেও শোলোকের লোভ দেখাতে হ'ত, কিন্তু সে শোলোক আসল নয়; বাজে, মন-গড়া। শোলোক নাম হবার কারণ, তাতে শ্লোক থাকৃত। শ্লোকই শোলোকের প্রাণ। একটার একটু মনে আছে। সেটা "কন্‌কাবতী"র,

> কনকাবতী মাগো ঘরকে এস না।
> ভাত হ'ল কড়-কড়্যে বেন্নন হ'ল বাসি
> আমরা কন্‌কাবতী মায়ের জন্যে তিনদিন উপবাসী॥

শেষ চরণটা ঠিক মনে প'ড়ছে না। আমি শৈশবে শুনেছি, পরে আর শুনি নি। কিন্তু আশ্চর্য্য, আজিও শ্লোকটি মনে আছে। এইরূপ শ্লোক শিশুর কানে কি মধু ঢেলে দেয়, তা সে ব'লতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে সে তার 'আখটি' ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু শ্লোকটি মনে রাখতে চায়, পারে না; 'কথা'র অল্প পারে, বেশীর ভাগ পারে না। এই কারণে একই শোলোক বার-বার শুনতে তার বিরক্তি আসে না। আর, যে শোলোক মনে না রইল, সে শোলোকই নয়। আমার বোধ হয়, কোনও অঞ্চলে তিন চারিটার বেশী শোলোক চলিত্‌ নাই। কন্‌কাবতী, রাজপুত্র ও কোটালপুত্র, সুআ রাণী ও দুআ রাণী, ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমী, আমাদের অঞ্চলে এই কয়টি শুনতে পেতাম।

শোলোক শুনবার বয়স আছে। শিশুর সাত আট বছর পর্যন্ত। তারপর উপ-কথা শুনবার বয়স। শোলোকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বিচার নাই, এ দেশ সে দেশের ব্যবধান নাই, কালেরও নাই। উপকথায় কার্য-কারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগ আছে, কিন্তু স্থায়িভাব এখানেও বিস্ময়। দেশভেদে উপকথাকে 'রূপকথা' বলে। সে দেশে 'আশু' নামের মানুষটি 'রাশু' হয়। কেহ কেহ মধুর বাল্য-স্মৃতিবশে 'রূপকথা' নামই রুচির মনে করেন, কেহ বা এই নামের সার্থকতাও দেখতে পান। আমার ভাগ্যে আমাদের অঞ্চলের প্রচলিত উপকথা শোনা ঘটে নি। তখন দেশের দুর্দিন, মেলেরিয়ার আকস্মিক ভীষণ আবির্ভাবে লোকের আর্ত্তনাদে শোকের কথাই শুনতে পেতাম। রঞ্জাবতীর কথা, নীলাবতীর কথা, বেহুলার কথা, দেশে প্রচলিত ছিল,

কিন্তু শুনতে পাই নি। মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়া-কাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ-কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথক-ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।

তখন ইস্কুলে পড়ি। তখনকার দিনে "বিজয় বসন্ত" নামে এক গল্পের বই ছিল। বইখানা সুবোধ্য ছিল না, এখন বিন্দুমাত্র মনে নাই। "আরব্যোপন্যাস"ও ছাপা হয়েছিল। ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও ব'লতে পারতেন যে লোকে তাঁকে গল্পের 'ধুকড়ী' ব'লত। পরে দেখেছি, তাঁর লোমহর্ষণ গল্পের কোনটা "দশ-কুমার চরিতে"র, কোনটা "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র, কোনটা "বত্রিশ সিংহাসনে"র। ভোজ ও ভানুমতীর ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না। তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম বিক্রমাদিত্যের মহিষী তিলোত্তমার উরুতে তিল ছিল; রাজমন্ত্রীর বধূবেশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদরোগ হ'তে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্থ ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হ'ত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব, একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ দেশেরই ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধূর্ততা, তাঁতীর মূর্খতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত ছিল। একটা গল্পও নূতন-গড়া নয়, কোন্ অতীত কাল হ'তে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ ভারত ও ভাগবত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্যামা-যাত্রা গান, বৈষ্ণবের কীর্তন, বাউলের গান, আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এখন বই পড়্যে গল্প শিখতে হ'চ্ছে।

কিন্তু গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হতে পারা যায় না। সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ-পঁচিশ জন একমনে শুনত। কথক

কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃ-লগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্প-লেখকের সে সুবিধা নাই। লেখককে ভাষা দ্বারা কথক হ'তে হয়।

গ-ল্প শব্দটি বেশী দিনের নয়। দুই-এক শত বছরের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। শব্দটির দুই অর্থ আছে। আমরা গল্প 'করি', গল্প 'বলি'। বন্ধু পেলে গল্প 'করি', গল্পে-সল্পে দু-দণ্ড কাটাই। এই গ-ল্প,— জল্প, জল্পন; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অসম্বদ্ধ কথন। গ-ল্প-স-ল্প শব্দের স-ল্প, বোধ হয় সু-লপ। লপ ধাতুর অর্থ লপন, ভাষণ। পূর্ব্ববঙ্গে বলে, গা-ল— গ-ল্প। গা-ল, বোধ হয় স' গল্‌ভ, প্রগল্‌ভতা। যে গল্লিয়া, গল্লো, গপ্পো, সে প্রগল্‌ভ, বাচাল। যখন কেহ গল্প 'বলেন', আমরা শুনি, তখন সে গ-ল্প, স' কল্প। কল্প,— কল্পনা, মানসিক রচনা, নির্ম্মাণ। এই গ-ল্পের জুড়ী ট-ল্প; যেমন গল্প-টল্প।

পূর্ব্বকালে ছিল, 'কথা'। অমরকোষে, কথা প্রবন্ধ-কল্পনা; প্রবন্ধের কল্পনা, মানসিক রচনা। তখনকার 'কথা'য় নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়ত বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ কেহ 'কথা'র লক্ষণে বলতেন, কথা-রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পদ্যে রামায়ণ, গদ্যে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হ'লে 'কথানক'। ক থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নী। 'কথা'য় কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হ'লে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা, গদ্যে লেখা হ'ত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা বলতে পারা যায়। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' ব'লতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্ট বিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা', বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারত-'আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় 'আখ্যান-মঞ্জরী' লিখেছিলেন, তিনি কয়েক জনের চরিত বর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন, 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত, কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিতের কত সত্য, কত অসত্য, তাহা কেহ জানত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান' আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব, উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন "দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা"য় ভোজরাজ-কর্তৃক

বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন-প্রাপ্তি, এক উপাখ্যান ; এবং এক এক পুত্তলিকা কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বর্ণন, এক এক 'কথা'।

বাংলায় কে 'উপন্যাস' নামটি প্রচলিত করেছেন, জানি না। যিনিই করুন, তিনি উ-প-ন্যা-স শব্দের অর্থ চিন্তা করেন নাই। ন্যা-স, স্থাপন, রাখা। টাকা ন্যাস, ন্যস্ত করা, টাকা জমা, গচ্ছিত রাখা। অঙ্ক কষিবার সময় রাশিগুলি যথাস্থানে ন্যাস ক'রতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। অঙ্গন্যাসে এক এক অঙ্গ এক এক দেবতার আশ্রয়ে রাখা হয়। উ-প-ন্যা-স, সমীপে স্থাপন। বাক্যের ও প্রবন্ধের 'উপন্যাস', উপক্রম, আরম্ভ। উ প ন্যা স ইংরেজী suggestion-ও বটে। এই ইংরেজী শব্দের বাংলা শব্দ পাই না। কেহ কেহ 'ইঙ্গিত' লেখেন, কিন্তু 'আকার-ইঙ্গিত' যে একেবারে ভিন্ন। বাংলা উপন্যাস, বৃত্ত-কল্পনা। দ্রাবিড় ভাষায় ও মরাঠিতে novelকে বলে কাদম্বরী, হিন্দী ও ওড়িয়াতে বলে কহানী। বাংলায় 'নব-ন্যাস', 'রম-ন্যাস' নামও দেখেছি। 'রম-ন্যাস' ইংরেজী romance অর্থে বলবার যুক্তি 'রম' টুকু ছাড়া কিছু পাই না। সে দিন দেখছিলাম শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর romanceকে 'কাহিনী' বলেছেন। বর্ণনীয় বিষয় ও ভাব চিন্তা ক'রলে এই নাম ঠিক। কিন্তু এই নামে লেখকের মন উঠবে না, 'কাহিনী' নামে নবীনতা কই ?

এখন দেখি, 'ছোট গল্প', 'বড় গল্প', 'উপন্যাস', এই তিন নামে গল্প চলেছে। সংস্কৃত নাম ব'লতে হ'লে, কথা, অতিকথা, পরিকথা। কিন্তু এই তিনের লক্ষণ কি ? লক্ষণ না ক'রলে সংজ্ঞা চলে না। বাংলা ভাষায় ক-থা শব্দের নানা অর্থ আছে। শব্দটি না থাকলে 'কথা-কহা' অসম্ভব হ'ত। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "কথা-মালা" লিখেছেন। বাঘ-ভালুকে কথা কয়, এ যে বিষম কথা। এখানে কথা, কল্পিত কথা, সব অসত্য। সংস্কৃতে রূপকে "হিতোপদেশ"। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "যজ্ঞ-কথা" লিখেছেন। তিনি কথক হ'য়ে যজ্ঞ ব্যাখ্যান করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কালিদাসের গল্প, পাখীর গল্প, আকাশের গল্প ইত্যাদি গল্প বই কথা নাই। কালিদাস সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল, তিনি যৌবনেও জড়বুদ্ধি মূর্খ ছিলেন, 'উষ্ট্র' উচ্চারণ ক'রতে পারতেন না। তাঁর গল্প সত্যানৃত-মিশ্রিত প্রবন্ধ। কিন্তু 'পাখীর গল্প', বোধ করি, পাখীর স্বভাব-বর্ণন। আ'জকা'ল বালকেরা বলে, আকবরের 'গল্প', অর্থাৎ আকবরের চরিত।

'শিশু-সাহিত্য' নামে কতকগুলি বই হয়েছে। একবার বছর সাতেক পূর্বে এক শিশুর নিমিত্তে একখানা বই খুজতে হয়েছিল। শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর,

বাংলা প'ড়তে পারত, কিন্তু থমক্যে থমক্যে প'ড়ত, যা প'ড়ত তা গুছিয়ে ব'লতে পারত না। তার এক বিশেষ দোষ ছিল, শব্দের আদ্য ও অন্ত্য অক্ষর প'ড়ত, মাঝের অক্ষর ছেড়ে যেত। বালকটির পিতা না মাতা হাসি-খুসি দ্বারা বাল-শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এরই ফলে এই দোষ ঘট্যেছিল। এখানে (বাঁকুড়ায়) বই-এর দোকানে বার-তের খানা বই পেলাম। পদ্য বাদ দিতে হ'ল; কারণ, পদ্যের ছন্দের গতিকে বর্ণ পরিচয় রসাতলে যায়। বিশেষতঃ, পদ্যগুলি নানা রঙ্গে ছাপা; সাদা কাগজে কালীর অক্ষর পরিস্ফুট হয়, অন্য রঙ্গের হয় না। রাক্ষস-বক্ষস, ভূত-প্রেতের বই বাদ দিতে হ'ল; কারণ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারি না। ভূত-ভীত করে্য চিরকাল ভীরু করতে পারি না। শেষে একখানি "শিয়াল-পণ্ডিত" ও হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কৃত "চাণক্য-শ্লোক" কিনে আনি। "শিয়ালপণ্ডিতে"র দোষ আছে। 'পণ্ডিতি' দীর্ঘ হয়েছে, স্থল-বিশেষে শিশুর অবোধ্যও হয়েছে। চাণক্য-শ্লোক পঞ্চাশটি বেছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেক অক্ষর শুদ্ধভাবে প'ড়তে হ'ত, বর্ণ- (উচ্চারণ-) জ্ঞান হ'ত। বাজে পদ্যের বদলে শ্লোক মুখস্থ ক'রলে চিরজীবন ধর্মের ন্যায় সুহৃদ হয়ে থাকে। বাল্যকালে পাঠশালায় আমাকে চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ ক'রতে হয়েছিল। সে বিদ্যা এখনও কাজে লাগছে।

'শিশু-সাহিত্যে'র পর 'বাল-সাহিত্য'। দশ হ'তে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার নিমিত্ত বাল-সাহিত্য। এদের নিমিত্তে অনেক বই হ'য়েছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অসংখ্য, গৃহ-পাঠ্যও অনেক। বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ফরমাইসী বই, প্রায়ই মাধুর্যহীন। এই হেতু বালক-বালিকারা প'ড়তে চায় না। গৃহ-পাঠ্য বইতেও সে দোষ নাই, এমন নয়। তথাপি গ্রন্থবিস্তার হেতু সে দোষ কতকটা কেটে যায়। ইদানী দেশের পুরাতন উপাখ্যানের প্রতি গ্রন্থকর্তাদের দৃষ্টি পড়্যেছে। এটি বাল-শিক্ষার পক্ষে শুভ। কারণ প্রথমে স্বদেশী, আর, প্রত্যেক উপাখ্যানেই হিতোপদেশ আছে। বাজে গল্পে থাকে না। মহৎ লোকের চরিতও লেখা হয়েছে। অনেকে 'চরিত' বলতে চান না; বলেন, 'জীবন-চরিত'। অনাবশ্যক 'জীবন' জুড়িবার কারণ ইংরেজীতে bio-graphy, যার bio মানে জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা 'চরিতে'র আগে 'জীবন' জুড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রীকৃষ্ণচরিত" লিখেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর "চরিতকথা" শুনিয়েছিলেন। এঁরা নূতন কিছু করেন নি। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ "চৈতন্য-চরিত-অমৃত" লিখেছিলেন। সংস্কৃতের ত কথাই নাই। ইদানী "জীবনী" নামও দেখতে পাই। কারণ ইংরেজী life শব্দের একটা অর্থ 'চরিত' আছে। কিন্তু 'জীবন' ও 'জীবনী' একই। এক জীবন-সংগ্রামেই

আমাদের জীবনান্ত হ'চ্ছে, তদুপরি দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবন, পারিবারিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, জাতীয় জীবন, জুটলে কতদিক সামলানো যাবে। শব্দের অর্থ-প্রসারণে দোষ নাই, যদি তদ্দ্বারা ভাষা সঙ্কুচিত না হয়।

'বাল-সাহিত্যে'র পর 'তরুণ-সাহিত্য'। তরুণ-সাহিত্যে গল্পের আসন প্রথম। গল্প-নামে উপন্যাসও ধ'রছি। বাজারে যে কত গল্প বেরিয়েছে, তা ব'লতে পারি না। আমার গল্প-পড়ার বাতিক ছিল না, খবরও রাখি না। তা ছাড়া ইচ্ছা হ'লে গল্প বেছে প'ড়তে পারি। কিন্তু মাসিকপত্র পাঠককে বাছতে দেয় না, গল্প না চাইলেও ঘরে এসে হাজির হয়। তখন গৃহস্থকে চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়, কি জানি সুন্দর প্রচ্ছদ-পটের ভিতরে কি আছে। কখন কখন সাপ লুকিয়ে থাকে। গুণিন মন্ত্র জানেন, ভয় নাই ; কিন্তু গৃহস্থ ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন।

'মাসিক-পত্র'— পত্র না গ্রন্থ ? এ বিচারে না গিয়ে 'মাসিকী' বলি। মাসিকীর দুই ভাগ করতে পারি। কতকগুলি এক এক সমাজ বা সঙ্ঘের কর্ম প্রচার ও উদ্দেশ্য সাধন করে। এগুলিকে 'সঙ্ঘ-মাসিকী' ব'লতে পারি। অপরগুলি সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দপিপাসা তৃপ্ত করে। এগুলিকে 'বার-মাসিকী' বলা যেতে পারে। (বার, অবসর ও সমূহ।) "ব্রাহ্মণসমাজ" নামে এক মাসিকী আছে, নামেই প্রকাশ এখানি সঙ্ঘ-মাসিকী। এতে গল্প ও পদ্য থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কারণ, গল্প ও পদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজের কি হিত হবে ? ব্রাহ্মণেই র'চবেন, প'ড়বেন, তাও ত নয়। সঙ্ঘ-মাসিকীর কর্তা, সঙ্ঘ। কিন্তু বার-মাসিকী মণিহারী দোকান। ক্রেতা যেমন, দোকানের দ্রব্যও তেমন রাখতে হয়, নইলে দোকান চলে না। চিত্র, পদ্য, গল্প না থাকলে ক্রেতা জুটে না, দোকানও ভরে না। দোকান ছোট ক'রতেও মন সরে না। বার-মাসিকীর বাহুল্য-হেতু সম্পাদককে পাঠকের মন জুগিয়ে চ'লতে হয়। আর, সচিত্র তিন শত পৃষ্ঠার একখানা বই আট আনায় বেচাও সোজা নয়।

কিন্তু গল্প-রচনা ভারি কঠিন। বাংলা ভাষা, সালঙ্কারা ভাষা লিখতে পারলেই গল্প র'চতে পারা যায় না। পদ্য-রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস ক'রলে পদ্য লিখতে পারা যায়। অবশ্য সে পদ্য, কাব্য নয়। কবি দুর্লভ, ক্ষণ-জন্মা। দৈবী-শক্তি না পেলে কবি হ'তে পারা যায় না। যে-সে পদ্যকে কবিতা ব'ললে কবিকে খাট করা হয়। কবির ভাব, কবিতা ; কবিতাই, কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য, পদ্য। পদ্য-কার ছান্দসিক। কবি পদ্যে ও গদ্যে, বাক্যের দ্বিবিধ রূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ ক'রতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পদ্য-কাব্য ও গদ্য-কাব্য।

উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পদ্যে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়।[১] যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয়, বাজে বকা।

নানা মাসিকীতে মাসে মাসে কত গল্প প্রকাশিত হ'চ্ছে, কেহ গণ্যেছেন কি না জানি না। শতাবধি হবে। সাপ্তাহিক বার্ত্তাপত্রেও গল্প থাকে। বোধ হয় গল্প-লেখক, বা গল্পক এক সহস্র হবেন। পদ্যরচনার নিয়ম আছে। ইংরেজিতে গল্প লিখবার ধারাপাত আছে। কেনই বা না থাকবে? কোন্ কর্মের নাই? বাংলাতে পত্র লিখবার ধারাপাত আছে। কিন্তু তা দিয়ে পত্রের আরম্ভ ও শেষ শিখতে পারা যায়, পত্রের বস্তুর বর্ণন শিখতে পারা যায় না। সে কর্ম পত্র-লেখকের।

গল্প ও উপন্যাসে তফাৎ কি? বাংলায় কিছু দেখতে পাই না। প্রয়োগে দেখি, ছোট গল্প, উপন্যাস বড়। যখন দেখি, এটি 'ছোট গল্প', ওটি 'বড় গল্প', তখনই বুঝি এই ভাগ বাহ্যিক। উপন্যাসেরও দৈর্ঘ্যের সীমা নাই; কোনটা এক শ পৃষ্ঠা; কোনটা পাঁচ শ পৃষ্ঠা। ক্রেতা পেলে হাজার পৃষ্ঠাও হ'তে পারত। যদি ইংরেজী story ও novel, বাংলার গল্প ও উপন্যাস মনে করি, তাহ'লে গল্পের 'বন্ধ' (plan) ঋজু, উপন্যাসের সঙ্কুল (complicated)। সঙ্কুল বটে, কিন্তু দৈবাৎ নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত কূটবন্ধ (plot)। রস-হিসেবে উপন্যাস নানা রকম। বীর ও অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজী romance, রোমাঞ্চন। পৌরাণিক-প্রবর লোমহর্ষণ অদ্ভুত কথা শোনাতেন। ইংরেজী মতের গল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতি ঐ রকম হ'লেও সংসারে বিকৃতি-ই বহু। তাতে দুঃখই বা কি? রাগিণী বেহাগ মিষ্ট, কিন্তু বেহাগ-ড়া ত কম নয়। কলার হানি হ'লে কোনটাই মিঠে নয়। গল্পে কলাই প্রধান। বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু 'তাজমহল' পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্রেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)। পূর্বকালের চৌষট্টি কলার মধ্যে "কাব্যক্রিয়া" একটা কলা ছিল। কাব্যকলা, চিত্রকলা শব্দের প্রয়োগ আছে। কলা, চাতুরী, ছল (fraud)। লোকে বলে, "লোকের ছলা কলা," "লোকটার কলা (গ্রাম্য, 'কল্লা') দেখে বাঁচি না।" কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্যভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড়; আমরা পটে গাছ-পাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইন্দ্রজাল করেন, কবি ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইন্দ্রজাল, কবিতা। এটি তাঁর স্বভাবজ। কখন কখন অন্যেও কবিতা অনুভব করেন, প্রকাশও করতে পারেন, কিন্তু সেটা ঔপাধিক, অবস্থা-বিশেষে স্ফুরিত হয়।

ইংরেজীর মাপ-কাঠিতে চ'লতে হবে, কিম্বা গল্প ও উপন্যাসের বন্ধ শুদ্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কি আছে। পাঠক চান আনন্দ, রসই আনন্দের হেতু। কার্যকারণ এক হ'য়ে আনন্দ ও রস সমার্থ। প্রাচীন কাব্যরসিক খুজে খুজে নয়টি রস পেয়েছিলেন, একটি বাড়াবার কমাবার নাই।[২]

নয়টা রসের একটা-না-একটা না থাকলে কাব্য হবে না, এমন নয়। এর দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"। এটি গল্প না উপন্যাস? এতে উপন্যাসের ফন্দি বিলক্ষণ আছে। কালাদীঘির ডাকাতেরা বেহারা ও ভোজপুরী দরোয়ানকে ঠেঙিয়ে ইন্দিরার অলঙ্কার কেড়ে নিতে পারত, ইন্দিরা বি-গাঁয়ে হারিয়ে যেত না। "ইন্দিরা"য় স্থায়িভাব কিছুই নাই। ইহার আরম্ভ বিস্ময়ে; পরিণতি, কৌতুক বা হাস ভাবে। "রাধারাণী"তেও কোন স্থায়িভাব নাই। রচনার মাধুর্য-গুণে গল্পটি মনোহারী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি রোমাঞ্চন। আমরা বীর ও অদ্ভুত রসে সহজে মুগ্ধ হই। মহাভারতের বিরাটপর্ব এইভাবে বিরাটই বটে। বোধ হয়, এই কারণে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বিরাট-পাঠের বিধি হয়েছে।

যাঁর কবিতা স্বভাবজ নয়, তিনি গল্প লিখলে দুই একটি পারেন, বেশী পারেন না। ঔপাধিক গুণ-প্রকাশের ক্ষেত্র অল্প। তথাপি কেহ কেহ একটি গান, একটি পদ্য-কাব্য, একটি উপন্যাস, একটি গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। একটিতেই তাঁদের অনুভূতির উৎস নিঃশেষ হয়েছে। এমন গল্পের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। সন ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "আগন্তুক" নামে এক গল্প লিখেছিলেন।[৮] আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। গল্পের বস্তু যৎসামান্য। এক গ্রামের চক্রবর্তীর এক জামাই বিবাহ-পরে বিদেশে চাকরি করতে গেছলেন। কয়েক বৎসর পরে ছুটি পেয়ে শ্বশুরমশায়কে না জানিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। সেদিন দৈবাৎ চক্রবর্তী গ্রামান্তরে গেছলেন, বাড়ীতে পুরুষ কেহ ছিল না, শাশুড়ী ও বনিতা, কমল, মাত্র ছিলেন। চাকর্যে যুবা; বেশে অবশ্য ভদ্রলোক। বাড়ীর এক কৃষাণ ধান ঝাড়ছিল, কলিকায় তামাক সেজে ভদ্রলোককে তামাক ইচ্ছা করতে দিলে। লোকটি তামাক খায় না, চক্রবর্তী বাড়ীতে নাই শুনেও উঠল না! চক্রবর্তীনীর এমন বিপদ কখনও ঘটে নি। স্নানের বেলা হ'লে আগন্তুক এমন কাণ্ড ক'রলেন যে চক্রবর্তীনী স্তম্ভিত। কমল ঘড়া ও তেলের বাটী পুকুরঘাটে রেখে সইকে ডাকতে গেছে, ভদ্রবেশী যুবকটি সে বাটীর তেল নিয়ে মেখে স্বচ্ছন্দে স্নান করলে! এমন আস্পর্ধা সইবার নয়; এ যে দিনে ডাকাতি! আগন্তুক সব শুনতে পেলেন। মধ্যাহ্ন হ'ল, লোকটাকে অভুক্ত রেখে গৃহস্থ খেতে পারে না। অগত্যা চক্রবর্তীনী

ঘোমটা টেনে ভাতের থালা রেখে গেলেন। আহারান্তে পাড়ার গিন্নীবান্নীর সভা বসল, ডাকাতকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবার পরামর্শ হ'ল। কিন্তু মারে কে? সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তী বাড়ী এসে জামাই দেখে খুসী। ভিতরে গিয়ে গিন্নীকে ব'লতেই তাঁর যে কি দশা হ'ল, তিনিই জানেন। লজ্জা, বিস্ময়, ক্রোধ, ব্যস্ততা, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের সমাবেশে হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। গল্পকার পরে "প্রবাসী"তে দুই তিনটা গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু একটাও ভাল হয় নাই।

গল্পের ক্ষেত্র ছোট, উপন্যাসের বড়। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্র অসংখ্য, উপন্যাসের অল্প। অধিকাংশ উপন্যাসে নিয়তির জয় ঘোষিত হয়। সংসারে তাহাই ঘটে। কথাই আছে, মানুষের ভাগ্য দেবতাও জানেন না। সোনার মৃগ হয় না, হ'তে পারে না, জেনেও রামচন্দ্র সে মৃগ অনুসরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির এত জ্ঞানী; তবু কপটদ্যূতে আসক্ত হ'লেন; নীতিজ্ঞ হ'য়েও দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। মহাভারতে অদৃষ্টের ফল পুরুষকারকে হারিয়ে দিয়েছে। অদৃষ্ট, পূর্বজন্মার্জিত ফল; পুরুষকার এ জন্মের। বহু প্রাচীন কাল হ'তে এ দুই নিয়ে বহু বিচার হ'য়ে গেছে। কেহ কেহ 'কাল' আর এক কারণ বল্যেছেন। কাল অনুকূল না হ'লে মানুষের যত্ন সফল হয় না। এ ত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ ক'রছি। সেইরূপ দৈব অনুকূল না হ'লে কাল ও যত্ন কিছুই করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে" তিনই দেখতে পাই। নগেন্দ্রনাথ নৌকায় যেতে যেতে ঝড়ে প'ড়বেন, অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দিবেন, এ ত দৈবের ঘটনা। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর "অভিশপ্ত সাধনা" উপন্যাসে দৈববল ও কর্মবলের পরীক্ষা কর্য়েছেন। কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে জেনেছিল, কে তার বিপদের কারণ হবে, তথাপি সে বিপদেই পড়্যেছিল। "অভিশপ্ত সাধনা"য় কর-রেখা ও জন্ম-কোষ্ঠী দ্বারা নায়িকাও তার দয়িতকে প্রাণ-সংহারক জানতে পেরেছিল, তথাপি তার হাতেই প'ড়ল! মনে হ'তে পারে, এ সব কল্পনা। কিন্তু কে না জানে প্রতিদিন নিয়তির খেলা চ'লছে। চ'লছে বল্যেই লোকে ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। গান্ধীজী মহাত্মা হ'লেন; কই আর কেহ হ'তে পারলেন না। তিনি তপস্যাই বা কেন করতে গেলেন? এই প্রবৃত্তি কোথা হ'তে এল? উপন্যাসের বন্ধ, নিয়তির বন্ধ। আমরা অ-প্রত্যাশিত ফল দেখে মুগ্ধ হই, বিমূঢ় হই। কোথা হ'তে কি যে হয়, বিশ্বকর্ত্রীই জানেন।

এক গল্প-কীট ব'লতেন, "গল্প চারি প্রকার। যথা, কোনটা দৈবাৎ ঘন আবর্তিত দুগ্ধ; খেলে বুঝতে পারি, হাঁ, কিছু খেয়েছি, অনেক দিন মনে থাকে। কোনটা জল্যো দুধ, পানস্তে ঠেকে, এ বেলা খেলে ওবেলাকে মনে থাকে না। কোনটা

পিঠালীর গোলা, দুধের গন্ধও নাই, কেবল দেখতে শাদা। কোনটা পচা ছেনার জল, গন্ধেই বমি উঠে।" গল্পের সমালোচনা হ'লে গল্প-কার দোষ-গুণ বুঝতে পারতেন। "সাহিত্যে" অল্প-স্বল্প সমালোচনা থাকত, লেখক ও পাঠকের উপকার হ'ত। সমালোচক, বিচারক। অর্থী লেখক; প্রত্যর্থী পাঠক। স্বীয় রচনার প্রতি সকলের মমতা হয়, বন্ধুজনের প্রতি বিচারকেরও মমতা হয়। কিন্তু উভয়েই মমতা ত্যাগ ক'রতে না পারলে পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। আমি গল্প কদাচিৎ পড়ি। গল্পের আরম্ভ ভাল লাগলে পড়ি, নইলে সেখানেই ছাড়ি। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে গল্পের সমালোচনা সাজে না। দু-একটা দোষ চোখে ঠেকেছে, লিখি। দেখি, কোনটার আরম্ভ বেশ, বন্ধও বেশ, কিন্তু শেষে হত-ইতি-গজঃ। মনে হয় যেন লেখক পাতা গ'ণছিলেন, হঠাৎ দেখলেন পাতা বেড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সমাপ্তি কর্যে ফেললেন। এর ফলে ভাব-ভঙ্গ ঘটে। দ্বিতীয় দোষ, গল্পের অনাবশ্যক বাহুল্য। স্বগতোক্তি অল্প হ'লেই ফলোৎপাদক হয়। মনের বিতর্ক দীর্ঘ হ'লে পাঠকের ধৈর্য লোপ হয়। পদ্য-কাব্যে অলঙ্কার-বাহুল্য ঘটে, গদ্য-কাব্যেও ঘটে। তখন প্রতিমার রূপ দেখতে পাই না, কিঙ্কিণীর ঠুন্-ঠুন্ ধ্বনি-মাত্র কর্ণগোচর হয়। তৃতীয় দোষ, অশিষ্টেরা বলে, "বিদ্যা ফলানা"। বিদ্যার পরিপাক না হ'লে, উদ্‌গার ওঠে। পাঠক এ দোষ সইতে পারেন না। দৃষ্টান্ত ও উপমার নিমিত্ত বাঙালী পাঠককে বিলাতে যেতে হ'লে তিনি পর্যাকুল হয়ে পড়েন। চতুর্থ দোষ, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত', প্রসঙ্গ-বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র "ইন্দিরা"র শেষে এই দোষ কর্যেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ পরিচ্ছেদটি না লিখলেও লিখতে পারতাম।" তাঁকে বরের বাসর ঘরের "একটি চিত্র দিবার বাসনা" ভ্রান্ত কর্যেছিল। তিনি এ বাসনা অন্যস্থলে মিটাতে পারতেন।

তিনি রসিক ছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীলতা করেন নাই। যে বাক্যে শ্রী শোভা লক্ষ্মী নাই, সেটা অশ্রীল, অশ্লীল। যে বাক্য শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, সেটা সমাজের অমঙ্গল-জনক। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থেই প্রকাশ, এতে অসামাজিকতা থাকবে না, পরন্তু সমাজের হিতেচ্ছা থাকবে।[৩] প্রত্যেক সমাজেই ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সুপ্রবৃত্তি-কুপ্রবৃত্তির ভেদ আছে। গল্পে সে ভেদ না মানলে গল্পটা সমাজ-বিদ্বেষ্টা হয়; পাঠকের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। গল্প পড়্যে জুগুপ্সার উদয় হ'লে গল্প নিষ্ফল। সে গল্পে রচনাশক্তি থাকলে পাঠক ভাবতে থাকেন, লেখকটি কে, তাঁর চরিত্রই বা কিরূপ। পদ্য-কাব্যে ও গদ্য-কাব্যে, এমন কি তুচ্ছ গল্পেও, লেখক স্বচিত্তই প্রকাশ করেন, তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না। কলার জন্যে কলা-চর্চা,—এটা আত্ম-বঞ্চনা।

"প্রবাসী"-সম্পাদক ১৩৩৬ সালে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত গল্পের ভাল তিনটি

বাছতে গ্রাহকগণকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, পাঠকেরা কি প্রকার গল্প ভালবাসেন। তাঁর কামনা সফল হয় নাই, মাত্র সাতাত্তর জন নিজের নিজের মত জানিয়েছিলেন (১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী")। এই ঔদাসীন্যের নানা কারণ থাকতে পারে। হয়ত অল্প গ্রাহক গল্প পড়েন। হয়ত যাঁরা ভাল মন্দ বিচার করতে পারেন, তাঁরা পড়েন না। হয়ত বা কোন গল্প তাঁদের ভাল লাগে নি। কারণ যাই হ'ক, ঐ সালের তিনটি গল্প আমার মনে আছে। তন্মধ্যে দুটি পুরস্কৃত হয়েছে। একটি পরশুরামের "গল্পিকা", অন্যটি "রাণুর প্রথম ভাগ"। পুরস্কৃত তৃতীয় গল্প, "চাপা আগুন"। এটি পড়ি নাই। এখন পড়্যে দেখলাম। বোধ হয় এর প্রথম 'পেরা' পড়্যেই ছেড়েছিলাম। এ যে ভাবের মাথায় লাঠি মারা। রচনা স্বাভাবিক নয়, আগাগোড়া কৃত্রিম, কলা-হীন। এই দোষে "আগুন" খুজে পাওয়া যায় না। যে তৃতীয় গল্প আমার মনে আছে, সেটির নাম "সন্ধ্যামণি" (দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯০ পৃষ্ঠা)। গল্পটি 'সত্যাকৃত' (realistic), আদিরসেরও বটে। কিন্তু লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেককে পরাভূত করে নাই। এই কারণে করুণরসে পাঠকের চিত্ত দ্রব হয়।

এত যে গল্প লেখা হ'চ্ছে, পড়ে কে? বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়েন না, প্রৌঢ় প্রৌঢ়াও পড়েন না। তাঁরা সংসারে অনেক সত্য গল্প দেখেছেন, ভুগেছেন, মিথ্যা গল্পের প্রয়োজন পান না। পড়ে, যুবা বয়সের নরনারী।

এর কারণ আছে। গল্পে মানব-চিত্তচাতুর্য বর্ণিত হয়। দক্ষতা নিপুণতা চাতুর্য বটে, চারুতা রমণীয়তাও চাতুর্য। যৌবনের ধর্মে মানুষ পরচিত্ত-চকোর হয়, স্বপেয় রস অন্বেষণ করে। সংসার-জ্ঞান নাই, গল্প পড়্যে জ্ঞান-পিপাসাও তৃপ্ত করে। ভুক্তান্ন-রস সর্বদেহে চ'রলেও হৃদয়ে তার স্থান। চিত্ত-রসের স্থানও হৃদয়। তরুণের হৃদয় আছে; কাব্য সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত রচিত হয়। তরুণ অপেক্ষা তরুণী কাব্যরসে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ, তার জ্ঞানবৃত্ত হ্রস্ব, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রতে পায় না। এদের নিমিত্ত গল্প লিখতে হ'লে সবিশেষ ভাবতে হয়। যে গল্প প'ড়লে চিত্তের প্রসাদ ও প্রসার হয়; ক্ষণিক উদ্দীপনা নয়, পবিত্র-ভাব স্থায়ী হয়; অবসাদ নয়, উৎসাহ হয়; সে গল্পের অসংখ্য ক্ষেত্র আছে।

বৎসর গণ্যে তারুণ্য নিরূপিত হয় না। কারও অল্প বয়সে তারুণ্য আরম্ভ হয়, কারও পঞ্চাশ বৎসরেও শেষ হয় না। না হ'লেও যৌবনকাল পঁচিশ ত্রিশ বৎসর। কবির কবিতার বয়সেরও এই সীমা। আমাদের দেশে এ সীমা কদাচিৎ অতিক্রান্ত হয়। কালিদাস কত বয়সে "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" লিখেছিলেন? আমরা সে বয়স

জানি না বটে, কিন্তু ব'লতে পারি পঞ্চাশের অনেক আগে, ত্রিশের সময়ে। পঞ্চাশের পরে যদি তিনি কোন কাব্য লিখে থাকেন, সেটা অভ্যাসের গুণে, হৃদয়ের রস-প্রভাবে নয়।[৪]

রচনা : ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

১ এখন পদ্য-গল্পের নাম গাথা দেখতে পাই। নামটি ঠিক কি ? সংস্কৃতে 'গাথা' একটি কি দুটি শ্লোক, যা লোকে গাইত, স্মরণার্থে কীর্তন ক'রত। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় "গাথা সপ্তশতী" ; এখানেও একটি একটি শ্লোক, যদিও সংস্কৃতে নয়। পালি ভাষায় "থেরীগাথা" বৌদ্ধ স্থবিরার বৃত্ত কিন্তু গেয়। বাংলাতেও গাথা ছিল ; যেমন পশ্চিম-দক্ষিণ রাঢ়ের "নীলাবতী" বা "লীলাবতী", মধ্য-রাঢ়ের রাজা রণজিৎ রায়ের 'গাথা', রণজিৎ রায়ের বৃত্ত। এ সকল পদ্য গাওয়া হ'ত। গাথক=গায়ক। সর্পবৈদ্যেরা লখিন্দরের কথা গায়। সেটি গাথা। গোপিচাঁদের গীত, গাথা। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করেছেন। গাথা সত্যমূলক। গাথাকে 'পল্লীগীতি' বলা ঠিক নয়। পল্লী, গ্রাম, নগর, নাম-ভেদে গাথা হয় না। আর, বাউলের গান, গীতি বটে, কিন্তু গাথা নয়।

২ আশ্চর্য বিশ্লেষণ-শক্তি। আরও আশ্চর্য, নয়টা রসের আদি, প্রধান, একটি। সেটির নাম আদিরস। অপর আটটি— বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, শান্ত। শান্তরসে কর্মের অভাব। দৃশ্য-কাব্যে এ রসের স্থানও নাই। কেহ কেহ বাৎসল্য নামে আর এক রস স্বীকার করেন, কিন্তু ভক্তি সখ্য প্রভৃতিকে রস না বলো 'ভাব' বলেন। ভাবের সংখ্যা নাই। অনুরাগ ও বিরাগ এই দুই ভাব, সকল ভাবের ও রসের মূল। প্রাচীন রস-বেত্তারা আদিরসকে নায়ক-নায়িকার প্রেমে বদ্ধ রেখে অনুরাগের ক্ষেত্র খর্ব করেছেন। নইলে এই রসকে মধুর রস বল্যেও বাৎসল্য, সখ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দাস্য প্রভৃতিকে মধুর রসের অবান্তর ভাবতে পারতেন। পাত্র-ভেদে মধুর রস নানাবিধ ; বিরাগও নানাবিধ। অনুরাগ-বিরাগের অন্তর্ধানে শান্তরস। সেটি নবম। অন্যদিকে, ষড়্ রিপুর আদি রিপুও কাম। কাম হ'তে লোভ। কাম্যের লাভে মদ, অ-লাভে ক্রোধ। ক্রোধ হ'তে মোহ ও মাৎসর্য। কবি যে পথেই যান, এই ছয় পথে ঘুরতে থাকেন ; এই ঘূর্ণি-পাকে নব-রসের উৎপত্তি। বাংলা গল্পে কোন্ রিপুর প্রাবল্য, কিম্বা রস থাকলে কোন্ রস অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তা বিবেচনার বিষয়।

৩ সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধরেন, কেহ "সাহিত্য-দর্পণ" অনুসরেন, কেহ ইংরেজী literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ স্মরণ করেন। কোন্ পথে চল্যেছেন ব'ললে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধরলে বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'সহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দের দুই অর্থ আছে। সমভিব্যাহৃত, (company, association)। পূর্বে বলা হ'ত, 'লোকের সমভিব্যাহারে' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যারে'। আমরা এখন বলি, 'লোকের সহিত'। 'সহিতে', সঙ্গে, পূর্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সঙ্গী, সেথো। "শূন্যপুরাণে" "সহিতর দানপতি" সেথোর কর্তা। অর্থাৎ, সহিত, সমাজ, গোষ্ঠী। সাহিত্য, মাঠে গোঠে জন্মে না।

কতকগুলি সমধর্মী লোকের গোষ্ঠী-নির্মিত সাহিত্য। এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় সহিত' সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে; কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হ'তে এ অর্থও আসে—স-হিত, সহ-হিত, হিতযুক্ত। অতএব ব'লতে পারি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য, ধার্মিকের ধর্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গাণিতিকের গণিত-সাহিত্য, ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হ'লেও সাহিত্যিক আখ্যা লাভ হ'তে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হ'তে পারেন।

৪ প্রবাসীর এক পাঠিকা আমার "গল্প" প্রবন্ধে দু-তিনটা ভুল দেখিয়েছেন। ১৩০৭ সালের 'সাহিত্যে'র "আগন্তুক" গল্পের লেখক শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নহেন। তাঁর নাম শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে বছরের 'সাহিত্যে' আর দুটা গল্প লিখেছিলেন, 'প্রবাসী'তে নয়। দেখছি, আমার বিস্মরণ হয়েছিল। কিন্তু মনে প'ড়ছে, শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "প্রবাসী"তে লিখেছিলেন। পাঠিকা লিখেছেন, 'কন্‌কাবতী মায়ের 'জন্যে' ' নয়, 'মায়ের তরে' হবে। 'তরে'ই ঠিক। —প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ

নরনারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমীর এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে; ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যান্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশ-বিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যান্টনির উচ্চতা সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। লামারমুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক-না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপাল-কুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখো। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কী।'

সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন, 'তুমি বঙ্কিমবাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে। মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন; কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।'

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না; গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কেন। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্যেই বিকশিত

হয় নাই। এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা, এমন অধ্যবসায় উক্ত উপন্যাসের কয় জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে। আনন্দমঠ তো কার্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ জীবানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনামাত্র; যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরানীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে। রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব। নহে।'

সমীর কহিলেন, 'ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটি রূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। শতরঞ্চ-ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান ছক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ তাহা নির্জীব কাষ্ঠ-মূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিস নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাব-প্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও-না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহ-কটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটল ভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্যমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর!'

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্যই স্ত্রীলোকের। কার্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্ধ্বনেত্রে নিশীথগগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কী সুখ পাইত! কোন্‌ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে। যে জ্ঞান কোনো কার্যে লাগিবে না, কোন্‌ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে। যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্‌ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে। ক্ষিতির কথামত পুরুষ যদি যথার্থ কার্যশীল হইত তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না— তবে একটি নূতন তত্ত্ব, একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জনের মধ্যে,

অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ— ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জনতার মধ্যে থাকে। কার্যবীর নেপোলিয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, তিনি সর্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম তো কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের একজন নায়ক, কিন্তু সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল। তিনি কি কাজ করিতেছিলেন, না, ধ্যান করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে কোনো ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত, জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে; তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।'

দীপ্তি কহিল, 'তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা— কিছুই বুঝিবার জো নাই। মেয়েরা যে কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই।'

ব্যোম কহিলেন, 'স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে; সেই তাহার অন্তঃপুর, তাহার চারি দিকে কোনো অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য কী তেমন দ্রুতবেগে তেমন তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ। রমণী যদি এক বার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জলিতেছে, শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য।'

আমি কহিলাম, 'আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎ রক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল, 'এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।'

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশি করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম, স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভালোবাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'কখনোই না।'

স্রোতস্বিনী মৃদু ভাবে কহিল, 'সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড়ো বেশি মধুর।'

স্রোতস্বিনী রমণী হইলেও সত্য কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম, 'তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয়। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্যতা-পরিমাপের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রমাণ নাই। সেই জন্য গায়ক প্রত্যেক বার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেই জন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।'

সমীর কহিলেন, 'কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব, স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।'

আমি কহিলাম, 'স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দ দান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সংগীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই জন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। কেবল অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ক্রটি-অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এই জন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড়ো ভয়ানক।'

ক্ষিতি কহিলেন, 'তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল; কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ। বৃহৎ দেশে ও বৃহৎ কালে তাহার স্থান নাই। উপস্থিতমত স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্তব্য সাধিত হয়। যাহার

জীবনের কার্যক্ষেত্র দূর দেশ ও দূর কালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্তমান কালের নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে; সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদায় লাভ লোকসান বর্তমানে; হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এই জন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানা কড়ি ছাড়িতে চায় না।'

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন, 'বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য করি না বলিয়া আমাদের কার্যের গৌরব অল্প, এ কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষ-দেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন; স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনর্বার নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। যেন ভিখারি না হইয়া, অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখো, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতি দিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ, প্রতি মুহূর্তে কর্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে, প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য। যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী প্রতি দিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ স্পর্শ দান করেন, আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্যস্থল সংকীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে। যদি সেই লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।'

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমাদের

দেশের স্ত্রীলোকের কথা কী বলিতেছিলে— মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।'

আমি কহিলাম, 'আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ!'

ক্ষিতি কহিলেন, 'তাহার প্রমাণ?'

আমি কহিলাম, 'প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। প্রমাণ অন্তরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোনো কোনো নদী দেখা যায় যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূ ধূ করিতেছে, কেবল এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হূহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে-কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর, আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা; এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর, তুমি কী বল।'

সমীর স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। বিশ্বসংসারের মধ্যে বাঙালি পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কী ভাই। ঐ যে আমাদের মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্পগুলি সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব। আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের নির্নিমেষ সন্ধ্যাদীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরবহীন মুখের

চতুর্দিকে অনন্ত অতৃপ্তি -ভরে শতসহস্র বার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম, তবে উহাদেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোটো ছিল তখন মাটির পুতুল লইয়া এমনি ভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড়ো হইল তখন মানুষ-পুতুল লইয়া এমনি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে। তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না। এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না। যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানব-ভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে। কিন্তু আমরা যে এক-একটি দেবতা, সেই জন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অসংকোচে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্মাণ করিতে পারিয়াছি।'

দীপ্তি কহিলেন, 'যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে সে মানুষ হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে, এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জ ভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়-মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত। হায় হায়, বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কী বা দেবতার শ্রী! কী বা দেবতার মাহাত্ম্য!'

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না। তোমরা যদি দেবতা না হও,

আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কী। তা ছাড়া, আমাদের তো সকল গুণ নাই— হৃদয়-মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।'

আমি কহিলাম, 'মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে। নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্য কথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবী, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা-কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের ; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের ; এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর— প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।...

'একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালোমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে ; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে স্টীম্‌নৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাই-ভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতা -পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী-নামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্য দেশে পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্যে বহু কাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহ-পালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই ; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায়

ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনি ভালোবাসিতে আরম্ভ করে তখনি তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়; তখনি তাহার চিন্তা বিবেচনা যুক্তি কার্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি, সজাগ হইয়া উঠে; তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে না; জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।'

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, 'আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা এবং বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা কাষ্ঠ জ্বলে না, মরিচা-ধরা চাকা চলে না; যত জ্বলে তাহার চেয়ে ধোঁওয়া বেশি হয়, যত চলে তাহার চেয়ে শব্দ বেশি করে। আমরা চিরদিন অকর্মণ্য ভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এই জন্য শিক্ষা তোমরা যত সহজে যত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পার, আপনার আয়ত্ত করিতে পার, তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পার, আমরা তেমন পারি না।'

স্রোতস্বিনী অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, 'যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কী উপায়ে কী কর্তব্য-সাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হউক চেষ্টা করিতে পারিতাম।'

আমি কহিলাম, 'আর তো কিছু করিতে হইবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক, সত্য সরলতা শ্রী যদি মূর্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে সে গৃহে বিশৃঙ্খলতা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই, এই জন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বাড়াবাড়ি— তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে, এই অসংযত কার্য-স্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়; তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন, পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।'

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সভা ছাড়িয়া গেলে ক্ষিতি হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, 'এইবার সত্য কথা বলিবার সময় পাইলাম। বাতাসটা এইবার মোহমুক্ত হইবে। তোমাদের

কথাটা অত্যুক্তিতে বড়ো, আমি তাহা সহ্য করিয়াছি; আমার কথাটা লম্বায় যদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সহ্য করিতে হইবে।

'আমাদের সভাপতিমহাশয় সকল বিষয়ে সকল দিক দেখিবার সাধনা করিয়া থাকেন এইরূপ তাঁহার নিজের ধারণা। এই গুণটি যে সদ্‌গুণ আমার তাহাতে সন্দেহ আছে। ওকে বলা যায় বুদ্ধির পেটুকতা। লোভ সম্বরণ করিয়া যে মানুষ বাদসাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে সেই যথার্থ খাইতে পারে। আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ, এবং ধারণ করে সম্যক্‌রূপে। বুদ্ধির যদি কোনো পক্ষপাত না থাকে, যদি বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশ্রী অভ্যাস তাহার থাকে, তবে সে বেশি পায় কল্পনা করিয়া আসলে কম পায়।

'যে মানুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ অতিরিক্ত পরিমাণে অপক্ষপাতী সে যখন বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষপাতী হইয়া পড়ে, তখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে, তখন তার সেই অমিতাচারে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। সভাপতিমহাশয়ের একমাত্র পক্ষপাতের বিষয় নারী। সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।

'পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের ভুলচুক ত্রুটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে। বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো সংসারে, সেখানে সহজ বুদ্ধিই কাজ চালাইতে পারে। সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী, তাহার অশিক্ষিতপটুত্ব; তাই বলিয়াই সে সুশিক্ষিতপটুত্বের উপরে বাহাদুরি লইবে, এ তো সহ্য করা চলে না। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে যাহা সহজে সুন্দর, তার চেয়ে বড়ো জাতের সুন্দর তাহাই— বৃহৎ সীমায় যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নে যাহা চিহ্নিত, অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌষম্যে অতিললিত অতি-নিখুঁত নয়।

'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিচার করিয়াছ তাহাকে আমি ধিক্কার দিই, তাহার অমিতভাষণেই প্রমাণ হয় তাহার অমূলকতা। পৃথিবীতে কাপুরুষ অনেক আছে, আমাদের দেশে হয়তো বা সংখ্যায় আরো বেশি। তার প্রধান কারণটার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, তাহা দুর্মূল্য বলিয়াই দুর্লভ। আদর্শ নারীর উপকরণ-আয়োজন অনেকখানিই জোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এই জন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে

পারে তাহাদের তুলনা তোমার মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়। অন্তত আমাদের দেশে, এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ নয় মেয়েরাই। তাহাদের অন্ধসংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষা, তাহাদের কৃপণতা! মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্য, প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। এ কথা মনে রাখিয়া দুই জাতের তুলনা করিয়ো।

'স্ত্রৈণকে মনে মনে স্ত্রীলোক পরিহাস করে; জানে সেটা মোহ, সেটা দুর্বলতা। একান্ত মনে আশা করি, দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী তোমাদের বাড়াবাড়ি লইয়া উচ্চহাসি হাসিতেছে; না যদি হাসে তবে তাহাদের 'পরে আমার শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহারা নিজের স্বভাবের সীমা কি নিজেরাও জানে না। পরকে ভোলাইবার জন্য অহংকার মার্জনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে চাপা হাসি হাসা দরকার। নিজেকে ভোলাইবার জন্য যাহারা অপরিমিত অহংকার অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত আত্মসাৎ করিতে পারে তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে, মেয়েদের হাস্যতা-বোধ নাই— সেটাই হসনীয়, এমন-কি শোচনীয়। স্বর্গের দেবীরা স্তবের কোনো অতিভাষণে কুণ্ঠিত হন না, আমাদের মর্তের দেবীদেরও যদি সেই গুণটি থাকে তবে তাঁহাদের দেবী উপাধি কেবলমাত্র সেই কারণেই সার্থক।

'তার পরে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তোমাদের আলোচনার ওজন রক্ষার জন্য বলা দরকার। মেয়েদের ছোটো সংসারে সর্বত্রই অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ এ কথা যদি বলি তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে। তাহার কারণ, সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌ বলে, তাহার ভালো আছে, মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই-সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ, কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায় সে কথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না। দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি। তুমি বলিবে, সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতি মাত্রায় হৃদয়ালুতা।

'তোমাদের শিভল্‌রি সাংঘাতিক তেজে উদ্যত হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমরা অনেক কটু ভাষা নিক্ষেপ করিবে জানি, কেননা মনে মনে বুঝিয়াছ, আমার কথাটা সত্য। সেই গর্ব মনে লইয়া দৌড় মারিলাম; গাড়ি ধরিতে হইবে।'

মূল রচনা: ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেস্ট্‌-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই; কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন; তিনি কাব্যকে খণ্ডখণ্ড, বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকে এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা-কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে— পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়— তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্ক-বর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোনো চরিত্রের বিকাশ নহে; ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া— প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ

করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বর্গ ও মর্তের এই-যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারও চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্তের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই। তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান তাহা দুষ্যন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবনমত্ততার হাবভাবলীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না, এইজন্যই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্যন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজে মিলন হইয়া থাকে সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি সেই পরাভব-সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না। কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না— সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই; সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়-বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন

নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত, স্বভাবধর্মের অনুগতা, আবার অন্য দিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, সে একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন— তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ব বিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখদুঃখ মিলনবিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসাচক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত শকুন্তলার সে নির্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিক-ভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্ধিত; তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান-প্রদানে, হাস্যে পরিহাসে কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপই সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে।

কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তাহা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না তাহা নহে; কারণ, তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে. তবু অজ্ঞ নহে। কিন্ত তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে; দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্যে ক্ষমায় কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই; আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সহিত তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশবধাত্রী ভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরির সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই; তাহাকে শকুন্তলার

চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়-ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়। আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরও অনেক ব্যাপক। দুষ্মন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিত বেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুম-যৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তির দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন; শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল 'ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ', তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন—

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর!
কোথা হে মহারাজ,
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

এ কথা শকুন্তলা সম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন— কত কঠিন অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে— আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতর বাক্যে রক্ষণীয় শকুন্তলাও তেমনি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

মৃগের প্রতি এই করুণাবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহ-সেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কল-বসনে নহে, ভাবে ভঙ্গীতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্যন্ত বলিয়াছেন—

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন!

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখণ্ড, এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলই আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দুষ্যন্তকে দুই উদ্যত বাহুর দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না— এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটি ভাঙিয়ো না!

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল, 'ভো ভো তপস্বিগণ, তোমরা

তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।'

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন, এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন, 'ওগো সন্নিহিত তপোবনতরুগণ,—

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়!'

চেতন অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন!

শকুন্তলা কহিল, 'হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।'

প্রিয়ংবদা কহিল, 'তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর তাহা নহে, তোমার আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।'

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, 'তাত, এই-যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করিবে তখন সেই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।'

কণ্ব কহিলেন, 'আমি কখনও ভুলিব না।'

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, 'আরে, কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে!'

কণ্ব কহিলেন, 'বৎসে—

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছু যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।'

শকুন্তলা তাহাকে কহিল, 'ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস! প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।'

এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে— যেখানে মানুষ আপনার চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তররামচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেস্ট্ নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই; বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া, আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ব বিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের

মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতি-রাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কোনোমতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এই শূন্যপ্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন হত্যার চেষ্টা। পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু শেষ হইল এ কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্পত্তি সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ তো বাহ্য লাভ, তাহা বিষয়ীসম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে, কাব্যের তাহা চরম পরিণাম নহে।

টেম্পেস্ট্ নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে মানুষে বিরোধ— এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা এই-সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালী মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না, সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফল-নির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ— তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে— কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়। তাহা স্বভাব-নিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্ক ক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই; তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন, এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন

টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ করিয়াছেন এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখ-বেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়-রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপনমনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরি চুমি',
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি!

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণ্বের আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ বড়ো পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের, যে গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল 'এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি' রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ— আমরা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইঁহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, বড়ো নিপুণভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ।...যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি-দ্বারা এই কথাটি তাঁহাকে বলিবে।'

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে

তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর-এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম; সেখানকার যে নিয়ম এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া! সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ সুন্দর ভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল এখানে তাহার কী দশা হইবে তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল, এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শারঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম!' শারদ্বত কহিলেন, 'তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের, এবং বদ্ধকে দেখিয়া স্বাধীন পুরুষের যে ভাব মনে হয়, এই-সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।'— একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এইভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল করুণ গীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল তখন এই তপোবনের দুহিতা, বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো, বিস্ময়ে ত্রাসে বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে-একটি তপোবন লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই-সকল তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্যের যোগ, সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্মল জীবন! এই এক মুহূর্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সংগীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা! যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারি দিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত সে আজ কী একাকিনী! তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল; সে শকুন্তলা আর রহিল না। এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ-পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুর-ভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব; কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন; এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্যন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত

করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না, অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনও হয় নাই; তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন— এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন; বাহির হইতে তাহাকে ছাই-চাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসংকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে, পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত এবং স্বর্গ, যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধন-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই; সংসারে বিধাতার বিধানে

পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে, কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং সৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত। যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো; ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই; অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল; আলোডনের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল। বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর-কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ। শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ, জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা-কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আর-কোনো নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতা-প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া

উঠেন। প্রবৃত্তি যে কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা অতিশয়োক্তি-দ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্‌স্‌পীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্তগভীর, এমন সংযতসম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে; কালিদাস কোথাও রাশ আল্‌গা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত তিনি সেইখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্যন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষ্যে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনই আবার অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয় লজ্জা অভিমান অনুনয় ভর্ৎসনা বিলাপ সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে। যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল দুঃখের সময় দারুণ অপমান-কালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল! এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীরতপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর-কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্যন্তের অপরাধকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সেও কবির সংযম। দুষ্ট প্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্যন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল—

মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে— এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়। কালিদাস তখনই ধর্মারণ্যের, কাব্যকাননের, এই মূর্তিমান বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন; ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন; সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই। পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই। কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্য মূর্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা-নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন-কি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনও-বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলামাধুর্য অর্পণ করিয়াছে; কখনও-বা মঙ্গল-আশীর্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে; কখনও-বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়-বাক্যের করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মলতা, একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রশ্মি, নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলা-কাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ

টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে; তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার উপরে; শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্তকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

রচনা: ১৩০৯ বঙ্গাব্দ

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।

দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।

যে-সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদশাহদের সহিত নবাবদের, নবাবদের সহিত বিদেশী বণিকদের ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কী খেলা চলিতেছিল তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে-সকল বিবরণ যদি কোনো দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কী সম্বন্ধ ছিল তাহার বিবরণ বাংলাসাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই পর্যাপ্ত; তাহার অতিরিক্ত যাহা পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয় তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।

কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন-শা পরাগল-খাঁ ছুটি-খাঁ'র সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা, ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

যেমন ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে

ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাঁটিয়া যে-সকল কীটজর্জর দলিল পাওয়া যায় তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে; কারণ, তাহাকে তাহার যথাস্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারি পাশ হইতে, বিচ্যুত আকারে যখন দেখি তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড়ো বা অসত্যরূপে ছোটো করিয়া দেখিতে পারি।

বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষই বর্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল; তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্যয়ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক সেই সময়কার কথা সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

ইহা দেখিতেছি, বৈদিক কালের দেবতন্ত্রে মহাদেবের আধিপত্য নাই। তাহার পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসহীন নিস্তব্ধতা কাটিয়া গেলে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও বরুণ ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া গেছে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সর্বপ্রথমেই পূজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পরিবর্তনের মধ্যে নানা আকারে নিজের দাবি রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মহেশ্বর এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।

এই-সকল দেবদ্বন্দ্বের মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ভারতবর্ষের কটাহে আর্য অনার্য নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক-এক সময়ে এক-এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্য-

সূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের সমন্বয়-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর-তপস্যা-সহকারে ধূর্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন। এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী।

এক-এক সময়ে এক-এক দেবতা বড়ো হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্মুখ বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও এক সময়ে হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল তখন বৈদিক দেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই তাহা দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্যদেবতার সহিত এই ত্রিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে-সকল নিন্দা বসানো হইয়াছিল তখনকার আর্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূত-প্রেত-পিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতাকর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্যমণ্ডলীর যে বৈদিক যজ্ঞে প্রাচীন আর্যদেবতারা আহূত হইতেন সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল; সেই কারণে তাঁহার সেবকদের সহিত আর্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য ভূত-প্রেত-পিশাচের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক স্থাপিত হয়।

আর্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতাচারী দেবতা বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরেই আছে, একদা পার্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন?'

এ প্রশ্ন তখনকার আর্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। আমাদের আর্যদেবতারা স্বর্গবাসী ; তাঁহারা বিকৃতিহীন, সুন্দর, সম্পৎশালী। যে দেবতা স্বর্গবিহারী নহেন, ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্তহস্তীচর্ম যাঁহার সাজ, তাঁহার নিকট হইতে কোনো কৈফিয়ত না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, 'কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতিপুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি— সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।'

এই গল্পের দ্বারা এক দিকে ব্রহ্মার পূর্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জটির আর্য-রীতিবহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল। এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরমশান্ত যোগরত মঙ্গলমূর্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণচঞ্চল ভাবের আরোপ করা হইয়াছে এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্তনিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবল জাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য-উপাসকগণ-কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। আশা করি, তাহার অন্য ভাষা হইতে অনুবাদের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া নাই।

কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে এই শিবশক্তি, কখনো বা জড়িত হইয়া, কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া, ভারতবর্ষে আবর্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখন ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই-সকল পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন

ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিপুল ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিয়তই আমাদের ধর্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয় -চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্যগণ তাহাদের অনেক আচারব্যবহার-পূজাপদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজাল-দ্বারা আর্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।

এক কালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্যদের সহিত ব্রাহ্মণপ্রধান আর্যদের দেবদেবী ক্রিয়াকর্ম লইয়া এই-যে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারতবর্ষের মহেশ্বর তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন তিনি করালমূর্তি ধারণ করিয়া শিবকেও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং—

> তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
> কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোনো মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর। মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায় তাহা কখনোই আর্য-সমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি ; কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চন

ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই-সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। দীনেশবাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে ও প্রতিভায় এই সাহিত্যের স্তরগুলি যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া বঙ্গ-সমাজের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

তিনি যে ধর্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড়ো দুর্গতি। তাঁহার এতকালের প্রাধান্য 'মেয়ে দেবতা' কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায় এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতরসাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্তসমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এক সময়ে বেদ তাহার দেবতাগণকে লইয়া ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াছিল বটে; কিন্তু বেদান্ত এই স্থাণুকে ধ্যানের আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদিগকে আনন্দদান করিত না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদিগকে অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার হইতে দূরে রাখিতেন। ধন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই হউক, উচ্চপদ ও হীনপদের মধ্যেই হউক, বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই হউক, যেখানে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটে সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থক্যমাত্রই ঝড়ের কারণ।

আর্য-অনার্য যখন মেশে নাই তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার ভদ্র-অভদ্র-মণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল তখনো ঝড় উঠিয়াছে।

শংকরাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি

হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা, সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেখানে ভক্তির মাৎসর্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড়ো বলা ভক্তির মাৎসর্য, কিন্তু তাহা ভক্তি। শক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্‌বেল হইয়াছিল।

এইরূপ বিদ্রোহ-কালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোনো বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহা বাধাবিহীন লীলা। কখন কী করে, কেন কী রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ংকর।

নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়। নারী যেমন স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালোবাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্‌গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।

শিব আর্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা, যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজে তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চ-শ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনার আশায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।

কিন্তু কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম; তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না; প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য— ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পরিবর্তনপরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে-সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে-সকল চিহ্ন ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে-সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী বিষহরি ও শীতলার আক্রমণ-ব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাঁকেই উপরে উঠাইবেন ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞা-ভাজন, সেই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। ইহাই শক্তির লীলা।

তাহার পরে দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোনো সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে তাহার কোনো কারণ নাই; ব্যাধ যে ভক্ত ছিল এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে

ঝড়-জলপ্লাবন-ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি তাহার মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্যকারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের যে আবর্তন দেখিতে পাই তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির সুসংগতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্বিচারে পালন করিতেছে সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল; তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ'; সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।

এই-সকল কারণে যে-সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ-চিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোক বিপৎসম্পদের অতীত শান্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের-লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত: দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

কবিকঙ্কণে দেবী এই-যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্তে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোনো ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এক কালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর-নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? উড়িষ্যাই কলিঙ্গদেশ। বৌদ্ধধর্ম-লোপের পর উড়িষ্যায় শৈবধর্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল, ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গরাজত্বের প্রতি শৈবধর্মবিদ্বেষীদের আক্রোশপ্রকাশ, ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। 'আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা' ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক 'আমারই প্রতি বিশেষ দয়া' ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন 'সুখদুঃখ দুর্গতিসদ্‌গতি— ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না' সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।

কিন্তু তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন

পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্রকঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয় শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারির গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে— মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে— দরিদ্র বাঙালির ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্তিমান করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই-সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। ক্রমে ইহারা নষ্ট ও বিকৃত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। এক সময়ে 'ভারতী'তে 'গ্রাম্য সাহিত্য'[১] -নামক প্রবন্ধে আমি এই কাব্যগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম।

চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসাশীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটোখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপরের স্তরে উঠিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিল দীনেশবাবুর গ্রন্থে পাঠকেরা তাহার বিবরণ পাইবেন— এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু দীনেশবাবুর সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন। শংকরের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে।

শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর আমার কোনো দাবি নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই; তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্য-মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না; দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সংগীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর-কোনো সংগীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়া ছিল সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব

করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল; বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্যলাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-ধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে সেও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, কাহারও কোনো বাধা রহিল না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই-যে ভাবোচ্ছ্বাস ইহা স্থায়ী হইল না কেন। সমাজে ইহা বিকৃত ও সাহিত্য হইতে ইহা অন্তর্হিত হইল কেন? ইহার কারণ এই যে, ভাব-সৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি; কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে নায়িকা

কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এক দিকে দুর্গায় ও আর-এক দিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থাবন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ যখন পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগে নিজের অবস্থাবন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া

আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে তখনই সে হাতের কাছে যে তুচ্ছ ভাষা পায় তাহাকেই অপরূপ করিয়া তোলে, যে সামান্য উপকরণ পায় তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজাল ঘটাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যে কী হইতে পারে ও না পারে তাহা পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না, সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করিবামাত্র যে বল পাওয়া যায় তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

শ্রাবণ ১৩০৯

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত

সাহিত্যের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায়, ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান, শাখান্বিত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ -বহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো, তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে, শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না করে থাকতে পারি নে। মূক পশু-পাখিরও আছে অপরিণত ভাষা; তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি; এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগ-সীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবামাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা 'আমি আছি' এইমাত্র বলে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যুগে বিশেষ ভাবে অধিকার করে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল; তাতে সে আশু-উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল; তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দ-লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কি না জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্‌ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাক-সবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি-খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়— সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যাবসাদার গোলাপজলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপজলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘ-স্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্বদান পণ করে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শান্ত রসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গিতে তখনই তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে

জানিয়ে দিয়ে গেল এই জলযবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসি মাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, 'ওঃ! মস্ত মাছটা।' মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্যে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল, চার দিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল সরে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে —এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্ম-সম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে ; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরন্ধ্র প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য যার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে— তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল ; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহেতুক চাওয়ায় মানুষ যাতে মুক্ত হয়

একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্য-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্‌, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাক্‌, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে— তখন ধীরে ধীরে বনপ্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বাঙ্গে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক ; এমন-কি, জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র ; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার অ্যাসোসিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নয়। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে— নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না ; সে দেখলে, যে জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে। সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়— তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের

প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায় ; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা করে তোলে ; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয় ; হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না, ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকার পায়ে ছোট্ট লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল—

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে ভাষা কিছু-বা বলে কিছু-বা গোপন করে ; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়'। দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস করে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়'। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায়— এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন একে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো-এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি, ইংরেজি তর্জমার থেকে : আপেল-গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরু ঝুরু বইছে শরতের হাওয়া। থর্ থর্ করে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম

আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো।— এই-যে কম্পমান ডাল-পালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন করে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে ;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই ;
বালি ধূ ধূ করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার-বন ;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার ;
গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা করে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী করে। নদীপর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে, কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিস তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ, যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি ; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তুলতে পারে। এ লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে,

যে মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন করে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি— সেইজন্যে 'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে'। মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন করে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ-ভাবে; আমাদের সঙ্গে তাদের যে ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এইজন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আপনভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে সম্পর্ক ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানব-ভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারি নে। নিত্য ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিস-কেস-রূপেই আমাদের চোখে পড়ে— ঘৃণার সঙ্গে, ধিক্কারের সঙ্গে, প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববনদাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে সুস্পষ্ট করে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু এই ঘটনাটি তার পূর্ববর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখা-বর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে

অধিকার করে হয়তো রয়েছে— আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই— এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো করে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন, সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোন্‌গুলি সার্থক, কোন্‌গুলি নিরর্থক তা আমরা বাছাই করে নিতে পারি নে। এইজন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র করে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই-বা দেখতে পেয়েছে ; কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি অনেক ঊনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে ; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না ; এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি-বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমান কালেই আমাদের দেশে চার দিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশু-বিলীয়মান মর্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি ; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য, সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিসের যষ্টি, সমস্ত হবে গৌণ ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটোবড়ো দ্বন্দ্ব-বিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ করে নিত্যকালের মানবমনে বিরাট মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার

করে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হল তথ্য- সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; এর কোনোটা সুখের, কোনোটা দুঃখের; এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্যদানব, বস্তুত তারা মানুষ; ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎরূপে দেখা দেয়, শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা, তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না। মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে; তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল, রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম, সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্য মানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে; আমাদের পাঁচমিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহুলোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে।

সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ-চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত তার সৃষ্টি; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা একই জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণী-বিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে বহু মানুষ, আর সেইসঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদি বা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিস্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না। এই সৃষ্টিতে যে মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হত তা হলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত; সে বাস্তব যদি হত তবু সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি সুন্দর তা সহজ— তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো-একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত করে তুলতে হবে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে

গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে; সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে বিশ্বে জন্মেছে তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে; আকাশের আলো যেখানে অগোচর, সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে; প্রকৃতি আপনি যে ফলমূল ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি। সে নিজের সুবিধা ও রুচি -অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি, তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী করে তুলছে— সেজন্যে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে, পৃথিবীর সর্বত্র, মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে। সেগুলিকে আপন পথে, আপন মতে চালনা ক'রে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষের নগর-পল্লী, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, হাট-ঘাট, যাতায়াতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে; এমনি ক'রে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এক দিকে তার জয়স্তম্ভ, আর-এক দিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেইদিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চারি দিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার, দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলো-ছায়ার কোলাকুলি, সেইসঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন— পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝরঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক, বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনও তারই মাঝে মাঝে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহু প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপফুল অসামান্য, সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে-আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্‌দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ করে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে-পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি করে বিরক্ত করছে, এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, এ'কে যদি তথ্য-মাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্ব-গৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

বস্তুত আর্টিস্ট্‌রা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না, তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে; বিধাতার হাতের পাস্‌পোর্ট্‌ নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট্‌ অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তু-জগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত

একটি ব্যবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয়, এর মূল্য আত্মীয়তা-সাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে, সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ্‌ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।

কল্পনা করা যাক, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে। এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে। তারই উত্তরে জ্যোতিরাত্মক অণুপরমাণুর সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত। অর্থাৎ এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্তি যেন মানুষের গৌরব করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়— মুনফা করবার লোভ আছে, শস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত বিকৃতরুচি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে। তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে; তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুরদৃশ্য বস্তিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে; যেমন-তেমন কদর্য ভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি, তেলকল, নোংরা দোকান, গলিঘুঁজি

চোখের ও মনের পীড়া বিস্তার-পূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না, শহরের সত্য তার কদর্য বিকৃতিগুলো। কেননা শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ, সে যোগ স্থায়ী যোগ, সে যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে-সেখানে ; কিন্তু তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক ; চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে, কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো, তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

রচনা : শ্রাবণ ১৩৩১

আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়— জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে— কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ-সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া, সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্র সাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনও বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণবাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এ দিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণি-জড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে-মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর-একজন গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির

তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে; ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্‌কা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণীপথে বিচরণ করে তাহা রঙবেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাত জোড় মেলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো— ৩৬০পর্যন্ত বেশ মেলে, কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচটি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেইটাকে নাড়া দিয়া তাহার যতরকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে, সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না; সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়, সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল ঋতুতেই, কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এইজন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণতিরূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত, কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহণীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এইজন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে

মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল— বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা; ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা, একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না; গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই; কেননা, শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠ-ঘাটে বেনামী করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষাঋতুটা মানুষের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো দিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল ফসল নির্ভর করে, কিন্তু সে তেমন ধনী নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে-ঘাটে পত্রে-পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনাপাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্‌বৃত্ত।

এইজন্য বর্ষাঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই, ফলেও অধিকার নাই; তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে— কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষাঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এইজন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দানশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়বধূর পর্দা থাকে না। বাদ্‌লার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিণীর

পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে।

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্ট্‌মেন্ট্‌ আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্‌ ডিপার্ট্‌মেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র -পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না; এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত-যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই! আমাদের শক্তির পক্ষে এ-সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এইজন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়, বুদ্ধিবিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায়, তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা আনা পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষাঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্যে, তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি— কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্‌ ঋতু যে নিতান্ত বিনা কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে

চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার; আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন। তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠ ঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না, যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ুমণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারী, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞলোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে। পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে, যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারি দিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানা রঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে। সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়, তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে, কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাতবেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেইজন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত, সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি, তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিতপ্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই-সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশবিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ; এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গীতে হিল্লোলিত হয়।

এই-সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না, কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এইজন্য অর্থে তাহার সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য, একাগ্র হইয়া লাভ করা; নৃত্যের লক্ষ্য, বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারি দিকে অবকাশ চাই। এইজন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি, কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে, অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই, সেইখানেই ছন্দের প্রাণ— পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে pause— কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে— কারণ, যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র; আমি নিশ্চয় জানি, সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের

অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য; বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে, বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তুবাদীরা মনে করে, অবকাশটা নিশ্চল ; কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে, বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই, তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে, 'আমরাই যুদ্ধ করিতেছি।' কিন্তু যে সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগযুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই-সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত লোকেরা 'আষাঢ়ে' বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণমঞ্জীরমুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পশরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি, যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্ত-মণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক— আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত খ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চিরবিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল,

আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে— জাতীপুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল— কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

রচনা : ১৩২১ বঙ্গাব্দ

নূতন ও পুরাতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগ-পূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর-সকলে কার্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি; আমরা আমাদের পূরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পেন্সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বহু কালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নূতন রাজার রাজস্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে! হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যেরকম খেটে মরছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে।

অতএব চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো; ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাকলে আর চলবে না; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো, পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নবমানব রাজার রাজস্ব দাও; কালেজে পড়ো, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাকরি করো।

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে! আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসে ছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসে ছিলুম। এমন সময় কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে! পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে!

মনে করো, আমাদের চতুর্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরো দুর্গম হত

তা হলে এক দল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে স্থির শান্ত ভাবে এক প্রকার সংকীর্ণ পরিপূর্ণতা -লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা বড়ো একটা জানতে পেত না এবং ভূগোলবিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাকত; কেবল তাদের কাব্য, তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের ধর্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব, অপূর্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পেত; তারা যেন পৃথিবী-ছাড়া আর-একটি ছোটো গ্রহের মধ্যে বাস করত; তাদের ইতিহাস, তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান সুখসম্পদ তাদের মধ্যেই পর্যাপ্ত থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়, সে কেবল নিস্তরঙ্গভাবে প্রভাত-সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান প্রবাহে, পরিবর্তনকোলাহলের কেন্দ্রস্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রণরঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে, খুব একটা শক্ত রকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে, কিন্তু নির্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে যে কোনো রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে বলব?

এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতার অবসর কোনো জাতিই পায় নি; মনে হয়, কেবল ভারতবর্ষই এক কালে দৈবক্রমে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছিল এবং অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করেছিল। জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম, যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে কোনো নূতন সত্য এবং কোনো নূতন আনন্দ লাভ করেন নি তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল; তার মধ্যে এক অপরূপ মানসিক সভ্যতার গোপন পরীক্ষা চলছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আল্কেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্র-যোগে চিরজীবনরস (Elixir of Life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা-সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন-লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তার থেকে কী হতে পারত কে জানে! আল্কেমি থেকে যেমন কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয়েছে তেমনি তাঁদের সেই তপস্যা থেকে মানবের কী এক নিগূঢ় নূতন শক্তির আবিষ্কার হতে পারত তা এখন কে বলতে পারে!

কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের কাছে অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। এখনকার নবীন দুরন্ত সভ্যতার মধ্যে এই পরীক্ষার তেমন প্রশান্ত অবসর আর কখনো পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে? একটি জীর্ণ তপস্বী; বসন নেই, ভূষণ নেই, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। সে যে কথা বলতে চায় এখনো তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তগম্য পরিণাম নেই।

অতএব হে বৃদ্ধ, হে চিন্তাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো; পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো; অথবা দিবাশয্যায় পড়ে পড়ে আপনার পুরাতন যৌবন-কালের প্রতাপ-ঘোষণাপূর্বক জীর্ণ অস্থি আস্ফালন করো, দেখো তাতে তোমার লজ্জা নিবারণ হয় কি না।

কিন্তু আমার ওতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র খবরের কাগজের পাল উড়িয়ে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে যাত্রা আরম্ভ করতে আমার সাহস হয় না। যখন মৃদু মৃদু অনুকূল বাতাস দেয় তখন এই কাগজের পাল গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কখন সমুদ্র থেকে ঝড় আসবে এবং দুর্বল দম্ভ শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমন যদি হত, নিকটে কোথাও উন্নতি-নামক একটি পাকা বন্দর আছে, সেইখানে কোনোমতে পৌঁছলেই তার পরে দধি এবং পিষ্টক, দীয়তাং এবং ভুজ্যতাং, তা হলেও বরং এক বার সময় বুঝে আকাশের ভাবগতিক দেখে অত্যন্ত চতুরতা-সহকারে পার হবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই, ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল, তখন কি বসে বসে কেবল ফুলস্ক্যাপ কাগজের নৌকা নির্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়?

অথচ তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে—চতুর্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম—তখন আমারও মন নেচে ওঠে; তখন ইচ্ছা করে, বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন করে একেবারে বাহির হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই রিক্ত হস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়! হৃদয়ে সে অসীম আশা, জীবনে সে অশ্রান্ত বল, বিশ্বাসের সে অপ্রতিহত প্রভাব

কোথায়! তবে তো পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাসই ভালো, এই ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।

তখন বসে বসে মনকে এই বলে বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারি নে, কিন্তু ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে পারি। দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কী! নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, টাইম্‌সের জগৎ-প্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল।

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, প্রবলের অত্যাচার আছে, অসহায়ের ভাগ্যে অপমান আছে— কোণে বসে কেবল গৃহকর্ম এবং আতিথ্য করে তার কী প্রতিকার করবে?

হায়, সেই তো ভারতবর্ষের দুঃসহ দুঃখ। আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব? রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে? যিশুখৃস্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্বর কাঠিন্যকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে? প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা ক'রে? দরখাস্ত ক'রে? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে, কাল একটা তাড়া খেয়ে? তা কখনোই হবে না।

তবে প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কত কারণে প্রবল, যখন এই দুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি, তখন কি আর আশা হয়? তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি এবং ভালো করি। পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি, ভাণ না করি। অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ ভাণকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃত অবস্থাটা কী তাই আমি দেখতে চেষ্টা করছি। তা দেখতে গেলে-যে পুরাতন বেদ পুরাণ সংহিতা খুলে বসে নিজের মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করে একটা কাল্পনিক কাল রচনা করতে হবে তা নয়, কিম্বা অন্য জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাযোগে আপনাদের বিলীন করে দিয়ে আমাদের নবশিক্ষার ক্ষীণ ভিত্তির উপর প্রকাণ্ড দুরাশার দুর্গ নির্মাণ করতে হবে তাও নয়; দেখতে হবে এখন আমরা কোথায় আছি। আমরা যেখানে অবস্থান করছি এখানে পূর্ব দিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিম দিক থেকে ভবিষ্যতের

মরীচিকা এসে পড়েছে, সে দুটোকেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সত্য-স্বরূপে জ্ঞান না করে এক বার দেখা যাক আমরা যথার্থ কোন্ মৃত্তিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি; এত প্রাচীন যে এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে; মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; সেইজন্যে ভ্রম হচ্ছে যেন এ নগর মানব-ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্নরেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদ্বর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটাভারগ্রস্ত শাখা প্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাই-বোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারে ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম। জগতের মধ্যাহ্ন-সূর্যালোক ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কেবল ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখা-সংকটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্মরের মতো মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে; অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে। এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেহ অলস ভক্তিভরে হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থ-বিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার

ভগ্ন ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহ-দানবদের কারাগার নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! এই নিশ্চেষ্ট নিবিড় মহা নগরারণ্য ভেঙে গেলে সহস্র মৃত বৎসরের যে-একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে!

এরা বহু দিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিক চিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারো সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতি প্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তুভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থাবৈসাদৃশ্য, অনেক নূতন সুবিধা-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধাকে এবং অসুবিধাকে প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিত ভাবে স্বহস্তে নূতনগৃহ-নির্মাণ বা পুরাতনগৃহ-সংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রুপক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে; কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে, আমরা ধুতিটি চাদরটি প'রে অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে বিচরণ করি; আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই; ছায়ায় বসে তাস পাশা খেলি; যা-কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি; যা-কিছু কার্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক্ দূর হয় না; এবং এরই উপর কোনো ছেলে যদি সিকিমাত্রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তা হলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি : সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্!

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই-তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বলছ, 'ওঠো ওঠো; তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমচ্ছিলে বলে যে সমস্ত সংসার ঘুমচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজছে, এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্মের সময়।'

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে 'কোথায় কর্ম'

'কোথায় কর্ম' করে গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওরই মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায় স্ফীতস্বভাবের লোক, তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে, 'কে হে! কর্মের কথা কে বলে! তা, আমরা কি কর্মের লোক নই বলতে চাও! ভারী ভ্রম! ভারতবর্ষ ছাড়া কর্মস্থান কোথাও নেই। দেখো-না কেন, মানব ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্যবর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে। অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্মের লোক। অতএব আমাদের আর কর্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ করো— তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির স্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অমনি আর-একবার ঘুমিয়ে নিই।'

এই রকম করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক ভাবে, ঈষৎ-উন্মীলিত নিদ্রাকষায়িত নেত্রে, আলস্যবিজড়িত অস্পষ্ট রুষ্ট হুংকারে, জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে। এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি-সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে, সেই হতভাগ্যেরা বারম্বার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে—

'হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তো তার শেষ হয় নি, এখনো তো তার সমস্ত সত্যমিথ্যা স্থির হয় নি, মানব-অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার তো কোনোটারই মীমাংসা হয় নি।

'তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুবসত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ? তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জানো তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

'আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্য-

সকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট -সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি ; যথাসম্ভব লোক যথাসম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না, এবং জীবনঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

'ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন এক দিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে, এমন সহজে, এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে? আমাদের মতো এমন কোমল, এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি? উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেই রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি? না, কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যে রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেই রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাত-সমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

'যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ— অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও, আমাদের গৃহে আমরা থাকি, এই কথাই ভালো।'

কিন্তু মানুষে থাকতে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করছে।

তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এই রকম নিয়ম

অতএব, আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারো কিছু বলবার নেই। তবে সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এই রকম ভাবে করি যে, পূর্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণত খাটে বটে, কিন্তু আমরা ওরই মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে অনেক দিন খাটে নি। যেমন মোটের উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাকবার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি-অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে, কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে। অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে দীর্ঘ জীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমরা বহু যত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্যোগ করেছিলুম।

মনে হয় যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্বাসিত করে এমন একটা মধ্য-আকাশে তুলে রাখা গিয়েছিল যেখানে পৃথিবীর ধুলো বড়ো পৌঁছত না, সর্বদাই সে নির্লিপ্ত নির্মল নিরাপদ থাকত।

কিন্তু একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কিছু কাল হল নিকটবর্তী কোন্ এক অরণ্য থেকে এক দীর্ঘজীবী যোগমগ্ন যোগীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। এখানে বহু উপদ্রবে তার সমাধি ভঙ্গ করাতে তার মৃত্যু হয়। আমাদের জাতীয় যোগনিদ্রাও তেমনি বাহিরের লোক বহু উপদ্রবে ভেঙে দিয়েছে। এখন অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার আর কোনো প্রভেদ নেই, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, বহু দিন বহির্বিষয়ে নিরুদ্যম থেকে জীবনচেষ্টায় সে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। যোগের মধ্যে থেকে একেবারে গোলযোগের মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু কী করা যাবে! এখন উপস্থিতমত সাধারণ নিয়মে প্রচলিত প্রথায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘ জটা ও নখ কেটে ফেলে নিয়মিত স্নানাহার-পূর্বক কথঞ্চিৎ বেশভূষা করে হস্তপদচালনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এই রকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি

বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারি নি। এখনো আমরা বলি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহারবিহার চালচলনের এত সমাদর কেন? এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার-পূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাত -পূর্বক বায়ু সেবন করি।

এটা আমাদের স্মরণ নেই যে, যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।

তোমার আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে, হবিষ্যও খাই নে, জুতো মোজা পরে ট্র্যামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই— যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না, এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম জরৎকারু বৈশম্পায়ন কিম্বা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন— ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ পর্যন্ত কারো ভ্রম হয় নি— এক দিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিম্বা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে— তাদের পক্ষে ঐ রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্যোগপরায়ণ মানুজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সিট্‌কার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত অসংগত হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি প'রে, মাটি মেখে, ছাতি ফুলিয়ে চলে বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা-বাহবা করে; তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা এবং এণ্ট্রেন্স্ পর্যন্ত পড়ে আজ পাঁচ বৎসর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস, সেও যদি লেংটি পরে, ধুলো মাখে এবং উঠতে বসতে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমার বাবা পালোয়ান', তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক আত্মীয়-বন্ধুরা তার জন্য সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব হয় সত্যই তপস্যা করো নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্যভার ছিল। সেই কার্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্য তাঁরা আপনাদের চারি দিকে কতকগুলি আচরণ-অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল

কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধা মাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাকতে পারেন না এবং ভূতপূর্ব অ্যাটর্নির আপিসে যদি বিশেষ কারণ-বশত ময়রার দোকান খুলতে হয় তা হলে কি চৌকিটেবিল কাগজপত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে ?

বর্তমানকালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ধর্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত নন। তাঁরা অধিকাংশই চাকরি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখি নে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনো কার্যবৈষম্য দেখা যায় না, এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকার কোনো সুবিধা কিম্বা সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কিন্তু সম্প্রতি এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম যে কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোনো কালেই দৃঢ় ছিল না তাঁরাও, কোনো এক অবসরে পূর্বোক্ত গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন ; এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাদের উপর থেকে আচারবিচার মন্ত্রতন্ত্রের সহস্র বন্ধনপাশ প্রত্যাহরণ করে নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতাতন্তুজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করছেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করছেন। পূর্বে যেসকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

অতএব বোঝা উচিত, এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে, সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-বিচার নিয়ে খুঁৎখুঁৎ ক'রে, বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধ'রে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না— যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, পবিত্র ব্যক্তির কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করে মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়ে-

মেজে ঢেকে-ঢুকে অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে আমরা যেরকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে— এই রকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্যা হয়ে আসে।

জড় পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবার জন্য নির্মল স্ফটিক-আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, আমরা যে একটি আশ্চর্য আর্য পবিত্রতা লাভ করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা অতি যত্নে রক্ষা করবার যোগ্য; সেইজন্যই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে থাকি।

এ সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। প্রথমত, আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্যায় বিচার, অমূলক অহংকার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয়-মানব-ঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি? আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে, বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানবঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না এবং কোনো একটি জাতির আপামরসাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কি না তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর-একটি কথা, জড় পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কলঙ্কিত হয়। শখের পোশাকটি প'রে যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। পাছে ধুলো লাগে, জল লাগে, কোনো রকম দাগ লাগে, অনেক সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোশাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় পাছে এর ছোঁয়া লাগলে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগলে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোশাকি পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কী বিষম বিপদ! জনসমাজের রণক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ পরিপাটি পবিত্রতাকে সামলে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ করে আনে, আপনাকে কাপড়টা-চোপড়টার মতো সর্বদা সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখে, মনুষ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই তারা দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা না করলে চলে না। অত্যন্ত রূপ-প্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধুলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং ননীর পুতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে; ভুলে যায় যে, বর্ণসৌকুমার্য সৌন্দর্যের একটি বাহ্য উপাদান, কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি— জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক, সুতরাং তাকে ঢেকে রাখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত জ্ঞান না কর তবে কিয়ৎপরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে, তার বল-উপার্জনের উদ্দেশে, তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বোঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখ-প্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্য-পবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোওয়াটি বসাটির ইদিক-ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকল প্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্য-নাশক।

সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দুইই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন ক'রে, আহার কমিয়ে দিয়ে, দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখানো হয়, তা হলে এক দল চলৎশক্তিরহিত অতি নিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়; জীবস্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়; দেখে বোধ হয়, ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে-সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন, সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয় এবং দুরন্ত ছেলে কখনো কাঁদে, কখনো ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট— অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তাকে যদি মৃতপ্রায় করে রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য করা যেতে পারে।

সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে। যদি আমরা বলি আমরা এতটা পেরে উঠব না, আমাদের এত উদ্যম নেই, শক্তি নেই, যদি আমাদের পিতামাতারা বলে 'পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন-কি অসম্ভব বললেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত আছি', যদি

আমাদের ছাত্রবৃন্দ বলে 'সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীরমনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানিরও সেই বিধান, আমরা চাই নে উন্নতি, চাই নে ঝঞ্ঝাট, আমাদের এই রকম ভাবেই বেশ চলে যাবে'— তবে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বলতেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা বলে অনুভব করাও ভালো কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করলে সদ্গতির পথ একেবারে আটেঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা-দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্তদেশে আমরা সেই ভারতসভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই, এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি— কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি, আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল, আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা বসে বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন, তাঁকে একেবারে কর্মাতীত অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা— সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়ব-সাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি, আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল, তাতে ক্ষিত্যপ্তেজের সংস্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের

সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত-অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার-মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শক্ররক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল, মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত -দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্য জাতি; আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব— সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ক'রে, ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যশ্রেণী-ভুক্ত ক'রে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দু নামের সার্থকতাসাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস-অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় ক'রে উন্নত মস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগ-সহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি, তা হলে আমরা যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিঁকবে কি না বলতে পারি নে কিন্তু প্রাচীন কালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্যসাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্ছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি আদানপ্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্তবর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবের স্বাভাবিক

বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই বলে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহু যুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিতভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তম্ভ নির্মাণ করছি। কারণ, নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা-দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ড সংগ্রহ করে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করছি তাও নয়। ইংরাজের রানীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনছি। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু করছি কী! আগুন নেই, কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ দিকের কেন্দ্রস্থলে; সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতু স্থাপন করে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে; এক দিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

১২৯৮ বৈশা

বর্ত্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার— প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা; যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল বল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এই ভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ্‌ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি— সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয় মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

'একান্ত স্বজাতিবাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির— প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া— এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেন তেন প্রকারেণ

উদরপূর্ত্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্ম্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী শাসনযন্ত্র, অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্ব্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণ-নির্দ্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্তজাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্য্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয় ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য! বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্ম্মনেতা সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতিবিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্ম্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে

অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহু কল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা, সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত-য়াহুদীবংশ-সম্ভূত হইয়াও খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পৌল (St. Paul), কেশরী (Caeser) সম্রাটের সমক্ষে আপনার অপরাধ-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ কৃষ্ণবর্ণ বা "নেটিভ" অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের "জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি" পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্য্যাবর্ত্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা "মরাঠা" জাতির যে সকল স্তব স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজ জাতির "গৌরব" সদা জাগরূক রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরূক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে সর্ব্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজে থাকিবে, এমন ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জ্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও, অর্থহীন "গৌরব" রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। এক দিকে,

প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা ; অপর দিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্ব শরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা, ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। এক দিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে ; অপর দিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদীস্বরে, পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। এক দিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপর দিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্যে উদ্দেশ্য— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা— অর্থকরী বিদ্যা, উপায়— রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য— মুক্তি, ভাষা— বেদ, উপায়— ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে— বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে—

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

এক দিকে, নব্যভারতভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নীনির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব ; অপর দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন-দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

এক দিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্যভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব ; অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ-দ্বারা পরের ভাব আপনার হয়

না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

এক দিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপর দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আছে,— কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে, সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল-মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্ত্য পুরুষ আমাদের বেশ ভূষা অশন বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্ত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,— মূর্ত্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্ত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্ত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য— ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্ত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই, আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্যকর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান লেখকের পাশ্চাত্ত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও ভারত-সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্ত্য সমাজে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রীপুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্ত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্ব্বলজাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়াড্, পোর্ত্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটু লাগে, দুর্ব্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী-বেশভূষা-মণ্ডিত দেখি তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের— নিজের ব্যক্তিগত সুখের— জন্য নহে; ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না— নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার

ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

রচনা: খ্রী. ১৮৯৯

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সৌন্দর্য্য-বোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য-উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্য্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেননা, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি-কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সুখ-দুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদসরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করি; এবং যাহার সৌন্দর্য্যপিপাসা একেবারে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌছিতে এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দ্দেশ করিতে পারি। নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্‌বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্ত্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস্ করিতে প্রস্তুত নহি। বারুণীপুষ্করিণীতীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া বৃদ্ধ গৃহস্থ কৃষ্ণকান্তের সংসারে যে নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে মনুষ্য-সংসারে অসাধারণ ঘটনা, তাহা সহজে বিশ্বাস করিব না। অতএব সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; অতএব সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য্য চায় ও সৌন্দর্য্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকী অংশ অসুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা কুৎসিত, কেননা, বাকীটা সুন্দর। খানিকটা সুন্দর,

কেননা, বাকীটা কুৎসিত; অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সাহচর্য্যে, তাহার সহিত তুলনায়, তাহা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকীটা সুন্দর হইত না, অথবা সমস্তই সুন্দর হইলে সৌন্দর্য্য শব্দ নিরর্থক হইত। অতএব সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোন্‌টা সুন্দর, আর কোন্‌টাই বা কুৎসিত, এটাই বা সুন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে, মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, অথবা তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? মনুষ্যের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশ্যে? কিসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতই কি জগতের দুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবের পক্ষেও সেইরূপ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে।

স্থূল-সূক্ষ্ম হিসাবে সমুদায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যায়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য শব্দটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মনুষ্যের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখের অনুভব করে— সুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এই রকম একটা অনুভব যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়— তাহাই সুন্দর। আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ ঘৃণা ক্লেশ বা তাদৃশ কোনরূপ অনুভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সুন্দরের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্য্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ, ও মধুর দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্যমাত্রই তাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থূলের মধ্যে ফেলা

যায়। সুখাদ্য-ভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মনুষ্যেতর জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী; ইহা জীবন মাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন মাত্রেরই, নিত্যভোগ্য। ইহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড় জগৎ হইতে কতকগুলা মালমশলা বাছিয়া গ্রহণ করিতে হয়; কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতির পুষ্টির ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল। এই জন্য কতকগুলা আমরা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দূরে পরিহার করি; নতুবা জীবন চলিত না।

অতএব মিষ্ট রস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণকালেই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণীতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভাল লাগে; এই জন্য মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের এই সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্য্যভোগের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধ্যেও সকলে সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে, তাহা বলা চলে না। এই সূক্ষ্মসৌন্দর্য্য-উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবি-নামক মনুষ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি-নামক মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরাজীতে যাহাকে আর্ট বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে ললিতকলা বলা যাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। মানব-মনের যে যে ভাগের সহিত ইহার কারবার, তাহার ইংরেজী নাম ঈস্‌থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বৃত্তিটা কিরূপে ও কি উদ্দেশ্যে জন্মিল, ভাল বুঝা যায় না। এই সৌন্দর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য্য কিসের ধর্ম্ম? ইহা কি বস্তুবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা স্থষ্টিকল্পনা বা কারিগরি? অর্থাৎ, যাহাকে আমরা সুন্দর বলি তাহার প্রকৃতিগত কোন বিশিষ্টতা নাই, আমরা তাহাতে সৌন্দর্য্য আরোপ করি মাত্র? বস্তুতঃ এমন দেখা যায়, শ্যাম যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয়ত তাহা কুৎসিত। বপ্রক্রীড়ারত মদশ্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচক-ধ্বনি-শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, সকলেই তাহার উপভোগে সমর্থ হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আবার সৌন্দর্য্যবিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার লোলুপদৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; এবং তাঁহার মানস-লোচন জলদময়ী তিরস্করণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা অংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতা কিম্পুরুষাঙ্গনার নগ্ন দেহের দিকে বিবর্ত্তিত হইত। আবার বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন স্বজন -কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত জরাক্রান্ত অসহায় রাজা লীয়র'কে আঁধারে প্রান্তরমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎরূপী পেষণযন্ত্রের আবর্ত্তনপ্রণালীর উদ্দেশ্যের ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের যাহা সৌন্দর্য্য, তাহা যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ করিবেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। তুমি যদি কুৎসিত দেখ, কাহারও সাধ্য নহে যে, প্রতিপন্ন করিতে পারেন উহা সুন্দর। যে কবির কাব্য আমার ভাল লাগে না, তোমার ভাল লাগে, তুমি লাঠি মারিলেও আমার তাহা ভাল লাগিবে না। আমার নিকট উহা যে অর্থে সুন্দর, তোমার নিকট ঠিক সেই অর্থেই উহা কুৎসিত। এ বিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিবার কোন আইন নাই। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, যাহারা সুস্থ-প্রকৃতি মানুষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই,—কি গুণে ইহারা সুন্দর; ইহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের লাভ কি?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস খুলিলেই বিশ রকম সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের পঞ্চাশ পাতা বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তির ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারুইনও এখানে বড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূলসূত্র একটা মাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন না কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতি-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু নাই। কেননা, সংসারযাত্রায় কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। মলয়ানিলে অনুরাগ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জীবন-বর্দ্ধনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোকিল-কূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কি বা শীতে, কি বসন্তে, কোন কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না।

ডারুইন বলেন, ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষার পক্ষে ততই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রু-সংখ্যা অনেক; এই সকল শত্রুর সৌন্দর্য্যবৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্যকে একেবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালায়িত; এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখসমরে দাঁড়ানও দুর্ব্বল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, শত্রুকে ফাঁকি দিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল একদিকে যেমন বিচিত্রবর্ণ সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনই অন্যদিকে বিচিত্রবর্ণ ও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের রূপে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনই রূপমুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং জাতির সৌন্দর্য্যবুদ্ধির এতটা-তীক্ষ্ণতা-স্বীকার বড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি একঘেয়ে ফিকে রঙের চেয়ে রঙের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়,

তা সে রঙ সার জন্ লবকের কাচেই থাক, আর কেরোসিন-দীপের শিখাতেই থাক ; এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়। অপিচ রঙদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরি দিতে পারি। ডারুইন-মতে পুষ্প-দেহে আর প্রজাপতি-দেহে বর্ণবৈচিত্র্য-বিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার অধিকও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, মানুষের ইহাতে লাভ কি, এ কথার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

আর একটা কথা আছে— যৌন-নির্ব্বাচন। ডারুইন এই মতেরও প্রবর্ত্তক। সিংহের কেশর, পাখীর কাকলি, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর ; এবং ডারুইনের মতে এ সমস্তই যৌন-নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত। স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয় ; কাজেই সুন্দর পুরুষেরই বংশরক্ষা ঘটে ; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীল কণ্ঠ আনম্র উন্নম্র করিয়া, চারু পুচ্ছ নর্ত্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌন-নির্ব্বাচন মানিয়া লইলে জীবদেহে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অনেক স্থলে বুঝা যায়। কিন্তু যৌন-নির্ব্বাচন সকলে মানিতে চাহেন না ; ওয়ালাস সাহেবই যৌন-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। কাজেই ডারুইনের মত এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূল কথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে ; কিন্তু মানুষের তাহাতে কি আসে যায় ? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন ? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, মানুষের তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে ?

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এইরূপে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ। সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরায় চৈতন্য ফুটিত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য, বিচিত্রতা বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকশিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের চৈতন্য যে অস্তিত্বযুক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, মানুষের অনুভূতিগুলা একরকম নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নূতন-নূতন শব্দ, নূতন নূতন স্পর্শ, নূতন নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে ; তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত এক

টানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অনুভব-বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক্ বিকশিত ; সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্ত্তিমান্। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কল্যাণ ; নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। আপনার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনী হইতে হঠাৎ সরাইলে জীব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। পরিবর্ত্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে না। কাজেই সৌন্দর্য্যের এক হেতু অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার ও আতিশয্যের অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় ; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে ; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন যুবতীর আরক্ত গণ্ডদেশ ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ, যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্য্যের আর একটি হেতু সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভাল লাগে, তাহা সুন্দর ; আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে, অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখ ও আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। কতকগুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখ ও তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর। দয়া মমতা স্নেহ প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেই জন্য যে সকল পদার্থ দয়া মমতা প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক, তাহারা অতি সুন্দর। গান গাইয়া সুখ হইতে পারে ; পরকে শোনাইয়া বুঝি আরও সুখ। কবিতা কবির হৃদয় হইতে উথলিয়া জনসঙ্ঘের মুখে ছুটিয়া চলে।

আর বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে—যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহকে স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে, তাহা সুন্দর ; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর ; আর যাহাতে অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া

মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজ-জীবনকে অগ্রসর করে, তাহা আরও সুন্দর। এই হিসাবে জীবন-রক্ষার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজ-জীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন উভয়ের বর্দ্ধনেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হাত আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধির জনক ও বিকাশক বলিতে আপত্তি ঘটে না।

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। যখনই মনে করা যায়, সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক বা জীবনবর্দ্ধক, সে জীবন ব্যক্তির জীবনই হউক আর সমাজের জীবনই হউক, তখনই নিতান্ত ইউটিলিটির বা ক্ষতি-লাভ-গণনার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং সৌন্দর্য্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্য্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তি মাত্র, সুখ মাত্র; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি-চিন্তা, ক্ষতিলাভ-চিন্তা, ভবিষ্যৎচিন্তা, জীবন-মরণ-চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্ম্মল উদ্দেশ্যহীন আনন্দের উৎপাদক বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অন্যরূপ প্রাকৃতিক কারণে কিরূপে এই অনাবশ্যক আনন্দ-ভোগ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল, তাহা সমস্যাই থাকিয়া যায়। সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি একভাবে আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,— অকরুণা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশ-বিবর্জ্জিতা; আবার প্রকৃতি অন্যভাবে আমাকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা। কেন এমন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইহা সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি; প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই আমার জ্ঞানবিকাশ বুদ্ধিবিকাশ ধর্ম্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি, অর্থাৎ প্রকৃতি-হস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাঘাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবন-সমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই। শঙ্কার হেতু যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহার এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিন

বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখ-যুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্র-বল শশকের ন্যায়, শত্রু হইতে পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র। অতএব জীবনে দুঃখানুভূতির বিকাশ; অতএব জীবন দুঃখময়। জীবপর্য্যায়ে যে যত উন্নত সে তত দুঃখী; জীবেরই দুঃখ আছে, কাঠ-পাথরের দুঃখ নাই। জীবের মধ্যে আবার মানুষের মত দুঃখী কেহ নাই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটিকে নিষাদ-শরাহত দেখিয়া যাঁহার বদন হইতে প্রথম শ্লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছিল, মনুষ্যমধ্যে তিনিই রামায়ণী গাথার রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনী ইহার সাক্ষী।

প্রাকৃতিক শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তি-জীবনের উপরে বিদ্যমান তাহা নহে, সমাজ-জীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজ-রক্ষা না হইলে ব্যক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সমবেদনা মূলতঃ ব্যক্তি-জীবন-রক্ষার অনুকূল।

জীবন দুঃখময়; কেননা, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা। আবার জীবন দুঃখময়; সেই জন্য জীবনে সুখের আবশ্যকতা। নহিলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নহিলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। প্রকৃতির এ কিরকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া প্রকৃতি ভাল করে; ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না; বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না; কেননা, যখনই দেখি ভাল, তখনই পরক্ষণেই দেখি মন্দ। সুতরাং উহা বিধাতার খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে। অন্ততঃ মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এইটা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ; এবং অগত্যা সে সুখের সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত তাহার তত দুঃখ; তাহার তত সুখের দরকার; না হইলে তাহার জীবন চলে না; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ তাহার নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলা সামগ্রী জগতের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নহে। অমুক অমুক পদার্থই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন কোন বিধান নাই। মানুষ সম্মুখে যাহা পায় তাহা হইতে সুখ টানিয়া

আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বিচার করে না ; যেখানে-সেখানে যখন-তখন সুখের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, যাহাতে সাধারণ মানুষ মাত্রেই কিছু-না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য্য দেখে ; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোন-না-কোন রূপে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল ও আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার ; তাই যাহা-তাহা যে-সে পদার্থ হইতে তাহারা সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী, কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ পায় না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের মত গড়িয়া লয় ; তাহাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দু-চোখে যাহা দেখে তাহাই রঙিল চশমা পরিয়া রঙিল করিয়া দেখিয়া লয় ; কেননা, সৌন্দর্য্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক ; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাহার অবলম্বন ; বিশুদ্ধ সুখই তাহার লক্ষ্য। যাহা বুঝিতে পারে তাহাতে আনন্দ পায় ; যাহা বুঝে না তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না, তাহাতে আনন্দ অধিক হয়। স্থূল হিসাবে এটা সমস্যা। বিজ্ঞানবিৎ জগদ্‌যন্ত্রের জটিলতা উদ্ঘাটন করিয়া যতই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্য-জীবনের সহায় করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্যকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন বা বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে যেটা বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম পাই ; আবার যেটা বুঝি না তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। যাহা আপাততঃ নিয়মের বাহির, ইংরেজীতে যাহাকে মিরাক্‌ল্‌ বলে তাহার প্রতি মানব-মনের প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এই জন্য। অনির্দ্দেশ্য অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্য সৌন্দর্য্যে মহীয়সী। অনেকের মতে বৈজ্ঞানিকগণ জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সৌন্দর্য্যের বিনাশে নিযুক্ত আছেন।

রাম-চরিত্রে সীতা-নির্ব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না, বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরেজীওয়ালাদের কাছে। রাম-চরিত্রের এইটুকু ভাল বুঝা যায় না ; এবং বোধ হয়, এই জন্যই ইহা সুন্দর। সমাজশক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য, অতএব সুন্দর, রহস্য। বাসন্তী দেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া নিরপরাধা সীতার নির্ব্বাসনের অপরাধে বাক্যবাণে তাঁহাকে

জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার রাম-চরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া অথচ রাম-চরিত্রের লোকোত্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, বজ্র হইতে কঠোর, কুসুম হইতে কোমল, লোকোত্তর চরিত্র কে বুঝিতে পারে ?

যাই হউক, সৌন্দর্য্য ও তদনুভবজাত আনন্দ না হইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয় ; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের আলোচনায় এই কয়েকটি কথা পাওয়া গেল—

১. ইতর জীবের মধ্যে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির সহিত তাহার তুলনা হয় না। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য -ভোগের শক্তি মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ মনে করা যাইতে পারে।

২. মনুষ্যমধ্যে আবার সকলের এই শক্তি সমান নহে। এই শক্তির তারতম্যে মনুষ্যত্বের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

৩. প্রকৃতির বহুরূপিতার সহিত জীবের চেতনার গূঢ় সম্পর্ক আছে; প্রকৃতি বহুরূপী না হইলে জীবের চেতনা ফুটিত না। উন্নতচেতন জীব মনুষ্য বিচিত্র ও বহুরূপী প্রকৃতিকে আদর করে। একঘেয়ে জিনিস সুন্দর হয় না।

৪. যাহাতে মানুষের কিছু-না-কিছু লাভ আছে, তাহা মানুষ ক্রমশঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্যবোধে কোনরূপ লাভ আছে দেখাইতে পারিলে সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি বুঝা যাইবে। কতকগুলি পদার্থ কোন-না-কোনরূপে স্বাস্থ্যের ও জীবনের অনুকূল। আর কতকগুলি পদার্থ জীবন-সংগ্রামে আশঙ্কা দূর করিয়া আশা আনে; নৈরাশ্য দূর করিয়া প্রফুল্লতা আনে; আরও কতকগুলি পদার্থ ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্যভাবে আনুকূল্য না করিলেও সামাজিক জীবনে বা জাতীয় জীবনে আনুকূল্য করিয়া থাকে, পরের প্রতি সমবেদনা জাগাইয়া পরার্থবৃত্তির উদ্দীপনা করে। এই সকল পদার্থ মানুষে পাইতে চায় এবং পাইলে আনন্দিত হয়; অতএব ইহারা সুন্দর।

৫. কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আনুকূল্য করে না অথচ মনুষ্যের নিকট অতি সুন্দর, এমন পদার্থেরও অভাব নাই। এমন কি, যাহা অকারণে সুন্দর, তাহার মত সুন্দর অন্য কোন জিনিস নহে। যাহাতে কোন লাভ নাই সেই সৌন্দর্য্যের বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

৬. এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির সহিত মনুষ্যের দুঃখবৃত্তি ক্রমশঃ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতেছে। ইহা সত্য কথা। মানুষের উন্নতির ইহা একটা লক্ষণ। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের জন্য আশঙ্কা এবং জাতীয় জীবনে আত্মীয় লোকের জন্য আশঙ্কা হয়ত মনুষ্যের এই দুঃখপ্রবণতার মূলে বিদ্যমান। এই দুঃখবৃত্তি জীবনের রক্ষা বিষয়ে অনুকূল। যেখানে-সেখানে এই আশঙ্কা না থাকিলে মনুষ্য জীবনরক্ষায় উদাসীন হইত, এবং এই আশঙ্কা হইতেই দুঃখবৃত্তির উৎপত্তি।

৭. কিন্তু কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি ঘটিলে মানব-জীবন দুর্ব্বহ হইত। উন্নত মানব ধরাধামে টিকিত না। মনুষ্য যেমন যেখানে-সেখানে দুঃখ পায়, সেইরূপ যেখানে-সেখানে আনন্দ কুড়াইবার ক্ষমতা না পাইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না। কোথা হইতে দুঃখ আসিবে, তাহা যেমন সর্ব্বত্র স্থির করা চলে না, সেইরূপ কোথা হইতে কখন আনন্দ পাওয়া যাইবে, তাহাও সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করা চলে না। যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেই জন্যই অতি সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখবৃত্তি প্রবল, সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা তাহাদেরই তত প্রবল। দুঃখের মত সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই। কাব্যে এই জন্য করুণ রসের স্থান সর্ব্বোপরি।

৮. সৌন্দর্য্যবুদ্ধি মানুষের মনে, অপিচ সৌন্দর্য্যও মানুষের মনঃকল্পিত। কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, মানুষ তাহাকে স্বার্থের জন্য সুন্দর করিয়া লয়। মানুষই সৌন্দর্য্য রচনা করে। সৌন্দর্য্য-রচনাতেই মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ। দুঃখবহুল সংসারে বিচরণ-কালে আনন্দ রচনা না করিলে তাহার চলে না। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আনন্দরচনাশক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিয়াছে। যাহাতে লাভ তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে।

রচনা : ১৩০০ বঙ্গাব্দ

জয়দেবের কবিত্ব

সতীশচন্দ্র রায়

বহুকাল পূর্ব্বে পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু তাঁহার "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় "বিদ্যাপতি ও জয়দেব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি পরে তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে, অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু উক্ত প্রবন্ধে জয়দেবের সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পরবর্ত্তী সমালোচকদিগের নিকট আমরা তাহা ছাড়া বড় একটা নূতন কথা কিছু শুনিতে পাই নাই। বঙ্কিমবাবুর সমালোচনাটি বড়ই সংক্ষিপ্ত। জয়দেব কিম্বা বিদ্যাপতির কবিতা গীতি-কাব্যের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা নির্দ্দেশ করাই বোধ হয় বঙ্কিমবাবুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তজ্জন্যই তিনি তাঁহার "উত্তর-চরিত" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে ভবভূতির সেই অতুলনীয় কাব্যের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, জয়দেব কিংবা বিদ্যাপতির কাব্যের সেরূপ করেন নাই। এমন কি, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে "সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র" ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেও, কোন্ ঐতিহাসিক বা সামাজিক প্রভাবের ফলে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের বিষয় প্রায় অভিন্ন হইলেও তাঁহাদিগের কবিতা-প্রবাহিনী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্কিমবাবু তাহার আলোচনা করেন নাই। বঙ্কিমবাবু সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও, তিনি যে জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যের বিশেষজ্ঞ ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণদর্শিতার পরিচয় থাকিলেও তাহাতে কতকগুলি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্য-সমালোচনায় বিলক্ষণ রসজ্ঞতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনিও বঙ্কিমবাবুর প্রদর্শিত গীতি-কাব্যের 'বহিঃপ্রকৃতিকতা' ও 'অন্তঃপ্রকৃতিকতা'— এই মূলীভূত পার্থক্যের উৎপত্তির কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। সে যাহা হউক, আমরা বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে কতিপয় স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, "বাংলা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাংলায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাংলার প্রাচীন কবি জয়দেব

গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।···

'ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল-বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাংলার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্য-প্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর দম্পতি-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। এই জাতিচরিত্রানুকারিণী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

'বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর এক দল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানব-হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য-চরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয় সমীর, ললিতলতা, কুবলয়শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরৎচন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নব জলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলস নিমেষ, এই সকলের চিত্র বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিতায় বাহ্য-প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য-প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে,— বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-হৃদয়ের নিত্য-সম্বন্ধ; সুতরাং কাব্যের নিত্য-সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য-প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।

জয়দেব বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য-প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকটসম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি-ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন— সুতরাং তাঁহাদিগের কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাস-পূর্ণ— বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-পূর্ণ। জয়দেব ভোগ,— বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ— বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত— বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল কমলজালশোভিত বিহঙ্গমাকুল স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর— বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার— বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষের মালা। জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি— বিদ্যাপতির গান সায়াহ্নসমীরণের নিঃশ্বাস।

পুনশ্চ—

'আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শ-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।'

পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য অনুসারে যে দুইটি শ্রেণী-ভেদ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সত্য হইলেও উহা কেবল বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। কবিদিগের প্রকৃতিগত ঐরূপ প্রভেদ সকল সময়ের সকল সাহিত্যেই লক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবু উক্ত কবিগণের দেশ-কাল-গত ও বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি-গত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতি-গত প্রভেদই যে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কতিপয় সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তির যত্নে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি এখন আর পাঠকদিগের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় দুর্লভ নহে। বৈষ্ণব পদাবলির পাঠক মাত্রেই এখন জানেন যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা যে "বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত" "ইন্দ্রিয়ের সংস্রব-শূন্য" এবং "বিলাস-শূন্য" বলিয়া বঙ্কিমবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিদ্যাপতির একমাত্র মাথুরের কবিতার

সম্বন্ধেই এই মন্তব্য কিয়ৎপরিমাণে প্রযোজ্য হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাঁহার বয়ঃসন্ধি, সখীশিক্ষা, সম্ভোগ, রসোদ্গার প্রভৃতি বিষয়ের কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির বিচিত্র মনোহর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসবাসনার পূর্ণ বিকাশই লক্ষিত হইয়া থাকে। বিরহাত্মক মাথুর-লীলায় বিষয়-মাহাত্ম্যেই বিদ্যাপতির বর্ণনা অনেক পরিমাণে বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বিদ্যাপতির সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য একেবারেই প্রযোজ্য নহে, সত্যের অনুরোধে আমরা ইহাই বলিতে বাধ্য। গোবিন্দদাস যে সম্পূর্ণ জয়দেব ও বিদ্যাপতির শ্রেণীর কবি, এবং তাঁহার কাব্যে যে, বিদ্যাপতি অপেক্ষাও জয়দেবের প্রভাব সুপরিস্ফুট তাহা আমরা স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; এস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের কবিতায় বিলাস-প্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তাহার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে; চণ্ডীদাসে স্বয়ংদৌত্য, খণ্ডিতা, রাসলীলা, প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা কিরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ঐ সকল বর্ণনায় বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্যের সঙ্গে যথেষ্ট বিলাসপ্রিয়তাও পরিলক্ষিত হয়। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীরাধা কখনও প্রিয়তমের প্রতি, কখনও নিজের প্রতি ধিক্কার দিতেছেন, আবার কখনও বা শতমুখে সেই প্রেমেরই প্রশংসা করিয়া নিজের সৌভাগ্যে নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, চণ্ডীদাসের কবিতা সেখানেই সকল বিলাসবাসনা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। চণ্ডীদাস বাংলার আদি ও শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। বনবিহঙ্গের কলকূজনের ন্যায় তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা-ঝঙ্কারে বাঙ্গালীর হৃদয়-তন্ত্রীতে সুখ ও দুঃখের, আশা ও নিরাশার, আনন্দ ও বিষাদের যে জীবন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে, আজ পাঁচ শত বৎসর পরেও বাঙ্গলা গীতিকাব্যে আমরা সেই ধ্বনির অনুরণন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। বাঙ্গালী কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদিগকে ভুলিতে পারে,—কিন্তু বাংলার আদিকবি চণ্ডীদাসকে ভুলিতে পারে না; কারণ, আমরা আজ জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃত ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা হইতে আমরা যতই শিক্ষা প্রাপ্ত হই না কেন, আমাদিগের জাতীয় উন্নতি ও অবনতির সহায় আমাদিগের মাতৃভাষা ব্যতীত আর কিছু হইবে না। সে যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মৈথিল ও বাঙ্গালী কবিদিগের সহিত তিন শতাব্দী কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কবি জয়দেবের কবিতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের তুলনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উভয় কালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাবের আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া, ঐ পার্থক্যের

কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিলে, উহা কোনমতেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবু জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন— "জয়দেব ভোগ— বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব বসন্ত— বিদ্যাপতি বর্ষা।" আমরা কিন্তু এই পার্থক্য তাঁহাদিগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাবের প্রভেদের ফল বলিয়াই স্বীকার করি। জয়দেব যখন তাঁহার সুললিত পদ-মাধুর্য্যে বাঙ্গালীর হৃদয় মোহিত করিতেছিলেন, তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার অমানিশা আরম্ভ হয় নাই; সেনরাজ লক্ষ্মণসেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় তখন বাঙ্গালীর ভাগ্য-আকাশে কিরণজাল বিস্তার করিতেছিলেন। বাঙ্গালী তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের প্রিয়তম রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহাদিগের জীবনের সারসুখ হারাইয়া,— শুধু সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি লইয়া দুর্ব্বহ জীবনের অবশিষ্ট দিন গণনা করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার কাব্যে যে, আমরা সুখের চিত্র, ভোগের চিত্রই অধিক দেখিতে পাই, ইহা কি সম্পূর্ণই কবির ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফল বলা যাইতে পারে? লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাঙ্গালা-সমাজে বিলাসের স্রোত যে প্রবল হইয়াছিল, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। জয়দেব পৌরাণিক আখ্যায়িকার অনুসরণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত করিয়াছেন— সুতরাং তাহা হইতে সে সময়ের সমাজের প্রকৃত চিত্র বুঝা কঠিন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পঞ্চ-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন গোবর্দ্ধন আচার্য্য তাঁহার "আর্য্যা-সপ্তশতী" কাব্যে সেই কালের নায়ক নায়িকাদিগের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন— তাহা বিলাস-জর্জ্জরিত পতনোন্মুখ সমাজের চিত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। সেক্স্পীয়র কালিদাস প্রভৃতি অসীমপ্রতিভাশালী মহাকবিগণও ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সুতরাং জয়দেবের কাব্যেও যে এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রভাবের ফলেই কিঞ্চিৎ বিলাসপ্রিয়তা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পার্থক্যের অপর গুরুতর কারণ —ভাষা ও বর্ণনীয় বিষয়ের পার্থক্য। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ জানেন যে, সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য ভাব-প্রকাশের বিশেষ উপযোগী হইলেও, উচ্ছ্বাসপূর্ণ কোমল প্রণয়কবিতা বামাকণ্ঠের উপযোগী প্রাকৃত-ভাষায় যেরূপ স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে— সংস্কৃতে সেরূপ হয় না। এইজন্যই সাতবাহন নৃপতির সঙ্কলিত প্রাকৃত "গাথা-সপ্তশতী" কাব্য সংস্কৃত-সাহিত্যে এই শ্রেণীর কবিতার শীর্ষস্থান অধিকার

করিয়াছে। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতের প্রারম্ভে সাতবাহনের সেই সংগ্রহকে মহার্ঘ রত্ন-রাজি-গ্রথিত মণিহারের ন্যায় মনোহর ও অবিনশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়া, আদিরসাত্মক বর্ণনায় প্রাকৃত-কাব্যের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য সেই সুপ্রসিদ্ধ "গাথা-সপ্তশতী"র অনুকরণে সংস্কৃত ভাষায় "আর্য্যা-সপ্তশতী" কাব্য প্রণয়ন করিতে যাইয়া স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন "বাণী প্রাকৃত-সমুচিত-রসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।" অর্থাৎ— "যে রসবর্ণনা প্রাকৃত ভাষায়ই উপযুক্ত হইত, আমি তাহাকে জোর করিয়া সংস্কৃতে আনিয়াছি।" দাম্পত্য-প্রেমাত্মক গীতি-কাব্যের পক্ষে প্রাকৃত ভাষার এই অসাধারণ উপযোগিতা মধুর-কোমল বঙ্গভাষার প্রতি আরও অধিক প্রযোজ্য বটে। সুতরাং যে সময়ে আমাদিগের দেশে সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা ছিল সে সময়ের যদি এই কথা হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের নিকট বাংলা গীতি-কাব্যের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের তুলনায় গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা যে অনেক পরিমাণে কৃত্রিম ও উচ্ছ্বাস-বিহীন বলিয়া বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? আর একটি কারণ হইতেছে বর্ণনীয় বিষয়ের পার্থক্য। যদিও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই আলোচ্য কাব্যগুলির বর্ণনীয় বিষয় বটে —কিন্তু তাহা হইলেও জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের কাব্যের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অনুকরণে গীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে— তাহাতে আমরা শ্রীরাধাকে প্রথম হইতেই ব্রজগোপীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপগুণবতী প্রণয়-প্রবীণা প্রগল্‌ভা নায়িকারূপে দেখিতে পাই। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শনেই তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে পাইয়াই শ্রীকৃষ্ণেরও প্রণয়-পিপাসার পরিতৃপ্তি হইয়াছে; কিন্তু তথাপি তিনি কামনা-ফল-দাতা ভগবান্ বলিয়া অন্যান্য ব্রজাঙ্গনাদিগের বাসনা পূর্ণ না করিয়া পারেন না, তাই প্রিয়তমা শ্রীরাধার জন্য ব্যাকুল হইয়াও তিনি শ্রীরাধার অসমক্ষে ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত বাসন্তী রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতঃপর গীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে প্রেমাভিমান, অনুতাপ, বিষাদ ও সম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা প্রেমপূর্ণ দুইটি হৃদয়ের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। প্রেমবিহ্বলতায় ইহার আরম্ভ, প্রেমবিহ্বলতায় ইহার পরিণতি। মেঘদূতের যক্ষ এরূপ প্রেমবিহ্বল হৃদয় লইয়াও, রঞ্জিত কাচখণ্ডের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান পদার্থরাজির ন্যায়, স্বীয় প্রেমাকুল কল্পনার সাহায্যে রাজ্যের নদ-নদী পর্ব্বত-কানন-নগর-দেবায়তনের একটি সুরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,— কিন্তু জয়দেবের শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সংসারের

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই জয়দেব তাঁহার কাব্যে কোথায়ও শ্রীরাধার লৌকিক পিতা মাতা পতি কিম্বা শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির কোনোরূপ সংস্রব উল্লেখ করেন নাই। এমন-কি, শ্রীরাধার এই স্বাধীন প্রেমলীলার উদ্‌যাপনের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বহুনিষ্ঠ অনুরাগের অসমগ্রতা ব্যতীত আর যে কিছুমাত্র অন্তরায় আছে, জয়দেব ঘুণাক্ষরেও তাহার আভাস দেন নাই। যিনি প্রেমে এইরূপ তন্ময় তাঁহার নিকট বিরহও অনেক পরিমাণে সম্ভোগের আকার ধারণ করে, তাই সখী শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার বিরহের অবস্থা জানাইতে যাইয়া বলিতেছে—

তব বেশ আভরণ
ধরি' রাধা অনুক্ষণ
ভাবে মনে এবে যেন
হয়েছে মধুসূদন···
সুনীল জলদ যেন
নিকুঞ্জে তিমির ঘন
শ্যাম! তব ভ্রমে রাধা
করে চুম্বনালিঙ্গন!

ইহাকে বিরহ বলিতে হয় বলুন, আমরা ইহাকে বিরহ ও সম্ভোগের অতীত প্রেম-তন্ময়তা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত শ্রীরাধা আর পরাপ্রকৃতি-স্বরূপ আদর্শপ্রেমিকা প্রবীণা নায়িকা নহেন,—তিনি বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থানে উপনীতা, লজ্জাবতী কিশোরী কুলবধূ মাত্র। প্রণয়ের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে সেই কিশোরী ধীরে ধীরে কিরূপে প্রেমোন্মত্তা প্রগল্‌ভা নায়িকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে আমরা আমাদিগের সমাজের একটি উৎপীড়িতা রূপগুণান্বিতা কিশোরী কুলবধূর প্রেমিক পরপুরুষে দুর্দ্দমনীয় আসক্তি এবং সেই আসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম লোকগঞ্জনা, অকথনীয় যাতনা, অনুতাপ ও সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত সম্মিলনেরই পরিস্ফুট চিত্র দেখিতে পাই। ইহা আমাদিগের সমাজেরই একটি অতি সকরুণ স্বাভাবিক চিত্র বলিয়া যদিও আমাদিগের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে অধিকতর সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে পুরাণকারের অভিপ্রেত ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশক রূপকটি যে অনেক পরিমাণে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং শ্রীরাধার চরিত্রে পরকীয়াভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হওয়ায়, সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের

মতানুসারে রসাভাস-দোষের আশঙ্কা ঘটিয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

দেশ কাল ও আখ্যান-বস্তুর এই গুরুতর প্রভেদগুলির বিষয় স্মরণ রাখিয়া গীত-গোবিন্দ কাব্যখানা আলোচনা করিলে জয়দেবকে বহিঃপ্রকৃতি-প্রধান গীতি-কবিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বহিঃপ্রকৃতি-প্রধান কবিগণের মধ্যে মোটেই গণ্য করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। যদি ইহা আমাদিগের স্মৃতি-ভ্রম না হয়, তাহা হইলে স্মরণ পড়ে যে, পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবুর বিবিধ-প্রবন্ধের কোন পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে তিনি মহাকবি কালিদাসকেও বহিঃপ্রকৃতি-প্রধান কবিশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি ঐ শ্রেণী হইতে যে কারণেই কালিদাসকে বর্জ্জিত করিয়া থাকেন না কেন, বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য দেখিয়া যদি কোনো কবিকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে যে, কালিদাসকেও জয়দেবের সহিত এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণে অপটু, এমন-কি ভারতবর্ষের অন্য কোনো কবির অপেক্ষা হীন বলিতে পারেন, এরূপ দুঃসাহসী কেহ আছেন কি?— বঙ্কিমবাবুর প্রদর্শিত শ্রেণী দুইটি তর্কশাস্ত্রানুসারে নির্দ্দোষ হইলেও তাহা দ্বারা যে, কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ-নির্ণয়ে আমাদিগের বিশেষ সহায়তা হয় না, একমাত্র কালিদাসের দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, জয়দেব কালিদাস নহেন; কালিদাস ও সেক্‌স্‌পীয়র ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো কবিই বোধ হয় বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ প্রায় তুল্য দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। প্রায় তুল্য বলিতেছি এই জন্য যে, কালিদাসেও অন্তঃপ্রকৃতির অপেক্ষা বহিঃপ্রকৃতির এবং সেক্‌স্‌পীয়রে বহিঃপ্রকৃতির অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির চিত্র অধিক পরিস্ফুট। জয়দেবের কাব্যে দেশ কাল সমাজ ও আখ্যানবস্তুর প্রভাব এবং বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফলে বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেরই আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি মানবহৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন, এমন কথা বোধ হয় কোনো সহৃদয় পাঠকই বলিতে সাহসী হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমবাবু সেরূপ কথা কিছু বলেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা এবং জয়দেবের কবিতার তাৎপর্য্য যাঁহারা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ, বঙ্কিমবাবুর সেইরূপ কোনো কোনো শিষ্যও জয়দেবের কবিতায় সোনার গিল্‌টি করা ধূলিরাশি ব্যতীত

আর কিছুই দেখিতে পান নাই। জয়দেবের প্রতি এরূপ বিদ্বেষান্ধ ব্যক্তিদিগের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতীত আমাদিগের আর কিছু করার সাধ্য নাই।

সে যাহা হউক, নিরপেক্ষ পাঠককে কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, যদি তিনি জয়দেবের কবিতার বাহ্য সৌন্দর্য্যের ছটায় মুগ্ধ বা বিরক্ত হইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে তিনি জয়দেবের বাহ্যসৌন্দর্য্য-প্রধান কবিতায়ও যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিবেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার অপেক্ষা বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যে অধিক বিলাসপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? জয়দেব এই বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে কিরূপ উক্তি বাহির করিয়াছেন তাহা শুনুন—

স্পর্শসুখ, চঞ্চল সে নয়নের দৃষ্টিরসযুত,
মুখপদ্মসৌরভ সে, সুধা-স্রাবী বঙ্কিম বচন,
সেই বিম্বাধরশোভা, চিত্তে মম রয়েছে মুদ্রিত,
মন লগ্ন তার সনে,— কিসে বাড়ে বিরহবেদন?

যেখানে বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি ধ্যানলভ্য হইয়া এরূপ ঐকান্তিক তন্ময়তায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সেখানে উহাকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা না বলিয়া উচ্চ-অঙ্গের আধ্যাত্মিকতা বলাই একান্ত সঙ্গত নহে কি?

আমরা এ পর্য্যন্ত গীতগোবিন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার অপনীত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছি। এখন সংক্ষেপে জয়দেবের কবিত্বের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ— জয়দেবের পূর্ব্বে আর কোনো কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন নাই, জয়দেব যদিও মূল বিষয়টির জন্য পুরাণকারের নিকট ঋণী; কিন্তু তিনি উহা যে ভাবে পল্লবিত এবং উৎকৃষ্ট কাব্যোপযোগী অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্ব বটে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ সকলেই এ বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। সুতরাং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের নিকট ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্মান, অন্যান্য বৈষ্ণব-কবিদিগের নিকটও সেইরূপ সম্মান একমাত্র জয়দেবেরই প্রাপ্য বটে।

দ্বিতীয়তঃ— সংস্কৃত-সাহিত্যের সুপণ্ডিত পাঠক জ্ঞাত আছেন যে, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণের পরবর্ত্তী সময়ে মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণ আবির্ভূত হইয়া কালিদাসাদির গরীয়সী কবিকল্পনার পরিবর্ত্তে নানাবিধ

বিচিত্র অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সমাবেশ-দ্বারা কাব্যের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া, উহা অতিমাত্রায় রঞ্জিত ও কৃত্রিমতাপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জয়দেব ইঁহাদিগের সকলের পরবর্ত্তী এবং পতনোন্মুখ বঙ্গসমাজের মুখপাত্র বলিয়া তাঁহার কাব্যে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হইলেও, তিনি স্বীয় উন্নত কবিপ্রতিভার প্রভাবেই সেই সংক্রামকতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা কবিতার অলঙ্কারবহুল কৃত্রিম সৌন্দর্য্যেই অধিক প্রীতিলাভ করেন—তাঁহাদিগের প্রিয়তম আদর্শ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের সহিত তুলনা করিলেই জয়দেবের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইবে। নৈষধচরিতের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেখানে দময়ন্তীর নলবিরহ বর্ণিত হইয়াছে সেই চতুর্থ সর্গটিকে পদলালিত্য, অলঙ্কারবৈচিত্র্য ও রসপ্রকর্ষতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও তাহা অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না। আমরা সেই চতুর্থ সর্গ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সদৃশভাবাত্মক গীতগোবিন্দের শ্লোকের সহিত তুলনা করিব।

নৈষধের চতুর্থ সর্গের প্রথম শ্লোকে শ্রীহর্ষ নলরাজের গুণানুবাদ-শ্রবণে তৎপ্রতি দময়ন্তীর অনুরাগোৎপত্তির বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

অথ নলস্য গুণং গুণমাত্মভূঃ
সুরভি তস্য যশঃকুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া
তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাম্॥

নলের সে গুণে গুণ করি বিরচন,
তাঁর যশে রচি' পুষ্পধনু সযতনে,
শ্রুতিগত নলে— সৌমনস্যের কারণ—
রচি' মনসিজশর বৈদর্ভীরে জিনে!

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সম্মোহনকটাক্ষে জর্জ্জরিত হইয়া বলিয়াছেন—

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণাঃ গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি।

ভুরুলতা— ধনু, বাণ— কটাক্ষবীক্ষণ,
শ্রবণের প্রান্ত তাহে গুণ সুশোভন,—
অনঙ্গের জয়-দাত্রী দেবী শ্রীরাধারে
বিশ্ব জিনি এ অস্ত্র কি কামে দিলে ফিরে ?

জয়দেব তাঁহার এই শ্লোকটির ছায়া শ্রীহর্ষের পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতা হইতে গ্রহণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে,— বরং তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বিবেচনা হয় ; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে ? শ্রীহর্ষের শ্লোকে শ্লেষালঙ্কারের বাড়াবাড়ি থাকিলেও জয়দেবের শ্লোকটি কত অধিক স্বাভাবিক— এবং রূপক ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার-ঘটিত শেষ দুইটি পংক্তির ভাব ও বর্ণনাভঙ্গী কিরূপ অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব-সম্পন্ন তাহা সহৃদয় পাঠকই অনুভব করিতে পারিবেন।

নৈষধের চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন—

যদতনুজ্বরভাক্ তনুতেস্ম সা
প্রিয়কথাসরসীরসমজ্জনম্।
সপদি তস্য চিরান্তরতাপিনী
পরিণতির্বিষমা সমপদ্যত।

অতনুজ্বরের তাপে দময়ন্তী করে
প্রিয়কথাবাপীরসে যাহে নিমজ্জন,—
তাই অবিলম্বে তাঁর ঘটে চিরতরে
অন্তর্দাহক পরিণাম সুভীষণ।

গীতগোবিন্দে সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরহিণী শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥

রোমাঞ্চ, শীৎকার, কম্প, বিলাপ, উত্থান, মলিনতা,
ভাবনা, ঘূর্ণন, নেত্র-নিমীলন, পতন, মূর্চ্ছন—
রাধার অতনুজ্বরে উপজিল ; করিয়া মমতা,
রসদানে সুরবৈদ্য ! রক্ষ তারে— নহিলে মরণ।

এ স্থলে নৈষধের ন্যায় 'অতনু' ও 'রস' এই দুইটি শ্লিষ্টশব্দের সাহায্যে জয়দেব যে সাঙ্গরূপকের অবতারণা করিয়াছেন— তাহা নৈষধের কবিতা হইতে কত চমৎকার হইয়াছে তাহা কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে ?

নৈষধের চতুর্থ সর্গের সপ্তবিংশ শ্লোকে শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর বিরহিণীবেশের বর্ণন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

বিরহতাপিনি চন্দনপাংশুভির্-
বপুষি সার্পিতপাণ্ডিমমণ্ডনা।
বিষধরাভ-বিসাভরণা দধে
রতি-পতিং প্রতি শম্ভু-বিভীষিকাম্॥

বিরহতাপিত অঙ্গে চন্দনলেপন
রচিয়াছে বিপাণ্ডুর কিবা শোভা তাঁর!
ভুজঙ্গমসম শুভ্র মৃণালভূষণ
কামহৃদে করে শম্ভুভীতির সঞ্চার!

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি।

উরসে মৃণালহার,— নহে ত এ ভুজঙ্গভূষণ;
কণ্ঠে নীলোৎপলদল, নহে ত এ গরল কখন;
চন্দন শরীরে মম— নহে ভস্ম; ধে'য়ো না মদন!
ক্রোধে বিরহীর প্রতি— হরভ্রমে না কর তাড়ন।

এখানেও বোধ হয় জয়দেব নৈষধের কবিতার ছায়া গ্রহণ করিয়াছেন;— কিন্তু উভয় কবিতায় কত পার্থক্য! দময়ন্তীকে দেখিয়া কন্দর্পের যদি শম্ভুভীতিই হইয়া থাকে, তাহা হইলে দময়ন্তী তো তাঁহার তাড়না হইতে বাঁচিয়া যাইতেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইয়াছে কি? পার্ব্বতীর পরিণয়ের পর যখন শম্ভু কন্দর্পকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতশক্তি করিয়া দিয়াছেন— তখন পূর্ব্বকৃত

শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য শম্ভুভ্রমে বিরহীদিগের প্রতি কন্দর্পের শরাঘাত করাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীহর্ষের অস্বাভাবিক অলঙ্কারবৈচিত্র্যের সহিত তুলনায় জয়দেবের এই কবিতা যে কত সুন্দর এবং তাঁহার কবিতায় বিরহীর শম্ভু-সাদৃশ্য যে কত অধিক নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিবেন। বিদ্যাপতির—

কতিহু মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর হুঁ বরনারী।

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটি জয়দেবের শ্লোকের একরূপ অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। নৈষধচরিতের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই যেরূপ অলঙ্কারবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় জয়দেবের কবিতার প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে তদ্রূপ হইলেও— অলঙ্কারপ্রয়োগে উভয় কবির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কালিদাসাদি প্রাচীন কবিগণের ন্যায় জয়দেব সাধারণতঃ শ্লেষ-অলঙ্কারের অধিক পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু—

'ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং'
'পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং'
'দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং'

ইত্যাদি যে সকল কবিতায় জয়দেব শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন— সেখানে উহা দ্বারা কবিতার স্বাভাবিকতার কোনো হানি না হইয়া নিতান্ত চমৎকারিত্বই সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের কাব্যের যাঁহারা নিতান্ত গোঁড়া, 'উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ' যাঁহাদিগের সমালোচনার মূলসূত্র, তাঁহারা স্বীকার করিবেন কিনা বলিতে পারি না— কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক উভয় কবির কবিতার আলোচনা করিয়া কি অনুপ্রাসজনিত পদলালিত্য, কি অলঙ্কারমূলক ভাববৈচিত্র্য সকল বিষয়েই শ্রীহর্ষ অপেক্ষা জয়দেবের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবেন এবং 'সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব' বলিয়া কবি গ্রন্থারম্ভে সমসাময়িক কবিগণ-মধ্যে নিজের যে বিশেষত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে অতিশয়োক্তি নহে এবং তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ

পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা

দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে অপূর্ব্ব কবিত্বখনি পল্লীগাথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশ ভাবজগতে দ্বিতীয় গোলকুণ্ডার স্থান অধিকার করিবে। য়ুরোপের মনীষিবৃন্দ বঙ্গীয় অশিক্ষিত কৃষকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং কবিত্বের মাদকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। জগতের আর কোন দেশের কৃষক-কবি এরূপ উচ্চাঙ্গের কাব্য-শিল্পের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

এই পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে "মহুয়া", "মঞ্জুর মা" ও "ধোপার পাট", "কাজল রেখা", "শ্যামরায়" প্রভৃতি কয়েকটি এমন পালাগান আছে, যাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেগুলির মধ্যে এরূপ লক্ষণ আছে— যাহা চণ্ডীদাসের যুগচিহ্নাঙ্কিত।

কিন্তু পল্লীগীতিকায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে— কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই; দুশ্চর তপস্যা আছে— কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট আকাশের নীচে, নীলবনান্ত-প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বন্যবীথিতে, কংস ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়াছে— কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নরনারীর প্রেম, ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম স্বর্গের অতি সন্নিহিত— ইহাতে যেটুকু বাকী ছিল, বৈষ্ণবেরা তাহা পূরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতার ললিতছন্দ, অপূর্ব্ব শব্দমাধুর্য্য, শিল্পীর কৌশলযুক্ত গাঁথুনী প্রভৃতি শিক্ষালব্ধ গুণ নিরক্ষর পল্লীকবি কোথায় পাইবে? পল্লীকবির ভাষা অমার্জ্জিত— কিন্তু অতি সরল, তাহার ছন্দোহীন রচনা কবিত্বে ভরপুর। এই সকল নিরক্ষর কবি অভিমানের পাদপীঠে বসিয়া আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় নিজেদের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, জগজ্জয়ী কথা বলিয়া ঘোষণা করে নাই। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাহাদের অণুমাত্র ছিল না। তাহারা যে সকল দৃশ্য আঁকিয়াছে তাহাতে তুচ্ছ করিবার কিছু নাই। তাহা বাঙ্গালী জাতিকে যত বড় করিয়া দেখাইয়াছে তদ্রূপ বড় করিবার সম্পদ্ বাঙ্গালার হাটে পথে পড়িয়া নাই। এই

গীতগুলি বাঙ্গালী জাতির চিরগৌরব। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুতে নাই।

কতকগুলি পালাগানের কথার সঙ্গে চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলীর শব্দসম্পদের আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। যথা— ধোপার পাটে "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি আর ছলাতে কাটে", চণ্ডীদাসের "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি সময় পাইলে কাটে"— এ দুই একেবারে অনুরূপ। ধোপার পাটের "তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম" চণ্ডীদাসের "তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম। তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম" এ উভয়ও আক্ষরিকভাবে মিলিয়া যাইতেছে। ঐ পালাগানটির "ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন" চণ্ডীদাসের "ঘর করলাম বাহির, বাহির কৈলাম ঘর। পর করলাম আপন, আপন কৈনু পর" এবং ধোপার পাটের "কাট্যা গ্যাছে কাল মেঘ চাঁদের উদয়। এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়" এবং চণ্ডীদাসের "কহিও বঁধুরে সখি কহিও বন্ধুরে। গমনবিরোধী হৈল পাপ শশধরে" প্রভৃতিও প্রায় একরূপ। জ্ঞানদাসের "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়", এর সঙ্গে পালাগানের অনেক ছত্রের মিল দেখা যায়।[১] "ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুল হৈতা তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বানতাম বেণী" পদের সঙ্গে লোচনদাসের "ফুল নও যে, কেশের করি বেশ" মিলিয়া যাইতেছে। শ্যামলকুন্তলা বঙ্গভূমির চিরসুন্দর মৃদুমলয়কম্পিত ধান্যশীর্ষে-পরিপূরিত নদীসৈকতে রাখাল বালকের যে সুমধুর মর্ম্মস্পর্শী বাঁশীর সুর ভাসিয়া যায় সে সুরের আদি উৎস প্রেমের কথায় ও পরিণতি প্রেমের আধ্যাত্মিকতায়— সেই বঙ্গপল্লীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ্ বাঁশীর গানের কথা অপূর্ব্ব উন্মাদনাজনিত উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়া মহিষাল বঁধুর পত্রে পত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে— অনুরূপ কথা চণ্ডীদাসের যে কত পদে আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ধোপার পাটের নায়ক রাজকুমার তাঁহার প্রেমিকার সঙ্কেতে গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন, নায়িকা গুরুজনের ভয়ে বাহির হইতে না পারিয়া যে বিলাপোক্তি করিতেছেন, তাহার মাধুর্য্যমিশ্র কারুণ্য চণ্ডীদাসের "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে। আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে" প্রভৃতি পদ স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিবে। পল্লীকবি যেন চণ্ডীদাসের ভাষ্য করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের অনেক কবিত্বপূর্ণ ছত্রের সঙ্গে এই সকল পালাগানের কথার অবিসম্বাদিত নৈকট্য পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইবে। ধোপার পাট, মহুয়া ও

মহিষাল বন্ধু প্রভৃতি কতকগুলি পালাগানে এই নৈকট্য বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু যাঁহারা পল্লীগানগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, বৈষ্ণবপ্রভাব ঐ সকল গাথায় একবারে নাই। বৈষ্ণবেরা নরজগতের প্রেমলীলা, যাহা পল্লীগীতিকার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই আর এক ধাপ উপরে চড়াইয়া আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পল্লীগাথার ভাষা ও ভাব স্বতন্ত্র, তাহাতে বৈষ্ণবগণের অনুকরণ আদৌ নাই।

কিন্তু তাহা হইলে ভাব ও ভাষার এই নিগূঢ় ঐক্যের কারণ কি, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিতে পারে।

পল্লীগাথার প্রেমের আদর্শটা কি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রেমের জন্য অসাধ্য সাধন হইতেছিল— চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "সহজ সহজ সবাই বলয়ে"— অর্থাৎ তাঁহার সময়ে নরনারীর অবাধ প্রেম সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। পল্লীগানে যে স্বার্থশূন্য, পাপলেশবিরহিত, অতুল্য, জীবনপণ ভালবাসার কথা লিখিত হইয়াছে তাহা ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব-স্বরূপ সহজিয়ারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই প্রেমের বিচিত্র-লীলা-জ্ঞাপক কোমল ভাষা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পল্লীপ্রকৃতির বেল যূথি জাতি যেরূপ একটা বিশিষ্ট সম্পদ্, পল্লীগাথার কোমল শব্দগুলিও সেইরূপ আর একটি সম্পদ্। দাম্পত্যগৃহের নিভৃত নিকেতনে, জনকজননীকৃত শিশুদের আদর-আপ্যায়নে, অভিসারিকার মৃদু প্রেম-আলাপনে, খণ্ডিতার অভিমানজাত ক্ষুব্ধ আহত প্রেমের উচ্ছ্বাসে, শত শত প্রকারে এই কোমলকান্ত পদাবলী বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই পদাবলী রমণীরা কথায় কথায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে পল্লীকবি ও পদকর্ত্তা উভয়েই তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্যই এই আশ্চর্য্য ঐক্য। বঙ্গদেশের প্রেমসাধনা যে কিরূপ ব্যাপ্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা এই পল্লীগাথাগুলি বিশেষভাবে প্রমাণ করিবে। সেই তপস্যাজাত নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টা হইতে শত শত কথা বায়ু-তাড়িত শত শত কুসুমের ন্যায় বঙ্গের গৃহে গৃহে, কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পল্লীগীতিরচক ও বৈষ্ণব কবি সেই স্বদেশী উপাদান হইতে তাঁহাদের কাব্যকথা আহরণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের রচনায় এই ঐক্য— ইহারা কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে পল্লীর যেরূপ যোগ দৃষ্ট হয়—

সেরূপ অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখায় আমরা প্রেমের অপূর্ব্ব সাধনা যেরূপ পাইয়া থাকি—পল্লীজীবনের সঙ্গে তেমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সহজে আবিষ্কার করিতে পারি। পল্লী-অন্তরঙ্গতার দরুণ পল্লীগাথার সঙ্গে তাঁহার ভাব ও ভাষার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পল্লীকবিরা পল্লীর কথায়, পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে প্রেমের দেবতাকে উদ্‌বোধন করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস পল্লীর কাব্য-উপাদান সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া পল্লীপ্রাচীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পল্লীর প্রাণেশ্বর তাঁহার নিকট জগদীশ্বর হইয়াছেন। গৃহস্বামী, হৃদয়স্বামী তাঁহার কাছে—সার্ব্বভৌম জগদেকাবলম্বন,—নিখিল-বিশ্বের স্বামী হইয়াছেন। এইজন্য পল্লীগাথার আদর্শ যেখানে শেষ হইয়াছে—চণ্ডীদাসের আদর্শ সেইখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগাথার প্রেম সুরধুনী, বৈষ্ণব পদের প্রেম মন্দাকিনী। পল্লীগাথার কথা দেশ-বিদেশে—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে, য়ুরোপে ও জাপানে সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ার যোগ্য; কারণ তাহাতে মানুষেরই কথা আছে, দৈবলীলা নাই। যেখানে মানুষের হৃদয় আছে সেইখানেই পল্লীগাথা ঘা দিবে। এরূপ ত্যাগ, এরূপ বিশুদ্ধ উৎসর্গ সকলের হৃদয়ই মুগ্ধ করিবার সাধ্য রাখে। কিন্তু বৈষ্ণব পদ হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে, জনকোলাহল হইতে বহুদূরে স্থিত সমাহিত ভক্তি ও প্রেমের মন্দিরে আদৃত হইবে। চৈতন্যের কৃপায় এই সমস্ত বঙ্গদেশটা তেমনই একটা মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্বদেবতা জগতের সর্ব্বত্রই নীতির নিয়ন্তা; একমাত্র ভারতবর্ষে, বিশেষ বঙ্গদেশে—এ দেশের বহু সুকৃতির ফলে—তিনি লীলাময়। সেই লীলামাধুর্য্য বুঝিতে তথাকথিত সভ্যদেশের লোকেরা এখনও অনভ্যস্ত। পল্লীগাথায় ভগবানের লীলার আভাস কোনস্থানেই পাওয়া যায় না; অতি তুচ্ছ বৈষ্ণব কবিতায়ও তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র এই কারণেই আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি পল্লীগাথা ও বৈষ্ণব পদ—নানা কথার ঐক্য সত্ত্বেও—দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ এবং পল্লীগাথা বৈষ্ণবগণ্ডীর বাহিরে ও বৈষ্ণবপ্রভাব-বর্জ্জিত।

ময়নামতীর গানে আমরা দেখিতে পাই—রাণী অদুনা চুল বাঁধিতেছেন। একবার বেণী বাঁধিবার এমনই কৌশল দেখাইলেন যে, তাহাতে পূজারী ব্রাহ্মণের ছবি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেই চুল-বাঁধা পছন্দ হইল না। তখন আবার চুল বাঁধিতে বসিলেন, তাহাতে ক্রীড়াশীল শিশুদের মূর্ত্তি প্রকাশ হইল, আর একবার চুলের সজ্জায় বিকশিত কুসুম ও গুঞ্জরণশীল ভ্রমরপংক্তি দেখাইয়া দিলেন, এইভাবে চিত্রকরের ছবি আঁকার মত কতবার যে আঁকিয়া মুছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু ময়নামতীর গানে নহে, পালাগানের কোন কোনটিতে ও কোন-কোন মনসা-

মঙ্গলেও আমরা এইভাবে চুল বাঁধার ছবি দেখিতে পাই। অতুনা রাণী শাড়ী পরিতেছেন, প্রথম পরিলেন নীলাম্বরী,—নীলাভ নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী ঝলমল করিয়া উঠিল—তারপরে মেঘ-ডুম্বুর; তাহা একবারে গাঢ় কৃষ্ণ,— ইহাও পছন্দ হইল না, তখন পরিলেন গঙ্গাজলী,— একেবারে হরিদ্বারের নির্ম্মল শুভ্র গঙ্গাধারাকে জয় করিয়া সেই শাড়ীর স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইল,— এইরূপ করিয়া কতবার পেটিকা খুলিলেন এবং কত প্রকার দুর্লভ ও মহামূল্য শাড়ী বাহির করিয়া কোন্‌টি ঠিক তাঁহার শ্রীঅঙ্গের উপযোগী তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ শাড়ীর বিচার আমরা অনেক পালাগানে পাইতেছি— বৈষ্ণব কবিতায় যতুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে রাধিকার পরিচ্ছদপরিধান উপলক্ষ্যে এই বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখিতে পাইতেছি।

সুতরাং মনে হয়, নারীগণের পেটিকার বহু শাড়ীর ন্যায় এবং চুল বাঁধিবার নানা কৌশলের মত, বাঙ্গালার পল্লীভাষার ভাণ্ডারে, এরূপ সকল নির্দ্দিষ্ট সাজানো কথা ছিল যে কবিগণ পুনঃ পুনঃ যথাসময়ে তাহাদের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের নায়িকাগণের ছবি আঁকিয়াছেন, এইভাবে বেশবিন্যাস ও চুল-বাঁধা হইতে সুরু করিয়া বিবাহের ঘটকালী ও বঙ্গনারীর পুকুরঘাটে স্নান প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঘরে ঘরে কতগুলি সাজানো কথা ছিল। যে কোন পল্লীকবি পালাগান রচনা করিতে বসিতেন, এই জাতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তিনি ভাষায় এই চলিত কাব্য-কথাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না।

সুতরাং পল্লীকবি ও বৈষ্ণবেরা— একই কথা-ভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালার পল্লীসম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়াছেন। কি চট্টগ্রাম, কি শ্রীহট্ট, কি ময়মনসিংহ, কি রাঢ়, কি বঙ্গ— সমস্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রূপ থাকা সত্ত্বেও— রচনাভঙ্গীতে এবং ভাবের ঐক্যে বাঙ্গালাভাষা একটা বিস্তৃত মহাদেশের সাধারণ ভাষা ছিল। আমরা সংক্ষেপে পালাগানগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

মহুয়া, ধোপার পাট, মঞ্জুর মা, শ্যামরায়, আঁধা বঁধু, প্রভৃতি কয়েকটি গীতিকা এক পংক্তিতে স্থান পাইবে— ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে একটা নাট্যকৌশল আছে। কবিগণ বাদসাদ দিয়া শুধু সেই সকল ঘটনা ও দৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন, যাহাতে কাব্যকথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পর পর ঘটনার বিবৃতিতে নাট্যকলা প্রস্ফুট হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয় মনোজ্ঞ হইয়াছে ও চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঝড় যেমন ফুলের কুঁড়িটি উড়াইয়া লইয়া যায়, মহুয়া, কাঞ্চনমালা, ও মঞ্জুর মা— এই তিন পরমাসুন্দরী রমণীকে ঘটনার আবর্ত্ত তেমনই জোরের সহিত

তাহাদের অদৃষ্টের পথে লইয়া গিয়াছে। বেদের মেয়ের সংযম অসাধারণ—যে ব্রাহ্মণকুমারের জন্য সে আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মৃত্যুর মুখে পতনোন্মুখ—সে তাহারই ইষ্ট স্মরণ করিয়া তাহাকে প্রথমতঃ ধরা দেয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রতি ভালবাসা রাজকুমারের একটা খেয়াল মাত্র। এই খেয়ালের প্রশ্রয় দিলে রাজকুমার বিপদের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিবেন, অথচ যেদিন তাঁহার চোখে খেয়ালের ঘোর কাটিয়া যাইবে—সেদিন তিনি দেখিতে পাইবেন, তিনি জাতিছাড়া—সম্পত্তিহারা ফকির সাজিয়াছেন। রাজকুমারের ইষ্ট স্মরণ করিয়া বেদের বালিকা স্বীয় হৃদয়ের অসীমপ্রেম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেদিন বুঝিল, তাঁহার প্রেম খেয়াল নহে, তাহা প্রকৃতই মণি—কাচ নহে, পিত্তল নহে, খাঁটি সোনা—সেদিন স্ফূর্ত্তির সহিত বেদের বালিকা পাহাড়িয়া ঘোড়ায় চড়িয়া—অসীম ও জটিল বন্যপথে ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রালোকিত নদীতীরে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন কি মধুর, শেষরাত্রে উভয়ের ঘোটকারোহণে পলায়ন কি নির্ভীক! ঝরণার জল পান করিয়া রক্ত পুষ্পারণ্যে যখন প্রেমিক-যুগল কংস নদের তীরে ঘুরিতেছে—তখন বিশ্বের সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে যেন আশ্রয় করিয়াছে। মহুয়া ভুজঙ্গজড়িত পদ্মলতার ন্যায় বিপৎকালে কি ভীষণ! স্বামীকে কাঁধে রাখিয়া পার্ব্বত্যপথে মহুয়ার আনন্দযাত্রা, সতীদেহবাহী মহাদেবের নৃত্য হইতেও অধিক বিস্ময়কর। কি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সে বণিকের জাহাজ পরশুর আঘাতে দীর্ণবিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলিতেছে! বণিকের মুখর ও চঞ্চল প্রেমের বাচালতার উত্তর না দিয়া সে কি অপূর্ব্ব চাণক্যনীতি অবলম্বন করিয়া পান সাজিতে বসিয়া গিয়াছে! মৃত্যুকালে পিতার নিকট সে প্রেমের কথা কি নির্ভীক কি তেজস্বী ও কি করুণ ভাবের উত্তর দিয়াছে! এই মহীয়সী রমণীর চরিত্র নানাগুণে বিস্ময়কর। যেখানে বিপদ্ সেইখানেই তাহার উদ্ভাবনী শক্তি। সে ব্রাহ্মণকন্যা শুদ্ধা একব্রতা; সে বেদিয়ার পালিত কন্যা—এই জন্য সে বনে বনে বন্য-মার্জ্জারের ন্যায় ক্ষিপ্র, বিপদে বন্যব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ,—হায়! আমাদের গৃহে গৃহে এইরূপ কোমল ব্রততী অথচ এরূপ প্রলয়-মেঘের বিদ্যুৎ কবে আবির্ভূত হইবে? মহুয়ার মত রমণী বঙ্গসাহিত্যে বিরল। সে যেমনই অরণ্যজীবনের উপযোগী তেমনই গৃহিণীর গুণপণায় অভ্যস্ত। এই বন্যসীমন্তিনীর গৃহস্থালীও আমাদিগকে কম চমৎকৃত করে না—নদের চাঁদকে ভাত খাইতে দিতে না পারিয়া ভাঙ্গা মন্দিরে বসিয়া সে যে দুঃখাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের কোমলতা সুব্যক্ত। স্বামী যখন বাজারে যাইতেছে, তখন মহুয়া তাহার কানে কানে তাহার জন্য নথ আনিতে বলিয়া দিতেছে—স্বামী যেদিন পীড়িত সেদিন মহুয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া

মাথায় হাত বুলাইতেছে— যেদিন নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে সেদিন মহুয়া তাহার আরোগ্যকামনায় দেবতার নিকট কালা ও ধলা ছাগ মানৎ করিতেছে। এক দিকে বন্য, উদ্দাম, তেজে ভরা একটা বিদ্যুৎ ; অপর দিকে ব্রাহ্মণ্যনিষ্ঠা ও সারল্য —দুর্ল্লভ ! এই মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা উজ্জ্বলরূপা দাক্ষায়ণী সতী— এই পরদুঃখকাতরা অন্নপূর্ণার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে কেন অপর কোন সাহিত্যেও সহজে মিলিবে না।

কিন্তু এই পালার গৌরব এক মহুয়া বা নদের চাঁদের চরিত্রেই শেষ হইয়া যায় নাই। পটক্ষেপ না হইতেই আর একটি নিরাভরণা অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, দেবতার ন্যায় পরদুঃখকাতরা রমণীর ছবি আমরা এই বিয়োগান্ত রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই ! সেই নিঝুম বনপ্রদেশে সকলে নির্জ্জন সমাধিটি ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পালঙ্ক একটি পুষ্পিতা লতিকার ন্যায় সমাধিটিকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়া গেল। তাহার অশ্রুবিন্দু শরৎ-শেফালীর ন্যায় সেই সমাধির উপর নীরবে বর্ষিত হইত— সে একা একা গান গাহিত— "নিষ্ঠুর বেদেরা আর তোমার অনুসরণ করিবে না, এবার জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের প্রেমলীলার অভিনয় কর, দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি, আমি তোমাদের জন্য যে ফুলের চারা রোপণ করিয়াছি, তাহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে— সেই ফুলের মালা তোমাদিগকে পরাইয়া চক্ষু জুড়াইব।" এই বিয়োগান্ত গীতিনাট্যের মর্ম্মবিদারক শেষ দৃশ্যে এই মহীয়সী মহিলার রূপ আমাদিগের হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় ভাগে 'ধোপার পাট' অনেকটা 'মহুয়া'র মতই গল্পের আটসাট বাঁধুনীতে ও একান্ত বাহুল্যবর্জ্জিত কলানৈপুণ্যে নাট্যশ্রী-পরিশোভিত হইয়াছে। মহুয়া ধোপার পাটের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং ধোপার পাট চণ্ডীদাসের সমকালিক কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়— যেহেতু ধোপার পাটের ভাষা ও ভাব চণ্ডীদাসের যুগের বেশী নিকটবর্ত্তী ও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রথম অধ্যায় পাঠ করিবার সময় আশঙ্কা হয়, বুঝি পল্লীকবি শীলতার সীমা কতকটা অতিক্রম করিলেন। কিন্তু এই কবিগণের নৈতিক আদর্শ এত উচ্চ যে ক্ষিপ্র-গামী জেলেডিঙ্গির নাবিকের ক্ষেপণী যেরূপ ডুবন্তপ্রায় নৌকাকে অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, এই সকল পল্লীকবিরাও শীলতার বাঁধ অতিক্রম করিতে করিতে যেন অসামান্য সংযমের দ্বারা লেখনীকে সাবধান করিয়া নির্ম্মল রসধারা রক্ষা করিয়া থাকেন।

ধোপার পাটের কাঞ্চনমালা আশঙ্কার সহিত— ভয়ের সহিত দুর্গম প্রেমপথে অগ্রসর হইতেছেন। এক দিকে দেখিতে পাই রাজকুমারের নির্ভীক সংযমহীন উদ্দাম

চরিত্র। তিনি রাজার পুত্র, জীবনে তাঁহার কোন ইচ্ছাই বাধা মানে নাই, তাঁহার প্রবৃত্তিগুলি দুরন্ত বন্য ঘোটকের মত পথ বিপথ না মানিয়া— ভবিষ্যৎ গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়াছে— তাহা রাশ মানে নাই, তাঁহার দুর্নিবার গতি-প্রবৃত্তির মুখ বল্গা দিয়া ফিরান যায় না ; অন্য দিকে ভীরু বালিকার দ্বিধাপূর্ণ পাদক্ষেপ— ভয়শঙ্কিত গতি, শঙ্কাচকিত দৃষ্টি, যাহাকে পাওয়া তার পক্ষে শিশুর চাঁদ ধরা অপেক্ষাও অসম্ভব, সেই অসম্ভব সুখ হাতের মুঠোর মধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও বালিকার বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছে। বালিকার এই সংযত অথচ দুরাশাপূর্ণ প্রেম আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রসের ভাষায় মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজকুমার ও ধোপার মেয়ে গৃহত্যাগী হইলেন। মন্থরগামিনী; দ্বিধাচকিতা— শরাহতা হরিণীর মত গৃহত্যাগদুঃখকাতরা বালিকার নৈশপর্য্যটন কি সুন্দর! কি করুণ! বালিকা বলিতেছে— কাল প্রাতে সূর্য্য উঠিবে, কিন্তু আমাদের পল্লী-তরুরাজির শীর্ষ আলোকিত করিয়া সূর্য্যোদয় যেমন দেখিতাম— আর তেমনটি দেখিব না। খোয়াই নদীকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিয়াছি। পল্লীর আত্মীয়গণের সঙ্গে শেষ আলাপ করিয়া আসিয়াছি, তাঁদের সঙ্গে সুখসম্পর্কের বাঁধন চিরতরে ছিঁড়িয়া আসিয়াছি। পিতামাতার কথা ভাবিতে কতবার কাঞ্চন প্রাণাধিক রাজকুমারের স্বর্গীয় সঙ্গলাভ করিয়াও কাঁদিয়া উঠিতেছে।

রাজকুমারের খেয়াল বড়লোকের সখের মতই ; সহসা জ্বলিয়া ওঠে এবং সহসা নিবিয়া যায়। উহা খড়ের আগুনের মত, অতি ঘটা করিয়া প্রকাশ পায় এবং শেষে ছাই হইয়া ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেও দেরি হয় না। কুক্ষণে কাঞ্চন রুক্মিণীর কাছে নিজ পরিচয় দিয়াছিল— যে কুমার একদিন ধোপার মেয়ের ধোওয়া কাপড়ে তাহার পাঁচটি আঙ্গুলের সুগন্ধি দাগ দেখিয়া ভ্রমরের মত মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রমরের মতই কাঞ্চনপুষ্পটিকে ছাড়িয়া রুক্মিণীপুষ্পে আকৃষ্ট হইলেন।

তারপর কি নিদারুণ নৈরাশ্যের ইতিহাস— সে করুণ বারমাসী পাঠ করিতে পাঠকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। হতভাগিনী তখনও দুরাশা ছাড়ে নাই— রাজকুমার আমার জন্য কত হীরা মণি লইয়া আসিবেন, দরিদ্র আমি তাহার প্রতিদানে কি দিব ? আমার দুটি চোখের জলের দাম দিয়া তাহা কিনিয়া লইব। এক একটি মাস তাঁহার মন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় দাগিয়া দিয়া চলিয়া গেল, বার মাস অতিবাহিত হইল— তের মাসের শেষের দিনে কাঞ্চন নিজগৃহের প্রদীপটি ফুৎকারে নিবাইয়া অন্ধকারে নিজেকে ঢাকা দিলেন।

তারপর তমসাগাজির বাড়ীর দৃশ্য— সেখানকার এত স্নেহযত্ন পাইয়াও বালিকার হৃদয়ের হারানো স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল না। ছিন্নবৃন্ত কুসুমের কাছে মৃদু সমীরের স্নেহকথা, বা অরুণকিরণের উষ্ণত্ব নিষ্ফল। তমসাগাজির পর্য্যটনবৃত্তান্তটি অল্প কথায় কৌতূহলপ্রদ ও বিচিত্র, সেই প্রসঙ্গে হঠাৎ বালিকা যখন তাহার শোকার্ত্ত পিতার কথা শুনিল, তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া তমসাগাজির পায়ে ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বিরহবিধুরার করুণ শেষ দৃশ্য মর্ম্মান্তিক, নদীর জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য সে গিয়াছে— তাহার তৎকালীন জীবনের চূড়ান্ত সুখ রাজকুমারের শেষ দর্শন সে পাইয়াছে— আর তার কোন সাধ নাই। সে রাজকুমার ও রুক্মিণীর মিলনদৃশ্য দেখিয়াছে, এক দিকে রাজপুত্র অপর দিকে রাজকন্যা, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন— ধোপার মেয়ে হইয়া রাজরাণী হওয়ার আশা বৃথা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস বৃথা, গোবরের পোকা হইয়া পদ্মের আশা বৃথা। সে মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রার্থনা করিতেছে— তাহার মৃত্যুর কথা যেন রাজকুমার না শোনেন। নবসুখোন্মত্ত কুমারের চিত্তে কাঞ্চনের মৃত্যুসংবাদ হয়ত সামান্য একটু বিষাদ আনিতে পারে— সে দুঃখটুকুও কাঞ্চন তাঁহাকে দিতে অনিচ্ছুক, এজন্য সে বায়ুকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'— নদীর তরঙ্গকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'— নদীর ধারে রাজকুমার যে এক সময় কাঞ্চনের জন্য পুষ্পশয্যা করিতেন, তাহার দাগ এখনও আছে, বংশীর সুরে তাহাকে ডাকিয়া আনিতেন— স্বর্ণপালঙ্কে অভ্যস্ত কুমার তাহার প্রেমে মাটীর উপর পাতার বিছানা এক সময়ে লোভনীয় মনে করিতেন, সারারাত্রি জাগরণের পর কাঁচা ঘুমে তিনি উঠিয়া যাইতেন, কাঞ্চন প্রভাতকালের ঘুমটুকু ভাঙ্গাইয়া তাঁহার কাছে বিদায় লইতে বাধ্য হইত। সেই শত অতীতের কথা মনে করিয়া কাঞ্চন একটিবার চোখের জল মুছিল, একটিবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর শত-তরঙ্গোত্থিত বুদ্‌বুদের ন্যায় আপনি একটি বুদ্‌বুদ নদীনীরে মিশিয়া গেল। এক একটি ছোট ছোট অধ্যায়ে এক একটি চিত্র সম্পূর্ণ, কাঞ্চনের পিতার উপদেশগুলি পলোনিয়াসের উপদেশের মত— অল্প কথায় বহুদর্শী জীবনের অভিজ্ঞতা, কি সুন্দর ও হিতকর!

কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখা

এ দুইটি রূপকথা। উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পালা দুইটির সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য— এই দুই রূপকথায় প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। রূপকথা হইলেও এই উন্নত আদর্শ আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া যায় নাই। ভারতনারীর

একনিষ্ঠ প্রেম ও পাতিব্রত্য— এই দুই রূপকথায় প্রদর্শিত হইলেও ইহা শুধু গল্পের বিষয় নহে। যে দেশের মহিলারা স্বেচ্ছায় স্বামীর জলন্ত চিতায় স্বীয় দেহ আহুতি দিয়াছেন— যাঁহারা সেবার দৈন্য, উৎকট কষ্টে আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা বরণ করিয়া লইয়া আমাদের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত— যাঁহাদের নিবাস হোমানলের ন্যায় এ দেশের বাতাসকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে— যাঁহাদের পদরজঃ এ দেশকে কাশী ও বৃন্দাবনের মাটীর পবিত্রতা দান করিয়াছে— সেই মহিলারা এ দেশের রূপ-কথার নায়িকা হইলেও, ঐতিহাসিক চিত্রের ন্যায়ই জীবন্ত। সুতরাং কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখাকে কেহ যেন অসম্ভব আদর্শ মনে না করেন। রূপকথার কাঞ্চনকে যেন কেহ ধোপার পাটের কাঞ্চন বলিয়া ভুল না করেন। দুইটি ভিন্ন চরিত্র।

কাঞ্চনমালা শেষ অধ্যায়ে যে পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছিলেন, সেরূপ পরীক্ষায় সীতা-সাবিত্রী হটিয়া যাইতেন কিনা জানি না— অন্ততঃ অগ্নি-পরীক্ষা হইতে সে পরীক্ষা যে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সপত্নীর অত্যাচারে কাঞ্চনমালা নির্ব্বাসিতা— সপত্নী তাঁহাকে ডাইনী প্রতিপন্ন করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্বামী তাঁহার শোকে অন্ধ হইয়াছেন —সন্ন্যাসীর নিকট কাঞ্চনমালা স্বামীর চক্ষে দৃষ্টিদান চাহিল। "আমার সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ কর— তাহাতে যদি না সন্তুষ্ট হও, তবে আমার চক্ষু গ্রহণ করিয়া উঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দাও।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি পারিবে? যাহা বলি তাহা করিতে পারিবে?"

নির্ভীক বীরত্বের সহিত কাঞ্চনমালা বলিল, "স্বামী চক্ষু পাইবেন, তজ্জন্য যাহা বলিবেন— তাহাই করিব, তাহা পারিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই ফলটি লও,— তোমার সপত্নী ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে— তাহাকে ফলটি দিয়া আইস— কিন্তু এই ফলের সঙ্গে তোমার রাজপ্রাসাদ তাহাকে দিয়া বিদায় লইতে হইবে। আর ফিরিয়া এখানে আসিতে পারিবে না।" এ ত্যাগ —সহজ, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর একটু প্রতীক্ষা কর, শুধু রাজপ্রাসাদ নহে— তাহার সঙ্গে তোমার স্বামীকেও তাঁহাকে দিতে হইবে— তুমি স্বামীকে আর পাইবে না,— তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এই শেষ।" কাঞ্চন কাঁপিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,— "এই দান তোমাকে করিতে হইবে, যদি দান করিবার সময় তোমার চক্ষের জল পড়ে, কিম্বা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হয়— তবে তোমার স্বামী অন্ধ থাকিয়া যাইবেন— এই মহাদান যদি করিতে পার, তবে তোমার স্বামীর চক্ষু ভাল হইবে।"

স্বামীর ইষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়া ত্যাগশীলা বুকে পাষাণ চাপাইয়া ফল হস্তে সপত্নীর কাছে অগ্রসর হইতেছেন— তাহার পদ চলিতে চাহে না, সে পদভরে বুঝি মেদিনী কাঁপিয়া ফাটিয়া যাইত। কিন্তু সে পাদক্ষেপ কি সংযত !— সুখদুঃখের সীমার পরপারে যে নিস্তব্ধ ইন্দ্রিয়বিকারহীন পরম আত্মপ্রসাদ ও শান্তি— কাঞ্চন সেই দিকে লক্ষ রাখিয়া ছুটিতেছেন, পাষাণের মত কঠোর হইয়া তিনি স্বামীর ইষ্টকে বরণ করিয়া নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন— তাঁহার মুখে প্রসন্নতা নাই, অপ্রসন্নতা নাই, তাঁহার চোখে একবিন্দু জল নাই, তাঁহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ— ইন্দ্রিয়ের অধিকার অতিক্রম করিয়া দৈহিক সুখ পদদলিত করিয়া মানুষী কিরূপে দেবী হইতেছেন একবার দেখুন। যে শিশু-স্বামীকে তিনি বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, যে স্বামীকে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া চোখে হারাইতেন, দুর্দ্দিনে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ক্রোড়ে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া— পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আঁচল দিয়া তাঁহার কোমল দেহকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিয়া চলিতেন— নিজে ভিজিয়া যাহাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেন— যাহাকে হারাইয়া তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি হারাইয়া জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন— সেই স্নেহ-পাগলিনীর নয়ন পুত্তলী— কৃপণের গুপ্ত রত্নভাণ্ডার, পুনঃপ্রাপ্ত হারানিধিকে তিনি জন্মের শোধ সপত্নীকে দিয়া যাইতেছেন— এই মহা-ভিক্ষুণীর ত্যাগের দৃশ্য দেখুন, বুঝিবেন— বুদ্ধদেব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কতবার অবতীর্ণ হইয়া নারীরূপে, পুরুষরূপে, ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা পুঁথির শালা খুঁজিলে দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে দাতাকর্ণের পালা অনেকগুলি। শিশুর মস্তক নিশ্চল করে করাত দিয়া দানশীল পিতামাতা কর্ত্তন করিতেছেন। মহাভারতে কর্ণের এই দানবৃত্তান্ত নাই। বৌদ্ধযুগে মানুষের মহৎ গুণরাশির চূড়ান্ত অনুশীলন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যের পুনরভ্যুত্থানে জপ-তপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে— নামের প্রভাব দেখাইতে আদর্শ ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এবং তৎসঙ্গে ক্ষুদ্রতর অনেক আদর্শ যথা লাউসেন শ্রীমন্ত প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধযুগ ত্যাগের শীল-মোহর করা। মানুষ নিজের সুখকে ত্যাগ করিয়া ইষ্টকে বরণ করিয়াছে— কিন্তু এই যে কাঞ্চনমালার অনুরাগমূলক ত্যাগ ইহা শুধু সুখত্যাগ নহে, ইহা প্রিয়ের ইষ্টের জন্য সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ ; চণ্ডীদাস রাধার মুখে বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি।" এত বড় কথা বাঙ্গালী ভিন্ন কেহ বলিতে পারে নাই— কাঞ্চনমালা এই কথার দৃষ্টান্ত। ফলের সহিত নিজের রাজ্য এবং তৎসহ স্বামীকে দান করিয়া অশ্রুহীন চোখে কাঞ্চন ফিরিয়া যাইতেছেন— আর তাঁহার ফিরিয়া একটিবারও

তাঁহাকে দেখিবার অধিকার নাই। যে স্বামীকে ছাড়া কাঞ্চনের কাছে জগৎ আঁধার, স্বর্গ শ্রীহীন, কাঞ্চন দেখাইয়া গেলেন— সেই স্বামীর ইষ্টই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ইষ্টের মধ্যেই তিনি অনন্ত আনন্দ আবিষ্কার করিলেন। কবি শেষ ছত্রে বলিতেছেন, এ পরীক্ষা বড় কঠিন পরীক্ষা, রমণী হইয়া কাঞ্চন তাহা পার হইলেন, পুরুষ হইলে হয়ত পারিতেন না— এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতার জন্য অবলা হওয়া সত্ত্বেও রমণীকে "শক্তি" নাম দেওয়া হইয়াছে।

যেখানে নিদ্রিতা কাঞ্চনমালাকে দেখিবার জন্য কুমার চুপে চুপে দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছেন, কখনও তাঁহাকে গোপনে বাতাস করিতেছেন, নিভৃতে সেবাগ্রহণ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার ঈর্ষা প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে— সেই সকল স্থানে কবি মনস্তত্ত্ব-বিচারের যে অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিরক্ষর পল্লীবাসীর হস্তে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

এই শ্রেণীর আর একটি রূপকথা কাজলরেখার গল্প। জগতে দৈব বলিয়া একটি জিনিষ আছে। অনেক সময় দেখা যায় পার্থিব প্রচণ্ড শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া এই দৈব তাহার জয়ধ্বজা উত্তোলন করে। সংসারের সমস্ত ক্ষমতাকে এই দৈব বিফল করিয়া ফেলে। এই দৈবের ক্রীড়া শুধু সূক্ষ্ম নহে— দুর্জ্ঞেয়। অনেক সময়ে নির্দ্দোষী ব্যক্তি চরম শাস্তি পাইতেছে; যাঁহার চরিত্রে কলুষলেশ নাই তিনি দস্যু ও চোরের ন্যায় শাস্তি পাইতেছেন; কত ক্রাইষ্ট জগৎকে ভালবাসিয়া জগতের হাতে দণ্ড পাইতেছেন। কত যুধিষ্ঠির, কত নল পাশায় হারিয়া সর্ব্বস্বহারা হইতেছেন। কত দুঃশাসন, দুর্য্যোধন ও শকুনী এই দৈবের দ্বারা বলশালী হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিতেছে। দেবোপম প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিরা চোরের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। রামায়ণে লক্ষ্মণের আস্ফালনকে নিরস্ত করিয়া রাম বলিয়াছেন, "এখন পুরুষকার দেখাইবার সময় নহে— কারণ, দেখিতেছ না দৈব আমাদের প্রতিকূল? যদি বল 'দৈব কি?' তাহার উত্তরে বলিব— প্রত্যাশিত অবস্থা না ঘটিয়া— যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা কখনও সম্ভবপর নহে, ইহাই যদি ঘটে— তবে জানিবে তাহা দৈব। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলেও কিছু করিতে পারিবে না। দশরথ রাজা আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন— কৈকেয়ী আমার নিজ মাতা কৌশল্যা অপেক্ষাও আমাকে অধিকতর স্নেহ করেন। ইহাঁদের মত উপকারী আমার জগতে নাই। তাহা সত্ত্বেও ইহাঁদেরই দ্বারা আমার এরূপ অনিষ্ট কেন হইতেছে? লক্ষ্মণ, বুঝিতে পারিতেছ না, প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক যাহা তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল— অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব হঠাৎ আসিয়া সমস্ত উলট পালট

করিয়া গেল— ইহাই দৈব।" এই দৈব একদিন বুঝিয়াছিলেন— মুদ্রারাক্ষস মন্ত্রী, এই জন্য শেষ অঙ্কে তিনি প্রবল ষড়যন্ত্রের মুখে পড়িয়া নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন, দিবালোকবৎ সত্য প্রমাণাভাবে মিথ্যা হইয়া গেল। বোধ হয় এই জন্যই ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন— Resist not evil। ইহা আশ্চর্য্য হইলেও জগতে এই দৃশ্য বিরল নহে। তুমি যাহা স্পষ্ট জান, তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে প্রতিপক্ষীয়গণ অমাবস্যা প্রমাণ করিবে। আদালতের বিচারে সর্ব্বদা এই অঘটন ঘটিয়া থাকে। এইরূপে দৈব প্রতিকূল হইলে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিও— তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইও না। দৈবদোষে শেফালিকা ও রজনীগন্ধা স্বীয় শুভ্রতা প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

কাজলরেখা পৃথিবীর অন্যায় এইরূপ বুক পাতিয়া সহিয়াছিলেন। তিনি সত্যকে প্রমাণ করিবার জন্য একটুকুও চেষ্টা করেন নাই। যে বিপদ্ আসিয়াছে তাহা আপনা আপনি না কাটিয়া গেলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার-চেষ্টা খাটিবে না। এই দৈবকে অন্ধশক্তি বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা অন্ধ নহে। আমাদের প্রকৃতিগত কিম্বা জন্মজন্মান্তরাগত এমন কোন দোষ আছে যাহার জন্য আমাদের এ দণ্ড পাওয়ার দরকার— এই দৈব সেই দণ্ড। নিজের নির্দ্দোষিতার দ্বারা এ ক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি কোন দিন এ জীবনে কাহাকে হত্যা করে নাই, বড় বড় বিচারক টুপি মাথায় পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন যে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে— সুতরাং তাহারই ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন ঘটনায়ও এই দৈবের ক্রিয়া দেখিতে পাই— যে কাজ করি নাই তাহারই অপরাধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমি দোষী নহি। পুরুষকার দ্বারা বুঝাইতে গেলে ফল উল্টা হইয়া যায়— এইটি আরও বেশী প্রমাণ হইয়া যায় যে আমিই দোষী।

তখন সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। যখন দেখিলাম বুঝাইতে চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত হয় তখন সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া বুক পাতিয়া সেই দণ্ড গ্রহণ কর। ওষ্ঠাধর চাপিয়া নিজ সমর্থনের কথা গোপন করিয়া যাও, তুমি যদি সহিয়া থাক তবে দুঃখের রাত্রি এক সময়ে পোহাইবে, কিন্তু রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সূর্য্যকে ডাকিয়া আনিতে পারিবে না। যে সহে সে রহে। কাজলরেখার পালায় জগতের এই নীতির নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কাজলরেখার সহিষ্ণুতা— আশ্চর্য্য। এই পরমকষ্টসহ অদ্ভুত এবং মহিমান্বিত নারী-প্রকৃতির নিকট স্বভাবতঃই আমাদের মস্তক নোয়াইয়া পড়ে। কাজলরেখা

কষ্টসহিষ্ণু নহে, তাহার মত ক্ষমাশীলা কে? কঙ্কণদাসী যখন তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, তখন কাজলরেখা আঁচলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, দানবীর পায়ে দেবী লুটাইতেছে— অথচ তাহাতে এক বিন্দুও কপটতা নাই।

কাজলরেখার চরিত্রের এই নিয়তির-প্রতীক্ষা-জনিত অতুলনীয় ধৈর্য্য আমরা কমলার চরিত্রে দেখিতে পাই। কমলার ধৈর্য্য যেরূপ অপূর্ব্ব, তাহার প্রতিভা মনস্বিতা এবং নারীমর্য্যাদার অভিমানও সেইরূপ অপূর্ব্ব। মাতুলালয় হইতে দর্পিতা রমণী ঘনায়িত নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি উল্কার মত জলিতেছেন, স্বয়ং পুড়িতেছেন এবং চলিতেছেন। একবার কমলা ভাবিলেন না— সেই নৈশ আঁধারে নিবিড় হাওরের পথে— অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে সে পন্থাহীন আশ্রয়হীন— কে তাহার সহায় হইবে? কোথায় রাত্রি কাটাইবে— কোথায় কাহার শরণ লইবে? নৈশাকাশের নক্ষত্ররাজি তাহাকে একটুকু দীপ্তি দান করিয়া দেখাইল না— তথাপি সে চলিল— হায়, বাঙালী যদি শত অপমান মাথায় বরণ না করিয়া সেইভাবে চলিতে পারিত, তবে বোধ হয় আশ্রয় পাইত। আমরা প্রতি পদে ভীত, কমলা প্রতি পদে নির্ভীক। সে যখন বুঝিল যে গৃহে সে আছে সেখানে আর তাহার থাকা চলে না— তখন লাথি গুঁতো হজম করিয়া পদদলিত কীট হইয়া সেখানে আর পড়িয়া থাকিল না। সে বুঝিল সমস্ত জগৎটা গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই। তাহার আরাধ্য বনদুর্গার অধিকার সেই মাতুলালয়ে নিবদ্ধ নহে— অত্যাচার অপমান না সহিয়া কমলা যে ভাবে অভিমান করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ মহিষালের নিকট আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহা যেমন করুণ তেমনই মহৎ।

এই ধৈর্য্যশালিনীর ধৈর্য্যের সীমা নাই। রাজগৃহে নরবলি হইবে। তাঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ সহোদরের বলি হইবে। কমলা তাহা শুনিলেন; অন্য কোন রমণী হইলে চীৎকার করিয়া রাজপ্রাসাদ ফাটাইয়া দিতেন। কিন্তু কমলা পাষাণময়ী বিগ্রহ, কঠোর ধৈর্য্যের বর্ম্ম পরিয়া রাণীর পরিচারিকার কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তিনি রাজ্ঞীর গায়ে তৈল মাখাইলেন, তাঁহার স্নানের জন্য কলসী পূর্ণ করিয়া জল রাখিয়া দিলেন। কালীপূজার ঢাকের শব্দে যখন তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল— তখনও তিনি বাহিরে স্থির গম্ভীর, এমন-কি রাজকুমার কাছে আসিলেও এই নিদারুণ শোক-প্রসঙ্গের কোন কথা তুলিলেন না। রাজসভায় তিনি নিজের মকর্দ্দমার উকীল নিজে হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল জঘন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে— তাহা গৃহস্থ ঘরের লজ্জাশীলা রমণী কহিবেন কিরূপে? তিনি তাহা নিজে কিছুই কহিলেন না।

কেবল শৈশব ও কৈশোরে পিতামাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া যে সুখের জীবন কাটাইয়াছিলেন তাহার মধুর কাহিনী করুণায় অভিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন বিগলিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপর জীবনে যে ভীষণ দুর্য্যোগ আরব্ধ হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করিলেন কতক সাক্ষীদিগের কথা দ্বারা— কিন্তু অধিকাংশ চিঠি পত্র দিয়া— রাজসভায় তিনি যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, সান্ধ্যতারা ও নিজের চোখের জলকে সাক্ষী মান্য করিয়া যে ভাবে পাপিষ্ঠ কারকুণের ভীষণ প্রতারণা ও মিথ্যাচরণকে দিবালোকবৎ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা এক দিকে বড়ঘরের কুলললনার পদোচিত মর্য্যাদা ও সংযম অপর দিকে মহীয়সী প্রতিভাদীপ্তা অলোকসামান্যা রমণীর বুদ্ধি ও তেজস্বিতার মহিমা পদে পদে দেখিতে পাই। তাঁহার রাজবাড়ীর অজ্ঞাতবাসটি তাঁহার চরিত্রকে অতি শোভন করিয়া দেখাইয়াছে। সেই জীবনের উপর বঙ্গের সমস্ত পল্লীসৌন্দর্য্য যেন প্রতিফলিত হইয়া উহা করুণার একখানি জীবন্ত চিত্রপটে পরিণত করিয়া দেখাইতেছে।

মলুয়া— গল্পটি আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ নহে। ইহা একটি ধারাবাহিক কাহিনী, মহুয়া ও ধোপার পাটে যে নাট্যকৌশল দেখিতে পাই মলুয়াতে তাহার একান্ত অভাব। কবি একটা গল্প বলিয়া গিয়াছেন কাব্যের ধরণে; নাটকীয় ধরণে নহে। তিনি অনেক চিত্র গোপন করিয়া শুধু বাছিয়া সুন্দর সুন্দর উপাদানগুলি কৌশলে অবতারণা করেন নাই। চাঁদবিনোদের বিবাহ পর্য্যন্ত পালাগানটির একটি অধ্যায় —কাজির অত্যাচার, মলুয়ার মৃত্যু পর্য্যন্ত আর একটি অধ্যায়— এই দুই অধ্যায় কোন স্বর্ণসূত্রে আবদ্ধ নহে। এই দুই অংশ-দ্বারা দুইটি পৃথক পালাগান রচিত হইতে পারিত। প্রথম অধ্যায়-বর্ণিত ঘটনার খুঁটিনাটি দেখিতে পাই— এই অধ্যায়েও তাহাই পাওয়া যাইতেছে— ঘটক যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহের প্রস্তাব একবার ভাঙ্গিয়া পুনরায় গড়িয়া উঠিতেছে, নানা স্থান হইতে প্রস্তাব আসিতেছে, কন্যার পিতার মন উঠিতেছে না। বিবাহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের বর্ণনা, স্ত্রীলোক— বিশেষ এয়োদের সংঘট্ট এবং আলাপ— এই সমস্ত বর্ণনায় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে না থাকিলেও কোন প্রসঙ্গই কৌতূহলরস-বিহীন নহে।

কিন্তু কবির শক্তি যে অসামান্য তাহা এই প্রথম অধ্যায়েরও দুই তিনটী স্থানে বিশেষ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চাঁদবিনোদ ধান্যক্ষেত্রে কাস্তে হস্তে যাইতেছেন, বারমাসী গান গুন্ গুন্ স্বরে গাইতে গাইতে চলিতেছেন—

পাঁচ গাছি বেতের ডুগুল হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।

এই দুইটি ছত্রে কৃষক নায়কের চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেন্দির বেড়াতে ঘেরা কলাবনের কাছে—এঁধো পুকুর-ঘাটে বর্ষায় কদম ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেয়ার স্নিগ্ধ বাস প্রাণ পুলকিত করিতেছে— সেইখানে চাঁদবিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রথম দেখা। হঠাৎ মনে হইল কবি কালীর দাগে মনের কথা না বুঝাইয়া এখানে স্বর্ণলিপি লিখিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বরাগের এমন মধুর দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

মলুয়ার মধুর মূর্ত্তি ক্রমশঃ মহীয়সী হইয়া উঠিল। বিপদ্ তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্কেই বিষম পরীক্ষার আগুন জ্বালিয়া দিল। সেই অগ্নিবিদগ্ধার নিকষিত হেমকান্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল না, আগুনের অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া একখানি স্বর্ণ-প্রতিমার মতই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। কুট্নীর মুখে কাজির প্রলোভন শুনিয়া সাধ্বী মহিলা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশেরই যোগ্য যে দেশে কোন্ অতীত যুগে স্পর্দ্ধার-তুঙ্গশৃঙ্গ-সমাশ্রিত লঙ্কেশ্বরের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী অশোকবনে স্বীয় চরিত্র-গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। মলুয়া বলিতেছেন—

কাজিরে কহিও কথা নাহি চাই আমি।
রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী॥
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী সে যে রণদৌড়ের ঘোড়া॥
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।
না হয় দুষমন কাজী নউখের সমান॥
দুষমন কুকুর কাজি পাপে দিলা মন।
ঝাঁটার বাড়ি দিয়া তারে করতাম বিড়ম্বন॥
ব্যাচা থাকুক্ স্বামী আমার লক্ষ পরমায়ু পাইয়া
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজি পায়ের লাথি দিয়া॥
জাতের মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী।
মনের আপশোষ মিটাক তারা সাত নিখা করি॥
সেই মত আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা।
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাঁটা॥

যতই বিপদ বাড়িতেছে, ততই এই মূর্ত্তি বেশী উজ্জ্বল হইতেছে। এই স্বর্ণমূর্ত্তি এক সময়ে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল, এখন পাশ্চাত্য-প্রভাবের দশমীর দিনে এই

আদর্শ আমরা ঘাড়ে করিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি। প্রেম যে জগতের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা হইতে বড়, মলুয়ার চরিত্রে তাহার সমুন্নত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামীবিরহে দুঃখের চূড়ান্ত কষ্টে মলুয়া বারটি মাস কিভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহার কতকটা বিবরণ আমরা দিতেছি—

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।
গলার যে মতির মালা তাহা বেচ্যা গেল ॥
শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ॥
হাতের বাজু বান্ধ্যা দিয়া ভাদ্র মাস যায়।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায় ॥
কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক মাস খাইল।
অঙ্গের যত সোনা দানা সকল বান্ধ্যা দিল ॥
ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে ॥
শতালি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী।
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের থাকী ॥
ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুঠ খুদ।
দিন রাতই বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে কাকে করে রাও।
কোন বা দেশে আছে স্বামী নাহি জানে তাও ॥
আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা।
সোয়ামীর চাঁদ মুখ না যায় পাশরা ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ॥

গ্রাম্য কবির লেখায় গ্রাম্য-পথের দু'ধারে বনজ পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল কবিত্বের ছটা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

মেওয়া মিশ্র সকল মিঠা মিঠা গঙ্গার জল।
তার থ্যাকা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥
তার থ্যাকা মিঠা দেখ দুঃখের পরেঁ সুখ।
তার থ্যাকা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।

তার থ্যাকা মিঠা যদি পায় হারাণো ধন।
সকল থ্যাকা অধিক মিঠা বিরহে মিলন॥

কাজীর পাল্কী হইতে মলুয়াকে যেখানে তার পাঁচ ভাই উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল— তাহার চিত্রপট পাঠকের মনে অনেক দিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে—

বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম ফুলে ভরা।
কোড়া শিকার করিতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা॥
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী।
পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরি।
পঞ্চ ভাইএর পানসীখানা দেখিতে সুন্দর।
লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর॥
অষ্ট দাঁড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
পঙ্খী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে॥

(অবশ্য, আমরা অনেক বাদসাদ দিয়া উঠাইলাম।)

মলুয়ার কাহিনী পাঠ করিতে কতবার যে পাঠকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল বঙ্গীয় কুলবধূদের একটা ছাপ আছে— তাহা সেই চিরদুঃখিনী অযোধ্যার রাজবধূর। সেই মহা আদর্শ বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পুনঃপুনঃ জাগ্রত হইয়া বঙ্গবধূগণকে প্রেরণা দিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার জোরে আমরা এই মহাচিত্রখানি মুছিয়া ফেলিতেছি— কিন্তু ভারতের সীতা সাবিত্রী গেলে, ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা খসিয়া পড়িবে। তাহাদের স্থল পূরণ করিতে বিদেশ হইতে কি আনিয়াছে? বার্নার্ড্‌শ ও মেটারলিঙ্ক্‌ যাহা দিতেছেন তাহা কি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবে? নারীহৃদয়ে ভালবাসা না থাকিলে— ভাবের পুষ্পোদ্যান না থাকিলে— যাহা থাকিবে তাহা পদগৌরবে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারিলেও সে সাহারায় সামাজিক ও পারিবারিক তৃষ্ণা মিটাইবার কিছুই নাই।

যে সর্ব্বস্বত্যাগী ভালবাসা দিয়া মলুয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াছিলেন তাহা সামাজিক নিয়ম এবং পুরোহিতমুখ-উচ্চারিত মন্ত্রবলে জন্মাইতে পারে না, তাহাতে কৃত্রিমতার বাষ্প নাই। মাটী খুঁড়িয়া শত পরিশ্রম করিয়া কেহ মাটীর নীচ হইতে একটি গোলাপ গড়িয়া তুলিতে পারে না। এই পালাগানের চরিত্রগুলি স্বাভাবিক অনুরাগ বিকশিত করিয়া দেখাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, ধর্ম্ম বা মত -প্রচার নাই, কোন যুগোচিত সমস্যার সমাধান নাই— ইহাদের আদর্শ

সনাতন প্রেমের আদর্শ— সহস্রবার নিন্দা করিলেও পদ্মের সৌরভ ও শোভা নষ্ট হইবে না। কোন বিশেষ যুগে মানুষ হয়ত একটা বিশেষ ভাবের উত্তেজনার পাছে পাছে ছুটিতে পারে— কিন্তু এই অফুরন্ত সুধাভাণ্ডার প্রেমপিপাসুর জন্য চিরসঞ্চিত। যেখানে মানুষ আছে, মানুষের হৃদয় আছে, সেখানে এই প্রেমসুধার চিরপ্রয়োজন থাকিবে।

ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে— সেই ঝড়ে তরুলতার মূল উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে, উত্তাল তরঙ্গ ঝড়ের অগ্রগামী হইয়া প্রকৃতির পটে ধ্বংসের নিশান তুলিয়াছে। ভাঙ্গা মন-পবনের নৌকামধ্যে গঙ্গায় মলুয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, ঋষি-অভিশপ্তা লক্ষ্মীর ন্যায় এই ডুবন্ত প্রতিমার সিন্দুরোজ্জ্বল কপাল ও আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদামের উপর মেঘাবৃত সূর্য্যরশ্মির শেষ রেখা পড়িয়াছে— এ কি বঙ্গলক্ষ্মীর শেষ নিমজ্জন-চিত্র! এ চিত্র কি আর দেখিতে পাইব না! আমরা এই মলুয়ার পালা অতি যত্নে আমাদের নিভৃত ভাণ্ডারে রাখিয়া দিব। কালে যদি এই আদর্শ সমাজ হইতে তিরোহিত হয়, তবে হয়ত জাতীয় আদর্শ গড়িবার সময় এই পালাগানের চিত্রটির প্রয়োজন হইতে পারে। এই পালাগানটির রচয়িত্রী খুব সম্ভব কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী।

পূর্ব্বে যতগুলি পালাগানের উল্লেখ করিয়াছি— মদিনা চরিত্র ইহাদের কোনটি হইতে আদর্শ হিসাবে ন্যূন নহে। দেওয়ান মদিনা পালাটিতে কবির অসাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং তৎসঙ্গে বাস্তবতার খুঁটিনাটি মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে।

এই পালাটিতে নাট্যকলা ও বিষয়নির্ম্মাণের রীতি দোষশূন্য নহে। কিন্তু ইহা করুণার একটি অফুরন্ত নির্ঝর,— মুসলমান মহিলা মদিনা— দূরাগত আদর্শ নহেন, ইনি সতী সাবিত্রী ও মলুয়ার ভগিনী? যে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার প্রতি একদিনের জন্যও তাঁহার অভিমান হয় নাই। বিশ্বাসঘাতককে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন, এমন-কি তালাক-নামাখানি তিনি একটা পরিহাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বজ্র মাথার উপরে ডাকিতেছে তথাপি ফুলটি যেরূপ হাসিতে থাকে, মদিনার এই বিশ্বাস তেমনি একটা আশ্চর্য্য নির্ভর ও বিশ্বাসের নিদর্শন। স্বামী চলিয়া গিয়াছেন, অপর রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন— তবু তাঁহার বিশ্বাস টলিতেছে না। এ যে সপ্ততাল-ভেদী শিকড়, ইহার মূল কোথায় কে খুঁজিয়া বাহির করিবে? কুঠারাঘাতে অশ্বত্থবৃক্ষ আমূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু কুঠার হইতেও কঠোরতর আঘাতে পুষ্পবল্লীর ন্যায় এই রমণীর বিশ্বাস টলিতেছে না। তিনি আসিবেন বলিয়া পুকুরের জলে জাল ফেলিতে

দিতেছে না, রোজ রোজ নানারূপ পিঠা ও পুলি তৈরী করিয়া স্বামীর পথপানে সে চাহিয়া আছে—

ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বাঁধা দৈ।
আইজ বানায় তালের পিঠা, কাইল বানায় খৈ॥
শালী ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে করিয়া॥

ক্রমে আশাহতা তম্বঙ্গী মদিনা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই সেই পুরাতন স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। প্রতি মাসের সঙ্গে প্রতি দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে যাঁহার স্মৃতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, সেই কলিজার সার হৃদয়ের হারকে সে কিরূপে ভুলিবে? অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী ধান কাটিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিতেন, মদিনা কত উৎসাহে ধান ঝাড়িয়া বাড়ীতে তুলিতেন। দুই জনে একত্রে বসিয়া ধানে "উনা" দিতেন অর্থাৎ কুলা দিয়া ঝাড়িয়া খড়ের টুকরা দূর করিয়া ফেলিতেন। পৌষ মাসে ক্ষেত ছাইয়া ধানের চারা বড় হইতে থাকিত, কত উৎপাত সহ্য করিয়া মদিনা রাত্রে ধানের পাহারা দিতেন। বাড়ীতে হুক্কাতে জল ভরিয়া কখনও কখনও স্বামীর প্রতীক্ষায় তামাক সাজাইয়া রাখিতেন। স্বামী ক্ষেতের কাজ সারিয়া কখন বাড়ীতে ফিরিবেন, ভাত রাঁধিয়া মদিনা-বিবি তাহার প্রতীক্ষা করিতেন। যখন ছোট ছোট ধানের চারা এক স্থান হইতে তুলিয়া স্বামী অপর স্থানে তুলিতেন তখন মদিনা চারাগুলি নিজে আগাইয়া স্বামীর হাতে দিতেন, স্বামী তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতার কত প্রশংসা করিতেন। মাঘ মাসের শীতে হাড় কাঁপিতে থাকিত, প্রাতে উঠিয়া এই ঘোর শীতে স্বামী ক্ষেতে জল দিতে যাইতেন, মদিনা পেছনে পেছনে হাঁড়িতে আগুন লইয়া যাইতেন। স্বামী খড় কাটিতেন, মদিনা জল আনিতেন। দিন রাত্রে উভয়ে মিলিয়া সংসারের কার্য্য করিতেন। চাষা ও তাঁহার স্ত্রী— উভয়ের সম্বন্ধ শুধু দৈনন্দিন কার্য্যের শেষে বিরামকুঞ্জে আবদ্ধ ছিল না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে ইহাঁরা দু'জনে পরস্পরের সহযোগী। এই কার্য্যক্ষেত্রে দু'য়ের প্রতি দু'য়ের অনুরাগ পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাব্যরসও নিহিত ছিল। শৈশবে যখন দুলালকে ছাড়া ছয় বৎসরের মদিনা একদণ্ড থাকিতে পারিত না, সেই সময় হইতে এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক বৈশাখ মাসে মদিনার বুলবুলির বাচ্চা উড়িয়া গিয়াছিল, দুলাল তাহা ধরিয়া দিয়া একটা পিঁজরায় পুরিয়া দুইজনে মিলিয়া তাহা পালন করিয়াছিল।— সেই হইতেই এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইজনে ভাল একটা আমের চারা বুনিয়া জলসেক করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিল,

তদবধি এই প্রেমের অঙ্কুর। তাহার অবশেষে কি ভীষণ পরিণতি! ভালবাসা কখনও নিষ্ফল হয় না, মেকীর লোভে মানুষ কতদিনের জন্য খাঁটিকে ভুলিতে পারে? খাঁটির জন্য আবার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিবে— যেদিন মেকী ধরা পড়িবে। পালাগানের মধ্যে জয়চন্দ্র ও দুলালের তাহাই হইয়াছিল। দুলালের শেষকালের আর্ত্তি লৌহ-শাবলের ন্যায় শ্রোতার বক্ষে আঘাত করিবে। যখন নিদারুণ নৈরাশ্যে অনুতপ্ত দুলাল নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া 'মদিনা কোথায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন শোকে মৃতপ্রায় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক সুরুজ জামাল ঘরের মৃত্তিকা-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া উন্মত্ত পিতার নিকট দাঁড়াইল—

দুলাল জিজ্ঞাসে সুরুজ মদিনা কোথায়।
চোখে হাত দিয়া সুরুজ কবর দেখায়।

বালক কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে অশ্রুগঙ্গা ঝরিয়া পড়িতেছিল সেই চোখের জল এক হাতে আবৃত করিয়া অপর হস্তনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সে মাতার কবর দেখাইয়া দিল।

প্রবলপরাক্রান্ত বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান দুলালের শেষকালে যে শোক হইয়াছিল তাহা হৃৎপিণ্ডের রুধিরে লিখিত, তাহা চোখের জলের অফুরন্ত প্রস্রবণ— প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিপরীক্ষা। দুলালও ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কতটা বদ্ধমূল তাহা সে নিজেই জানিত না। এই অপরাধ করিয়া সে বুঝিল সে কত বড় প্রেমের সাধনা করিয়াছিল— সেই কৃষকরমণীর শোকে সে তৃণবৎ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব পদতলে দলিত করিয়া প্রিয়তমা মদিনার কবরের পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিল। সেই কৃষকরমণীর প্রেম, তাহার বিপুল রাজপ্রাসাদের উর্দ্ধে স্বীয় গৌরব-নিশান তুলিয়া ভালবাসার জয় ঘোষণা করিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা মদিনার পালাটির অজস্র প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

খ্রী. ১৯২৬

১ পল্লীগীতিকা। দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড— ভেলুয়া ৯।১২ এবং দেওয়ান ভাবনা ২।১২।

জীবনচরিতের মূলসূত্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

নরনারীর চরিতাখ্যান কোন্ পদ্ধতি অনুসারে করিলে উহা সমাজের মঙ্গলজনক হইতে পারে, মনীষী স্যার সিড্‌নে লী তাহাই বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলেখ্যের যেমন ভূমি বা ক্ষেত্রের নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে চিত্রটি ঠিকমত ফুটিয়া উঠে না, তেমনই যে নর বা নারীর চরিতাখ্যান করিতে হইবে, তাঁহার যে সমাজে উদ্ভব হইয়াছিল, এবং পরে যে মনুষ্যসমাজে সে চরিতের বর্ণনা করিতে হইবে, সেই সমাজের পরিচয় ঠিকমত দিতে না পারিলে, সেই নর বা নারীর চরিতকথা ফুটিয়া উঠে না। সমাজই মনুষ্য-জীবনের ক্ষেত্রস্বরূপ। সমাজের গতি-অনুসারে, ভাব ও অভাবের পরিণতি-অনুসারে এক এক নর বা নারী এক এক ভাবে ফুটিয়া উঠেন। যিনি নেপোলিয়ানকে বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ফরাসী-বিপ্লবের ভঙ্গী বুঝিতেই হইবে। জগতে ফরাসী-বিপ্লব দুইটা হয় নাই, নেপোলিয়ানও দুইটা হইবে না। প্রতিবেশ-প্রভাব জন্যই মানুষ। সেই প্রতিবেশ-প্রভাব বুঝিতে না পারিলে মানুষকে বুঝা যায় না।

কোনও ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা লিখিয়া রাখিবার সাধ হয় কেন? উত্তরে স্যার সিড্‌নে লী বলিতেছেন যে, মানুষ চরিত্রের ও কীর্তির ধারা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, আগামিগণকে নিজেদের ভাবে ভাবুক রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস ও চরিতাখ্যান করিয়া থাকে। চিরজীবী হইয়া থাকিবার বাসনা মনুষ্য-হৃদয়ে বড়ই প্রবল। যদি পারিতাম, তবে স্ব-দেহকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতাম। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। তাই মানুষ নিজের কীর্ত্তির ও প্রভাবের ধারা বংশপরম্পরায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় ইতিহাস লেখে, চরিতাখ্যান করে, সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করে, আলেখ্য ও বিগ্রহ রচিয়া থাকে। স্মৃতির সাহায্যে চরিত্রের ও কীর্ত্তির পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার জন্যই ইতিহাস ও জীবনাখ্যান লিখিত হয়। আবার মানুষেরও এমনই প্রকৃতি যে, মানুষ অতীত কথার আলোড়ন করিতে ভালবাসে; পুরাতনকে সজীব রাখিবার জন্য মানুষ সাধ্যমত চেষ্টা করে। ইহাই হইল চরিতাখ্যানের মূল তত্ত্ব।

চরিত-আখ্যানের উপাদান কি? উত্তরে ডাক্তার লী বলিতেছেন,— Character and exploit jointly constitute biographic personality। চরিত্র এবং কীর্ত্তি, এই দুইটি আখ্যানযোগ্য বিষয়। অর্থাৎ যে চরিতে বিশিষ্টতা নাই, যাহা সমাজের উপর একটা ছাপ দিয়া যাইতে না পারে, তাহা আখ্যানযোগ্য নহে। যে

পুরুষ কীর্ত্তিমান্ নহেন, যাঁহার যশ স্থায়ী হইবে না, তাঁহার চরিতও আখ্যানযোগ্য নহে। যিনি এমন চরিত লিখিবেন, তাঁহার লিখনভঙ্গী, শব্দচয়নসামর্থ্য এমন হইবে যে, তাহা টেঁকসই ও মজবুত হইবে, চিরস্থায়ীরূপে সাহিত্যে স্থান অধিকার করিতে পারিবে। যেমন যোগ্য বিষয় হওয়া চাই, তেমনই তদুপযুক্ত লিখনভঙ্গী হওয়া চাই, তবে চরিত-আখ্যান ভাষায় ও সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে পারে। চরিত ও চরিতাখ্যান ব্যাপার লইয়া ইটালীর কবি ও আখ্যানকার একটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি-বৃক্ষের ডালে ডালে, বৃন্তে বৃন্তে নরনারী ঝুলিতেছে; তাহাদের জীবন-সূত্রের সহিত এক একটি পদক বাঁধা আছে; সেই পদকে তাহাদের কীর্ত্তি ও চরিত্র অঙ্কিত আছে। বৃক্ষের তলায় বিশাল বিস্মৃতির নদী বহিয়া যাইতেছে; নদীর পরপারে অমরাবতীর মন্দির আছে, এবং নদীর জলে কবি-রাজহংসসকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মৃত্যু আসিয়া যখন নরনারীর কুসুমগুচ্ছসকলকে ছাঁটিতে আরম্ভ করে, তখন অনেকেই পদকশুদ্ধ বিস্মৃতির জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়, অনেকের পদকগুলি রাজহংসেরা ঠোঁটে করিয়া ধরিয়া ফেলে, জলে ডুবিতে দেয় না। পরে সেই পদকগুলিকে লইয়া তাহারা অমরাবতীর মন্দিরে অক্ষয় বেদীর পার্শ্বে রাখিয়া আসে। চরিত্র ও কীর্ত্তির হিসাবে পদকগুলি রাজহংসের মুখে পড়ে। অর্থবাদের হিসাবে এমন সুন্দর অর্থবাদ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এরিষ্টটল বলিয়াছেন,—a career, which is 'serious, complete and of a certain magnitude', is a fit biographic theme। যে জীবন প্রগাঢ় নহে, পূর্ণ নহে, ব্যাপক নহে, তাহার আখ্যানের প্রয়োজন নাই। যাঁহার চরিত্র ও কীর্ত্তি সমাজের নিম্নস্তরকে পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারে নাই, যাঁহার প্রভাব বহু জনের উপর ব্যাপ্ত নহে, যাহা পূর্ণ নহে, তাহার আখ্যান করিলে লেখকের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

এই সকল কথা বলিয়া স্যার সিড্‌নে লী বলিতেছেন,—Death is a part of life and no man is fit subject for biography till he is dead। মৃত্যু জীবনের অংশ-স্বরূপ; মৃত্যু না ঘটিলে জীবন পূর্ণ হয় না। সুতরাং মানুষ না মরিলে তাহার জীবনকথা লিখিতে নাই। জীবিত ব্যক্তির চরিতাখ্যান করিলে হয় তাহাতে নিন্দার ভাগ অধিক থাকিবে, নহে ত অতিপ্রশংসায় উহা পূর্ণ হইবে। কারণ, No man's memory can be accounted great until it has outlived his life। মৃত্যুর পরেও যাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহার জীবন আখ্যানযোগ্য নহে। নামের হিসাবে নামটা দশজনের মুখে মুখে ঘুরিলে হইবে না; জীবিতকালে সে ব্যক্তি সমাজের

যে স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মরণের পরেও কিছুকাল সে প্রভাব বজায় থাকিলে, তবে বুঝিতে হইবে, এমন লোকের স্মৃতি চরিতাখ্যানের সাহায্যে রক্ষা করিতে পারিলে উহা স্থায়ী হইয়া থাকিবে। অতএব ব্যক্তিবিশেষের মরণের কিছুকাল পরে তাহার চরিত আখ্যাত করিতে হয়। সে আখ্যান এমনভাবে করিতে হইবে যে, উহা সমাজে টিকে— স্থায়ীভাবে থাকে।

এরিষ্টটলের "magnitude" শব্দটা লইয়া নিবন্ধকার লী আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কেহ বড় চাকুরে হইয়া বড় বড় কাজ করিলেন বলিয়া যে তাঁহার জীবনকথা লিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তেমন অবস্থায় পড়িলে সকলেই তেমন বড় কাজ করিতে পারে। এমন লোকের জীবনচরিত লিখিলে লোকটার সহিত চরিতাখ্যানটাও বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। কেহ ভাল লেখক, ভাল কবি বলিয়া যে তাঁহার জীবনকথার আবৃত্তি করিতে হইবে, তাহাও ঠিক নহে। সমাজের তাৎকালিক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে হয়ত কোনও লেখকের লেখার খুব প্রশংসা হইল; কিন্তু সে প্রশংসা রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়; ফলে চরিতাখ্যানটাও সেই সঙ্গে ব্যর্থ হইয়া যায়। সমাজের সখের প্রশংসা, খোস-খেয়ালের তারিফ, জাতির ভাবোন্মেষজন্য প্রশংসা নহে। উহা ভ্রমরগুঞ্জন মাত্র, সখের ও খেয়ালের ফুল শুকাইলেই ভ্রমরগুঞ্জন বন্ধ হইবে। অতএব কোনও কবি কর্ম্মী বা লেখকের জীবিতকালের প্রশংসার ছটা দেখিয়া, এবং সে ছটায় মুগ্ধ হইয়া যে লেখক জীবনকথা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই অনেক ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হন। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের এই মহত্ত্ব বা magnitude বুঝা বড় কঠিন। বীরত্ব হিসাবে মার্‌ল্‌বরো ওয়েলিংটন অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু মার্‌ল্‌বরোকে ইংরেজ অনেকটা ভুলিয়াছে, ওয়েলিংটনকে ভুলিতে পারে নাই— সহসা পারিবেও না। ইহার হেতু এই যে, ওয়েলিংটনের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude মার্‌ল্‌বরো অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। এই মহত্ত্বের যাচাই ঠিকমত করিতে না পারিলে চরিতাখ্যান-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ই।

Autobiography বা নিজের জীবন নিজেই লেখার অভ্যাস অনেকের আছে। রুসো বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হইতে না পারে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হইতে না পারে, সে যেন আত্মজীবনকথা লিখিতে উদ্যত না হয়। একেবারে ভিতরটা খুলিয়া, ভিতরে বাইরে উলঙ্গ হইয়া, তবে আত্মজীবনকথা লিখিতে হয়। লেখক জীবিত থাকিতে আত্মজীবনকথা ছাপিতে নাই। স্যার সিড্‌নে লী বলিয়াছেন যে, যাহারা স্বীয় জীবনে ইতিহাসের উপাদান

গড়িয়া বা সংগ্রহ করিয়া যাইতে না পারে, তাহারা যেন আত্মজীবনকথা না লেখে। সিজার, লুথার, নেপোলিয়ান, মুলটকে প্রভৃতি মহাত্মাগণই আত্মজীবনকথা লিখিতে পারেন। কেন না, ইঁহারা কর্ম্মের দ্বারা দেশের ও জাতির ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়া গিয়াছেন। কাহারও আত্মজীবনকথা কৈফিয়ত হইলেই সর্ব্বনাশ; তখন তাহার আর কোনও মূল্য থাকে না। তুমি ভাল কি মন্দ, সে বিচার আগামিগণ করিবে; ভবিষ্যতের সে বিচারের উপর কথা কহিবার তোমার কোনও অধিকার নাই; কথা কহিলেও তাহা অগ্রাহ্য হয়, ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত সে কথার উপর নির্ভর করে না। নিজের কথাই হউক, আর অন্যের কথাই হউক, জীবনকথা is the truthful transmission of personality মনুষ্যত্বের সত্য বিকাশ মাত্র। উহাতে মিথ্যার বা সত্যগোপনের অবসর নাই। এই হিসাবে বস্‌ওয়েল-কর্ত্তৃক লিখিত জনসনের জীবনকথা এবং রুসোর আত্মজীবনকথা জগতের সাহিত্যে দুইখানি আদর্শ পুস্তক। ইহার পরেই লক্‌হার্টের লিখিত স্যার ওয়াল্টার স্কটের জীবনকথা ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ পুস্তক।

চরিতাখ্যান ইতিহাস নহে। ইতিহাসে এবং চরিতাখ্যানে যে বৈষম্য আছে তাহা মনীষী বেকন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। লী সাহেবের ভাষায় বলিতে হইলে বলা চলে যে, Bacon warns us that history sets forth the point of public business ; while biography reveals the true and inward sources of the action, tells of private no less than of public conduct, and pays as much attention to the slender wires as to the great weights that hang from them।

ইতিহাস সামাজিক ও জাতিগত ব্যাপারের বর্ণনা করে; চরিতাখ্যান ব্যক্তিগত চরিতের কথা বলে; ব্যক্তিগত চরিত্রের যে সকল সূক্ষ্মসূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনা-সকল ঝুলিতেছে, সেই-সকল সূত্রের বর্ণনা করিয়া থাকে। মানুষটিকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে যাহা যাহা বর্ণনা করা আবশ্যক, চরিতাখ্যানে কেবল তাহাই লিখিতে হইবে। মানুষটাকে সাধু গড়িয়া বা দেবতা করিয়া যে লেখক চরিতকথা লিখিয়া থাকেন, তিনি ঠিক চরিতলেখক নহেন; তিনি চাটুকার মাত্র। অন্যে চাটুকার হয় হউক; কিন্তু নিজের জীবনকথা নিজে লিখিতে বসিয়া যদি কেহ নিজেকে দেবতা বানাইয়া ফেলে, তবে তাহার তুল্য নরাধম আর নাই। তাই রুসো রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এক আমি 'সত্যবাদী' আর ভারতের বেদব্যাস আমা অপেক্ষা বড় সত্যবাদী; কেন না তিনি নিজের জননীর কলঙ্ককথা লিখিতেও সঙ্কোচ

বোধ করেন নাই। কথাটা মজার কথা বটে, কিন্তু চরিতাখ্যানের ইহাই যে মূলসূত্র, তাহা স্যার সিড্‌নে লীও স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার স্যার সিড্‌নে লীর একটু পরিচয় দিব। ইনি মনীষী লেস্‌লি ষ্টীফেনের সহচর ছিলেন, নিজেও একজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত। যে বহিখানি[১] ধরিয়া আমরা এই নিবন্ধ প্রকাশ করিলাম, তাহা ইংরেজী ভাষায় চরিতাখ্যানের মূলসূত্র বলিয়া গ্রাহ্য ও মান্য হইয়াছে। অধুনা বঙ্গদেশেও চরিতকথা লিখিবার সখ উঠিয়াছে। যাঁহারা চরিতাখ্যায়ক হইতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাল করিবেন। বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনসমাজে এই পুস্তকের আদর হইলে ভাষার অনেক আবর্জ্জনা দূর হইবে।

রচনা : বৈশাখ ১৩১৯

১ Principles of Biography.

ফাল্‌গুন

প্রমথ চৌধুরী

আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা-নোটিশে একেবারে হুড়দ্দুম করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবর-দখল করে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধার মত— আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে না দেখতে আসমুদ্রহিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর-কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর-পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর একটিতে বেমালুম ভাবে গড়িয়ে যায় আমাদের স্বদেশি পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রম-বিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; বছরে চার বার নবকলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে দেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রং তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রঙ ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তার পর নিদাঘের রং ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ়-বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা-যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত শীতের শবশীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে— মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদনসখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো-এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে দাঁড়িয়ে হাসছে; অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন— মানুষের কথা ছেড়ে দিন, পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই ; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ-উইল— পাণ্ডুলিপিতে নয়, রক্তাক্ষরে— লিখে রেখে যায় ; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার, পিত্ত নয়, রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত-রমণীর মত স্বহস্তে চিতারচনা করে সোল্লাসে অগ্নি-প্রবেশ করছেন।

২

এ দেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হত। কিন্তু আজ যে ফাল্‌গুন মাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্র-ঋতুর— শীত ও বর্ষার যুগলমূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায়-পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এ হেন অসবর্ণ-বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণ-বর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত, ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মত এ দেশ থেকে সরে পড়ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে ; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে এই বিশ্বের এমন কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে যাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই ; এবং অমাবস্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই— বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে ; কেননা, ও-ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া ; কেননা, অর্থ যদি কোথাও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী

নেপথ্যবিধান করেন ; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে তা হলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার-ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা ? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানবসভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তার পর দর্শনের, তার পর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় তো আমরা বাঙালিরা, আর-যেখানেই থাকি, মধ্যযুগে নেই, আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম-অবস্থা, নয় শেষ-অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয় তার প্রমাণ, আমরা চোখে কিছুই দেখি নে ; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান ক'রে তাঁর বাসন্তী মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা এ কালে যা-কিছু জানি সেসব শুনেই জানি— অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয় ; তার কারণ, আমাদের কোনো-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই— আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা, ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকাখাতার ভিতর পাই, গাছের কচিপাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তা কস্মিন্‌কালেও এ ভূভারতে ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন সে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমতঃ মলয়সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তা হলে বাংলা দেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে, তা হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এ দেশে দোদুল্যমান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা 'কাবেরীতীরে কালাগুরুতরু'র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, প্রকৃত নয়।

কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, এ কথা জোর করে আমরা বলতে পারি নে; অপর পক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সে কথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমনকি প্রমাণ পর্যন্ত করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক— অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না; অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবিবর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই করে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র; ও-বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদ-তাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রং দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হলেও বকুল ফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়— এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে মানুষের ঔচিত্যজ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু; কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য— অর্থাৎ তা সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত— এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃতকাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য— সে সত্য মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল কথা ভালো করে বলায়, একালে ও গুণের পরিচয় চুপ করে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম,

এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক, তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কিনা।

সংস্কৃত-মতে বসন্ত মদনসখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে-গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তি-স্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে ; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ এ কথা আমরা কেউ ভাবি নে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ আশ্রয় করে না ; অথচ পয়লা ফাল্‌গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, এ কথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এসব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত ; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজিতে প্যারালালিজম্— সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ। অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষকথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মনগড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের-ঋতু গড়ে তুলেছেন সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে ; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো

ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্তব্য, তার কারণ বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায় তা হলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এস্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতী-পূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

রচনা : ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভারতচন্দ্র

প্রমথ চৌধুরী

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ

গত বছর দু-তিন ধরে বাংলাদেশের মফস্বলে নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে, আমার পক্ষে বঙ্গসাহিত্যের চর্চাটা বৃথা কাজ বলে গণ্য হয় নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

যার কর্ম তারে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।

বাঙালি জাতি যে মনে করে লেখা জিনিসটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা ?

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারি নে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'The spirit is willing, but the flesh is weak' আমার বর্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাংলাদেশময় ছুটে বেড়াবার মত আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে স্বল্পপরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করি, কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে; যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু কৃপণের ধনের মত সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এর কারণ নিবেদন করছি।

প্রথমতঃ, একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে এবং সেসব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব, আমার বিশ্বাস, এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধেও দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য-সমালোচনা করতে ব'সে কোনো সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা শুরু করেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয়; কারণ কোনো লেখকের লেখা থেকে তাঁর জীবনচরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত সমালোচকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য বলে মনে করি। যুগধর্মানুসারে একালে সাহিত্য-সমালোচনাও একরকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।

সম্প্রতি কোনো সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা, তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় তো ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না; আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় তো সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবতঃ সমালোচকের মুখে ভারতচন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার আমরা অধিকারী ভারতচন্দ্র সে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় এক শ আশি বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমনকি তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি।

অপর পক্ষে আজ থেকে এক শ আশি বৎসর পরে বাংলার ক'জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালি জাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরও দু-এক জনের নাম হয়তো আগামীকালের বঙ্গসাহিত্যের কোনো ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে; বাদবাকি আমরা সব জলবুদ্‌বুদ, জলে মিশিয়ে যাব।

আর-একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত এক শ আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজ-রাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা। আর, এ-ক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা; কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। অথচ দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।

৩

সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এমন দু-একটি সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড় লেখক ও দুষ্ট লেখক বলে গণ্য। উদাহরণ-স্বরূপ ইতালিদেশের

মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির *The Prince* সাহিত্য হিসেবে ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব ও অতুলনীয় গ্রন্থ, এ কথা ইউরোপের কোনো মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসাবেই প্রসিদ্ধ।

আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্যসমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু সু এবং সু কু হয়ে উঠে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে এ যুগের সাহিত্যিকদের কতটা মিল আছে সে বিষয়ে ঈষৎ লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজমুখেই তাঁর জীবনের দুটি-চারটি মোটা ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি— আমরা উভয়েই— উচ্চব্রাহ্মণবংশে, উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে, জন্মগ্রহণ করেছি। ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, তিনি তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে—

ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্ররায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গলসার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

এখন জিজ্ঞাসা করি, কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তাঁর কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি। বিশেষতঃ, সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।

যদি পৃথিবীর এমন কোনো নিয়ম থাকত যে, লেখক উচ্চব্রাহ্মণবংশীয় হলেই তাঁকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তা হলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করাটা তো সাহিত্যসমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু কবি তো জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং তার জন্য তাঁদের ইতিপূর্বে কেউ তো হীনচক্ষে দেখে নি।

শুনতে পাই, ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement -নামক

একটি ঘোর আন্দোলন চলছে, কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি উক্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্যক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণ-নিগ্রহের জন্য কোনো দল বদ্ধপরিকর হয়েছে, এমন কথা আজও শুনি নি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে, আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্মগ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও তো নয়।

সম্ভবতঃ সমালোচকের মতে, একে ব্রাহ্মণ তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ-জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কণ বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যের আরম্ভে এই বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে—

দামুন্থায় চাষ চষি।

কিন্তু চাষ না চষলে যে বড় লেখক হওয়া যায় না, সাহিত্যজগতে তারও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্ততঃ এতদিন তাই ছিল।

আমার মনে হয় যে, ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্যই সাহিত্যচর্চা তাঁর পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হলে লোকে যে-সরস্বতীর সেবা করে তাঁর নাম নাকি দুষ্টসরস্বতী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন সাহিত্যজগতে যে অনর্থ ঘটায়, এমন কথা অপরের মুখেও, অপর কোনো কবির সম্বন্ধেও শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল, তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

৪

সমালোচকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষমাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি, এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানবধর্ম-বর্জিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তাঁরা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, আমার জীবন সুখময় কি

দুঃখময়, তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর, আমার জীবনের যে-পরিচয় সকলেই পান, তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে, আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরেজি বাংলা দু রকমেরই। এর বেশি সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progressএর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরনে কাপড়ই এ যুগে মানবসভ্যতার চরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবতঃ আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবনই একটা মস্ত ট্রাজেডি; অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড় প্রহসন হত না।

সে যাই হোক, ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল সত্যই একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে, তাঁর জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাংলার কোনো সাহিত্যিকেরই জীবনে নেই; এমনকি তাঁদেরও নেই যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে ডিভাইন কমেডি।

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনোরূপ গবেষণা করি নি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, ভগবান আমাকে কোনো বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখের কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু -নামক জনৈক ব্যক্তি 'কবির জীবনী সম্বলিত' ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের প্রস্তাবনা হতে আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, বসুমহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন; শুধু বসুমহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেনমহাশয়ের হাতে খৃস্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই তফাত।

১৭১২ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুট পরগণার অধিপতি ছিলেন। বর্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্বস্বান্ত হন।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগারো বছর। এই অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি 'পলায়ন পূর্বক' মাতুলালয়ে গমন করেন ; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ ক'রে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তাঁর বিবাহ হয়।

অর্থকরী পারস্যভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।

তার পর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে থেকে তিনি অতিপরিশ্রমপূর্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দু বেলা আহার করতেন। অনেক সময়ে বেগুনপোড়া ছাড়া আর-কিছু তাঁর কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। পারস্যভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ি ফেরেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তখন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্ধমানের রাজধানীতে তাঁদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তার পর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদাসর্বদা ধর্মচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। তার পর বৃন্দাবনধাম-দর্শন-মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হতে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙায় ডুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার করবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনেয় নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুশি হয়ে ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্য

এককালীন এক শ টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি ৪৮ বৎসর বয়েসে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

তাঁর শেষবয়েসের ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল, তার পরিচয় তাঁর রচিত নাগাষ্টকে পাওয়া যায়। আমি উক্ত অষ্টকের তিনটি মাত্র চৌপদী এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

গতে রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীর্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে স্থরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতাবাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাসাত্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্ন-ভোজনে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তার পর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তার পর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তার পর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরে রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্যরচনা করেন এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার কর্মচারিগণ কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন আজও অবশ্য হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত অবস্থার বিপর্যয় আজ কারও কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড়জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জানতে চান, তা হলে তিনি অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনা পড়ুন। সেকালে এ দেশের লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

সে যুগে দেশের কোনো লোকের হাতে ক্ষণের জন্য চাঁদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন তো দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই ; এবং চল্লিশ টাকা মাস-মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক্, অত কমে আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।

৭

এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না, আরও জ্বলে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥

নানা শাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার ॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু ॥

এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে, ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যাবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্সপীয়ার বলে গণ্য, সেই Cervantes সের্‌ভান্তেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যাবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী ॥

৮

পূর্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের জীবনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা নেই। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সেই ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এইজন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিংবা ফল নয়, বরং ঠিক তার উলটো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক, তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়ে নি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে

আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষতঃ যারা অচেতচিত্ত, তাদের মনে এই ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখদুঃখের গান গেয়েছেন— কখনো হেসে, কখনো কেঁদে। প্রথমপুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এদের'ও এই স্ব বস্তুটি যে-ক্ষেত্রে অহং সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে-ক্ষেত্রে তা আত্মা সে-ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে এক বস্তু নয়, সে কথা কি এ দেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোট হোন বড় হোন—জাতকবি, সুতরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত, এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয়, সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমালোচকদের হাতে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।

আন্দাজ দশ-বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং শহরে একটি সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। বলা বাহুল্য, প্রাক্-বৃটিশ যুগের, ভাষান্তরে নবাবি আমলের, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর-নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতিপ্রশংসাও নেই, অতিনিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা-প্রশংসায় যারা সিদ্ধহস্ত তাঁদের ও-বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। কারও পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ, আমি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাস করেছি কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল হয়েছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন, উকিলের—

সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।

সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্‌গুণ বলেই প্রচার করেছেন।

সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দু জনে হচ্ছি পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরেজি

প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই যা আমি তুলে নিতে প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূলহস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখি নি।

যা একবার ইংরেজিতে বলেছি, বাংলায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু-চার কথা বলতে চাই। সে কথাটি এই—

Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.

১০

আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরও দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক, সে কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন না, যাঁরা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমনকি তার microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস আমাদের চোখের জ্যোতি এক্স্-রে নয়, তা হলে আমরা চার পাশে শুধু নরকঙ্কাল দেখতে পেতুম। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন তার প্রমাণ আপনারা আমাকে এই উচ্চ আসন দিয়েছেন, আমি বক্তা বলে নয়, লেখক বলে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আরম্ভেই একবার বলেছেন—

কৃষ্ণচন্দ্রভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

তার পর আবার বলেছেন—

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় শুধু সাহিত্যিকরা; কারণ কোনো সাহিত্যিকই অসরস ও অসরল কথা ইচ্ছে করে বলে না; তবে কারও কারও স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরোয়।

আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে তাতে অকৃতকার্য হয়েছি কি না, তার বিচারক আমি নই, সাহিত্যসমাজ।

ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর

পনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ-আধ-ভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাষী বাঙালি হয়ে এ দেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে তো সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাংলায় যদি এমন কোনো সাহিত্যিক থাকেন, যিনি—

কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে,

তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা ব'লে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।

১১

ভারতচন্দ্রের লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল ॥

ভারতচন্দ্র যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ নিত্য দেখতে পাই হাজার হাজার লোক তা করতে পারে। এই বাংলাদেশে প্রতি বৎসর স্কুলকলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা যেই মত পড়িয়াছে সেই মত লেখা ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশি পড়া দিতে পারে সে তত বেশি মার্ক পায়। তবে সেসব লেখা যে 'বুঝিবারে ভারি' তা তিনিই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ও-জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বইপড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি, বাঙালি জাতি কস্মিন্‌কালেও বিলেতি 'বিদ্যাভ্যাসাৎ' এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠবে না যে, উক্তজাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন?—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ-আগম-বেত্তা নাগরী পারসী।

কিন্তু তিনি যেই মত পড়েছিলেন সেই মত লেখেন নি কেন, তাই বুঝলে সাহিত্যের ধর্ম যে কি সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ যুগে আমরা কোনো কবির জজ কিংবা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করি নে, সাহিত্যসমাজের পাহারাওয়ালাদের তো নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। এ-জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্ লেখকের লেখায় কোন্ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচজনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।

১২

এখন ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে গুণ সম্বন্ধে কোনো চক্ষুষ্মান্ বাঙালির পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন, এই সর্ব-আলংকারিক-পূজিত গুণটি কি। যে লেখা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত, তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লিনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশি হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ-সরস্বতী একেবারে 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা' রূপ ধারণ করেছেন। যাঁর অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্তি হত তা হলেও আমরা বাঙালি লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোনো সাহিত্য জানি আর না জানি, বাংলা সাহিত্য অল্পবিস্তর জানি।

আমি পূর্বোক্ত ইংরেজি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহা গুণকীর্তন করি, কিন্তু সে ভুল ক'রে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখছি উক্ত পদাবলীর ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডী-দাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে, সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের হিস্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনও সে সাহিত্যের জিয়োগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিয়োগ্রাফি রচিত হবে তখন

সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে নবদ্বীপ সেকালে ছিল—

ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।

আমি বলেছি যে প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।

১৩

ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এ দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।

সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধু কবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চণ্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কি না যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই নে, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন

তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তাঁর ছন্দ ও অলংকারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারও চোখ-কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও-জিনিস উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে এক শ্রেণীর পাঠক আছে যাদের কাছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তাঁর আর্ট। তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

১৪

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যেসব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক-মহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এহেন ইয়ার্কি কোন্ সমাজের সুরীতি? আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জ্যাঠামি? তাঁর নারীগণের পতিনিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ তো ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা এষো ধর্মঃ সনাতনঃ। এস্থলে পুরুষজাতির কিং কর্তব্য? হাসা না কাঁদা? বোধ হয় কাঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি? আমি উক্তজাতীয় স্বামী-

দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না, জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র, অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা, নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটি মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত-সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে, উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য? ভারত-সমালোচনার যে ক'টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একান্ত বঞ্চিত। আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর, এহেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর-একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরেজদের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালি জাতির জন্মতারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ।

সর্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন—

সেই আজ্ঞা অনুসরি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন।

রচনা: ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

কণারক

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন— যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত-জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্ক-মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশোঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুক-কেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী— কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন।

এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালু ভাঙিয়া একটা ভগ্ন মন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে— শুধু জগমোহনটুকু বিচিত্র শৃঙ্গারভাস্কর্যে ও অক্ষুণ্ণশিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিক-জনের মুগ্ধনয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্তিগুলিই কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে-ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর। কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে— কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প— নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধ-সদৃশ, প্রশান্ত, হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্তি মন্দির হইতে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত— কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দূর-লেপন-পূর্বক ভক্তি-

ভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছু কাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণমন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দিরটি ত সামান্য নহে। গত শতাব্দীতেও মহারাষ্ট্রীয়েরা এরই পাথর খসাইয়া খসাইয়া জগন্নাথের গৌরব বর্ধিত করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুচ্চ অরুণস্তম্ভ দেখা যায়, তাহাও এই কণারকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া নগ্ন নারী-মূর্তি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডোল গঠন অনেক স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।—হয়ত বাহিরেও যেমনও ভিতরেও সেইরূপ ছিল। নর্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে। জগন্নাথের পবিত্র নিকেতনে এখনও নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাণ্ডাবর্গের পুণ্য-সঞ্চয়ের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে! সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোন দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড়-দেবতা, সে যদি বুঝিত—তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়।

তবে এ কি মায়া? এ কি এই সংসার-খেলার একটা রূপক? বুঝানো যে, চারিদিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া

আছেন, এ মায়াবুদ্‌বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না। বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতা-মন্দিরে দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে— শুধু এপিঠ ওপিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।

কণারকে এখন দেবতা নাই— এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্ত জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল 'হায় হায়'। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে— জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলই যেখানে অনিত্য ও মায়া সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ কাল ত সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্‌বুদ মাত্র— হে মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না!

মায়াই বটে— বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়াস্বপ্ন।

ভুল করিয়া শাম্ব সেদিন সরসীতীরে আসিয়াছিলেন— জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না— শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণালভুজ-আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব! পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল— কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।— অভিশপ্ত শাম্ব দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভক্ষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগানদীতীরে সূর্যকে স্তবে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্বপাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।

সেই অবধি এই অর্কক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিলে সর্বপাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ হয়। ঐ যে অর্কবট দেখা যায়, সূর্য স্বয়ং এখানে আসিয়া ঐ রূপ ধারণ করিয়াছেন; তিন পক্ষ কাল এই বটতরুতলে বসিয়া সূর্যমন্ত্র জপ করিলে মানব তৎক্ষণাৎ চরম সদ্গতি লাভ করে। এখানে রথযাত্রা-দর্শন-মাত্রে সূর্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ ঘটে। যে পুণ্যজন এইখানে আসিয়া অনন্যমনে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি ধন্য।— অর্কক্ষেত্রের মহিমা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। কপিলসংহিতা-রচয়িতা শত শ্লোকে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই ঘোর কলির অভ্যুদয়ে সে প্রাচীন শ্লোকসমূহও ব্যর্থ। সংহিতা কে শুনে? বিধি কে মানে? মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র যেমন মাইল পথ সরিয়া গিয়াছে, যাত্রীর প্রবাহও সেইরূপ অর্কক্ষেত্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া ঠেকিয়াছে।—রৌদ্রদীপ্ত নারিকেলতরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখা যায়।

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাতুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ তীর্থ-উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।— কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন রূপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে— অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া যা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। মনে হয়—

যত্নপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।

রচনা : ১৩০০ বঙ্গাব্দ

শিল্প ও দেহতত্ত্ব

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুর নোটিস যে দিচ্ছে, ঘটনা যেমন ঘটেছে তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া দেওয়া ছাড়া সে বেচারা অনন্যগতি ; সে যদি ভাবে সে একটা কিছু রচনা করছে তো সেটা তার মস্ত ভ্রম। ডুবুরি সমুদ্রের তলা ঘেঁটে মুক্তার শুক্তি তুলে আনে, খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার, কিন্তু সে কি বলাতে পারে আপনাকে মুক্তাহারের রচয়িতা, না, যে পাহাড় পর্বত দেশে বিদেশে ঘুরে ফটোগ্রাফ তুলে আনছে সে নিজেকে চিত্রকর বলে' চালিয়ে দিতে পারে আর্টিষ্ট-মহলে ? একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাস লেখা চলে, কিন্তু যে জিনিষগুলো নিয়ে আর্টের ইতিহাস তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয়, রসবেত্তা— নেপোলিয়ান বীর-রসের আর্টিষ্ট, তাঁর হাতে ইউরোপের ইতিহাস সৃষ্ট হল, সীজার আর্টিষ্ট গ'ড়লে রোমের ইতিহাস। যে ডুবে' তোলে সে তোলে মাত্র বুদ্ধিবলে ; আর যে গড়ে' তোলে সে ভাঙাকে জোড়া লাগায় না শুধু, সে বেজোড় সামগ্রীও রচনা করে' চলে মন থেকে। ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মতো সুনির্দিষ্ট শক্ত জিনিষ, এক চুল তার চেহারার অদল বদল করার স্বাধীনতা নেই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক কবি শিল্পী এঁদের হাতে পাষাণও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে কাদার মতো নরম হয়ে যায়, রচয়িতা তাকে যথা ইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে সেটা বড়ই সুঘটন বা সুগঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে' দেয়। ঠিকে যদি ভুল হয়ে যায় তবে সব অঙ্কটাই ভুল হয় ; অঙ্কনের বেলাতেও ঠিক ওই কথা। কিন্তু পাটিগণিতের ঠিক আর খাঁটি গুণীদের ঠিকের প্রথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র— নামতা ঠিক রইলো তো অঙ্ককর্তা বললেন ঠিক হয়েছে, কিন্তু নামেই ছবিটা ঠিক মানুষ হলো কি গরু গাধা বা আর কিছু হলো, রসের ঠিকানা হলো না ছবির মধ্যে, অঙ্কনকর্তা বলে' বসলেন, ভুল ! ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিষ্টের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিষ্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায় না রস, রসের ছাঁদ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা, হাড়মাসের ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস, কিন্তু মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে' ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়হদ্দ ভিতর-বাহিরে। একটা গাছের বীজ, সে তার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনটি পেয়েছে সেই ভাবেই যখন হাতে পড়লো, তখন সে গোলাকার কি চেপ্টা ইত্যাদি, কিন্তু সে থলি থেকে মাটিতে পড়েই রসের সঞ্চার নিজের মধ্যে যেমনি

অনুভব করলে অমনি বদলে চলল নিজেই নিজের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই ; যার বাহু ছিল না চোখ ছিল না, যে লুটিয়ে ছিল মাটির তলায় নীরস কঠিন বীজকোষে বদ্ধ হ'য়ে, সে উঠলো মাটি ঠেলে, মেলিয়ে দিলে হাজার হাজার চোখ আর হাত আলোর দিকে আকাশের দিকে বাতাসের উপরে, নতুন শরীর নতুন ভঙ্গি লাভ করলে সে রসের প্রেরণায়, গোলাকার বীজ ছত্রাকার গাছ হয়ে শোভা পেলে, বীজের anatomy লুকিয়ে পড়লো ফুলের রেণুতে পাকা ফলের শোভার আড়ালে। বীজের হাড়হদ্দ ভেঙে তার anatomy চুরমার করে' বেরিয়ে এল গাছের ছবি বীজকে ছাড়িয়ে। গাছ যে রচলে তার রচনায় ছাঁদ ও anatomyর দোষ দেবার সাহস কারু হল না, উল্টে বরং কোন কোন মানুষ তারই রচনা চুরি করে' গাছপালা আঁকতে বসে গেল— বীজতত্ত্বের বইখানার মধ্যে ফেলে রেখে দিলে যে অস্থিপঞ্জরের মতো শক্ত পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল বীজের প্রাণ তার প্রকৃত anatomyর হিসেব। বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomyর বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্তির anatomy দিয়ে মানসমূর্তির anatomyর দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা। anatomyর একটা অচল দিক আছে, যেটা নিয়ে এক রূপের সঙ্গে আর রূপের সুনির্দিষ্ট ভেদ, কিন্তু anatomyর একটা সচল দিকও আছে সেটা নিয়ে মানুষে মানুষে বা একই জাতের গাছে গাছে ও জীবে জীবে বাঁধা পার্থক্য একটুখানি ভাঙে— কোন মানুষ হয় তালগাছের মতো, কেউ হয় ভাঁটার মতো, কোন গাছ ছড়ায় ময়ূরের মতো পাখা, কেউ বাড়ায় ভূতের মতো হাত! প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বইখানাতে দেখবে মেঘের সুনির্দিষ্ট গোটাকতক গড়নের ছবি দেওয়া আছে— বৃষ্টির মেঘ, ঝড়ের মেঘ— সবার বাঁধা গঠন কিন্তু মেঘে যখন বাতাস লাগলো রস ভরলো তখন শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া মূর্তি সব ফুটতে থাকলো, মেঘে মেঘে রং লাগলো অদ্ভুত অদ্ভুত, সাদা ধোঁয়া ধুমধাম করে সেজে এল লাল নীল হলদে সবুজ বিচিত্র সাজে, দশ অবতারের রং ও মূর্তিকে ছাড়িয়ে দশ সহস্র অবতার! সচিত্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পুঁথি খুলে' সে সময় কোন্ রসিক চেয়ে দেখে মেঘের রূপগুলোর দিকে ? এই যে মেঘের গতিবিধির মতো সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারায় রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান পরিমাণ দিয়ে থাকেন। মানুষের তৃষ্ণা ভাঙতে যতটুকু জল দরকার তার পরিমাণ বুঝে জলের ঘটি একরকম হল, মানুষের স্নান করে' শীতল হ'তে যতটা জল দরকার তার হিসেবে প্রস্তুত হ'ল ঘড়া জালা ইত্যাদি ; সুতরাং রসের বশে হল আধারের মান পরিমাণ আকৃতি পর্যন্ত। যার কোন রসজ্ঞান নেই সেই শুধু দেখে পানীয় জলের ঠিক আধারটি হচ্ছে চৌকোনা

পুকুর, ফটিকের গেলাস নয়, সোণার ঘটিও নয়। গোয়ালের গরু হয়তো দেখে পুকুরকে তার পানীয় জলের ঠিক আধার, কিন্তু সে যদি মানুষকে এসে বলে, 'তোমার গঠন সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞান নেই, কেননা জলাধার তুমি এমন ভুল রকমে গড়েছ যে পুকুরের সঙ্গে মিলছেই না', তবে মানুষ কি জবাব দেয়?

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাঠি ঘটনাকে চুল চিরে' ভাগ করে দেখিয়ে দেয়, ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না, কাযেই জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাযের জন্য চলে তার মাপকাঠি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে, রসকে রূপে পরিণত করতে হয়, কাযেই তার হাতের মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, রূপকথার সোণার রূপোর কাঠির মতো অদ্ভুত শক্তিমান। ঘটনা যাকে কুড়িয়ে ও খুঁড়ে তুলতে হয় ঠিক ঠিক খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র, মানুষের ভৌতিক শরীরটার কারখানা নিয়ে যখন কারবার ঠিক ঠিক মাংসপেশী অস্থিপঞ্জর ইত্যাদির ব্যবচ্ছেদ করার শূল ও শলাকা ইত্যাদি হল তখন মৃত্যুবাণ, কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে সেখানে কোদাল কুড়ুল শূল শাল কিছু চলে না, রচয়িতার নিজের অস্থিপঞ্জর এবং ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ, যেখানে ছবি ঘনিয়ে আসে মেঘের মতো, রস ফেনিয়ে ওঠে, রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা আপনি। সেই সমস্ত রসের ও রূপের ছিটেফোঁটা যথোপযুক্ত পাত্র বানিয়ে ধরে দেয় রচয়িতা আমাদের জন্যে। এখন রচয়িতা রস বুঝে রসের পাত্র নির্বাচন করে' যখন দিচ্ছে তখন রসের সঙ্গে রসের পাত্রটাও স্বীকার না করে' যদি নিজের মনোমত পাত্রে রসটা ঢেলে নিতে যাই তবে কি ফল হবে? ধর, রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে' ধরে' আনলেন রচয়িতা, পাত্র ও তার অন্তর্নিহিত রসের চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়ে, এখন সেই রচয়িতার আধারকে ভেঙে রৌদ্ররস যদি মুঠোম-হাত-পরিমিত anatomy-দোরস্ত আমার একটা ফটোগ্রাফের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে করি তো রৌদ্র হয় করুণ নয় হাস্যরসে পরিণত না হয়ে যাবে না; কিম্বা ছোট মাপের পাত্রে না ঢুকে রসটা মাটি হবে মাটিতে পড়ে'।

হারমোনিয়ামের anatomy, বীণার anatomy, বাঁশীর anatomy রকম রকম বলেই সুরও ধরে রকম রকম, তেমনি আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা

বাহিত হয় আর্টের জগতে, আকারের মধ্যে নির্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই। হাড়ের পঞ্জরের মধ্যে মাংসপেশী দিয়ে বাঁধা আমাদের এতটুকু বুক, প্রকাণ্ড সুখ প্রকাণ্ড দুঃখ প্রকাণ্ড ভয় এতটুকু পাত্রে ধরা মুস্কিল। হঠাৎ এক-এক সময়ে বুকটা অতিরিক্ত রসের ধাক্কায় ফেটে যায়; রসটা চাইলে বুককে অপরিমিত রকমে বাড়িয়ে দিতে, কিম্বা দমিয়ে দিতে; আমাদের ছোট পিঁজ্‌রে হাড়ে আর তাঁতে নিরেট করে বাঁধা, স্থিতি-স্থাপকতা কিম্বা সচলতা তার নেই, অতিরিক্ত ষ্টিম্ পেয়ে বয়লারের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রস বুকের মধ্যে এসে পাত্রটায় যে প্রসারণ বা আকুঞ্চন চাইলে, প্রকৃত মানুষের anatomy সেটা দিতে পারলে না; কাযেই আর্টিষ্ট যে, সে রসের ছাঁদে কমে বাড়ে ছন্দিত হয় এমন একটা সচল তরল anatomy সৃষ্টি করে' নিলে যা অন্তর এবং বাইরে সুসঙ্গত ও সুসংহত। রসকে ধরবার উপযুক্ত জিনিষ বিচিত্র রং ও রেখা সমস্ত গাছের ডালের মতো, ফুলের বোঁটার মতো, পাতার ঝিলিমিলির মতো তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল। ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে— সীসের টাইপ থেকে যেমন ছাপ ওঠে— ছবি ফোটে না। পারিজাতের মতো বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো আর্টিষ্টের কায, সুতরাং তার মন্ত্র মানুষের শরীর-যন্ত্রের হিসেবের খাতার লেখার সঙ্গে, এমন-কি বাস্তব জগতের হাড়হদ্দের খবরের সঙ্গে মেলানো মুস্কিল। অভ্র-বিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সম্বর্ত ইত্যাদি নাম-রূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে— কিন্তু কবিতা কি গান রচনার বেলা ঐ সব পেঁচালো নামগুলো কি বেশী কাযে আসে? মেঘের ছবি আঁকার বেলাতেও ঠিক পুঁথিগত ঘোরপেঁচ এমন-কি মেঘের নিজমূর্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাযে আসে না। রচিত যা তার মধ্যে বসবাস করলেও রচয়িতা চায় নিজের রচনাকে। সোণার খাঁচার মধ্যে থাকলেও বনের পাখী সে যেমন চায় নিজের রচিত বাসাটি দেখতে, রচয়িতাও ঠিক তেমনি দেখতে চায় নিজের মনোগতটি গিয়ে বসলো নিজের মনোমত করে' রচা রং রেখা ছন্দোবন্ধ -ঘেরা সুন্দর বাসায়। কোকিল সে পরের বাসায় ডিম পাড়ে— নামজাদা মস্ত পাখী। কিন্তু বাবুই সে যে রচয়িতা, দেখতে এতটুকু কিন্তু বাসা বাঁধে বাতাসের কোলে— মস্ত বাসা। আমাদের সঙ্গীতে বাঁধা অনেকগুলো ঠাট আছে, যে লোকটা সেই ঠাটের মধ্যেই সুরকে বেঁধে রাখলে সে গানের রচয়িতা হল না, সে নামে রাজার মতো পূর্বপুরুষের রচিত রাজগীর ঠাটটা মাত্র বজায় রেখে চলল ভীরু, কিন্তু যে রাজত্ব পেয়েও রাজত্ব হারাবার ভয় রাখলে না, নতুন রাজত্ব জিতে নিতে চলল, সেই সাহসীই হল রাজ্যর রচয়িতা বা রাজা এবং এই স্বাধীনচেতারাই হয় সুরের ওস্তাদ। সুর লাগাতে পারে তারাই যারা সুরের ঠাট মাত্র ধরে' থাকে না, বেসুরকে সুরে ফেলে।

মানুষের anatomyতেই যদি মানুষ বদ্ধ থাকতো, দেবতাগুলোকে ডাকতে যেতে পারতো কে? কার জন্যে আসতো নেমে স্বর্গ থেকে ইন্দ্ররথ, পুষ্পক রথে চড়িয়ে লঙ্কা থেকে কে আনতো সীতাকে অযোধ্যায়? ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু আপনার anatomy ভাঙতে সুরু করলে, বানরের মতো পিঠের সোজা শিরদাঁড়াকে বাঁকিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো দুই পায়ে ভর দিয়ে, গাছে গাছে ঝুলতে থাকলো না। প্রথমেই যুদ্ধ হল মানুষের নিজের anatomyর সঙ্গে, সে তাকে আস্তে আস্তে বদলে নিলে আপনার চলন-বলনের উপযুক্ত করে। বীজের anatomy নাশ করে যেমন বার হল গাছ, তেমনি বানরের anatomy পরিত্যাগ করে মানুষের anatomy নিয়ে এল মানুষ; ঠিক এই ভাবেই medical anatomy নাশ করে আর্টিষ্ট আবিষ্কার করলে artistic anatomy, যা রসের বশে কমে বাড়ে, আঁকে বাঁকে, প্রকৃতির সব জিনিষের মতো— গাছের ডালের মতো, বৃন্তের মতো, পাপড়ির মতো, মেঘের ঘটার মতো, জলের ধারার মতো। রসের বাধা জন্মায় যাতে এমন সব বস্তু কবিরা টেনে ফেলে দেন— নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। লয়ে লয়ে না মিললে কবিতা হল না, এ কথা যার একটু কবিত্ব আছে সে বলবে না; তেমনি আকারে আকারে না মিললে ফটোগ্রাফ হল না বলতে পারি, কিন্তু ছবি হল না এ কথা বলা চলে না। 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান' শুনতে বেশ লাগলো, 'ছেলেটি কার্তিকের মতো' দেখতে বেশ লাগলো, কিন্তু কবিতা লিখলেই কি কাশীদাসী সুর ধরতে হবে, না, ছেলে আঁকতে হলেই পাড়ার আদুরে ছেলের anatomy কাপি করলেই হবে? গণেশের মূর্তিটিতে আমাদের ঘরের ও পরের ছেলের anatomy যেমন করে ভাঙা হয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়। হাতী ও মানুষের সমস্তখানি রূপ ও রেখার সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে একটা নতুন anatomy পেয়ে এল, কাযেই সেটা আমাদের চক্ষে পীড়া দিচ্ছে না, কেননা সেটা ঘটনা নয়, রচনা। আরব্য-উপন্যাসের উড়ন্ত সতরঞ্চির কল্পনা বাস্তব জগতে উড়োজাহাজ দিয়ে সপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কি আমাদের কাছে নগণ্য হয়েছিল, না, অবাধ কল্পনার সঙ্গে গল্পের ঠাট মিলছে কিন্তু বিশ্বরচনার সঙ্গে মিলছে না দেখে গালগল্প-রচনার বাদশাকে কেউ আমরা দুষেছি? প্রত্যেক রচনা তার নিজের anatomy নিয়ে প্রকাশ হয়; ঠাট বদলায় যেমন প্রত্যেক রাগরাগিণীর, তেমনি ছাঁদ বদলায় প্রত্যেক ছবির কবিতার রচনার বেলায়। ধর, যদি এমন নিয়ম করা যায় যে কাশীদাসী ছন্দ ছাড়া কবিরা কোনো ছন্দে লিখতে পারবে না— যেমন আমরা চাচ্ছি ডাক্তারি anatomy ছাড়া ছবিতে আর কিছু চলবে না— তবে কাব্যজগতে ভাবের ও ছন্দের কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়— সুরের বদলে থাকে শুধু দেশজোড়া কাশী

আর রচয়িতার বদলে থাকে কতকগুলি দাস। কাযেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে 'কবয়ঃ নিরঙ্কুশাঃ' বলে, কিন্তু বাস্তব জগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা, আর ছবি আট্‌কে থাকবে ফটোগ্রাফারের বাক্সর মধ্যে—জালার মধ্যে বাঁধা আরব্য-উপন্যাসের জিন্‌পরীর মতো সুলেমানের-সিলমোহর-আঁটা চিরকালই, এ কোন্‌দেশী কথা? ইউরোপ, যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন সিলমোহর মায় জালা পর্যন্ত ভেঙে কি সঙ্গীতে, কি চিত্রে, ভাস্কর্যে, কবিতায় সাহিত্যে, বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে ; আর আমাদের আর্ট যেটা চিরকাল মুক্ত ছিল তাকে ধরে ডানা কেটে পিঁজ্‌রের মধ্যে ঠেসে পুরতে চাচ্ছি আমরা। বড় পা'কে ছোট জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে চীনের রাজকন্যার যা ভোগ ভুগতে হয়েছে সেটা কষা জুতোর একটু চাপ পেলেই আমরা অনুভব করি— পা বেরিয়ে পড়তে চায় চট্‌ করে জুতো ছেড়ে, কিন্তু হায়! ছবি— সে কি না আমাদের কাছে শুধু কাগজ, সুর— সে কিনা শুধু খানিক গলার শব্দ, কবিতা— সে কিনা ফর্মা-বাঁধা বই ; তাই তাদের মুচড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে চামড়ার থলিতে ভরে দিতে কষ্টও পাইনে ভয়ও পাইনে।

অন্যথা-বৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিষ, এই অন্যথাবৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়াপত্তন হল, অন্যথাবৃত্তি কবির চিত্ত মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা— ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ। ধূম আলো আর জল-বাতাস যার শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তো সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধি মাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠাট কবি তখন মেঘকে হয়তো মেঘই রাখলেন, কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধূম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা বস্তুতে শক্ত করে বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথাবৃত্তি কবিতার সর্বস্ব, তখনো যেমন এখনো তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্যথা হচ্ছে—

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথভোলা,
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে—
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা!
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে,
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্ খানে।

নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।

ভাব ও রসের অন্যথাবৃত্তি পেয়ে মেঘ এখানে নতুন সচল anatomyতে রূপান্তরিত হল। এখন, বলতে পারো মেঘকে তার স্বরূপে রেখে কবিতা লেখা যায় কি না? আমি বলি যায়, কিন্তু অভ্র-বিজ্ঞানের হিসেব মেঘের রূপকে যেমন ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায়, সে ভাবে লিখলে কবিতা হয় না, রঙের ছন্দ বা ছাঁদ, সুরের ছাঁদ, কথার ছাঁদ দিয়ে মেঘের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ ছাঁদ না বদলালে কবিতা হতে পারে না, যেমন—

আজি বর্ষা রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।

মনে হবে অপ্রাকৃত কিছু নেই এখানে, কিন্তু কালো শুধু বলা চলল না, কোমল কালো না হলে ভেসে চলতে পারলো না আকাশে বাতাসে রঙের স্রোত বেয়ে কবির মানসকমল থেকে খসে-পড়া-সুর-বোঝাই পাপড়িগুলি সেই দেশের খবর আনতে যে দেশের বাদল-বাউল একতারা বাজাচ্ছে সারা বেলা। সকালের প্রকৃত মূর্তিটা হল মেঘের কালোয় একটু আলো, কিন্তু টান-টোনের কোমলতা পাতার হিলিমিলি নানা রঙের ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন; মেঘের শরীর আলোর কম্পন পেলে, ফটোগ্রাফের মেঘের মতো চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো না। বর্ষার শেষ-রাত্রে সত্যিকার মেঘ যে ভাবে দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়, সকালের মধ্যে মিলিয়ে দেয় তার বাঁধারূপ, ঠিক সেই ভাবের একটি গতি পেলে কবির রচনা। সকালে মেঘে একটু আলো পড়েছে এই ফটোগ্রাফটি দিলে না কবিতা; আলো, মেঘ, লতা-পাতার গতিমান ছন্দে ধরা পড়লো শেষ বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘলোকের লীলা-হিল্লোল। রচনার মধ্যে এই যে রূপের রসের চলাচল গতাগতি, এই নিয়ে হল তফাত ঘটনার নোটিসের সঙ্গে রচনার প্রকৃতির। নোটিস সে নির্দেশ করেই থামলো, রচনা চলে গেল গাইতে-গাইতে হাসতে-হাসতে নাচতে-নাচতে মনের থেকে মনের দিকে এক কাল থেকে আর এক কালে বিচিত্র ভাবে। কবিতায় বা ছবিতে এইভাবে চলায়মান রং রেখা রূপ ও ভাব দিয়ে যে রচনা তাকে আলঙ্কারিকেরা গতিচিত্র

বলেন— অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব কোন বস্তুবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপসংস্থানকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু রেখার রঙের ও ভাবের গতাগতি দিয়ে রসের সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে আসা-যাওয়া করে। বীণার দুই দিকে বাঁধা টানা তারগুলি সোজা লাইনের মতো অবিচিত্র নির্জীব আছে— বলছেও না চলছেও না। সুর এই টানা তারের মধ্যে গতাগতি আরম্ভ করলে অমনি নিশ্চল তার চঞ্চল হল গীতের ছন্দে, ভাবের দ্বারা সজীব হল, গান গাইতে লাগলো, নাচতে থাকলো তালে তালে। পর্দায় পর্দায় খুলে গেল সুরের অসংখ্য পাপড়ি। সোজা anatomyর টানা পাঁচিল ভেঙে বার হল সুরের সুরধুনী-ধারা, নানা ভঙ্গিতে গতিমান। আকাশ এবং মাটি এরই দুই টানের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের anatomy-দোরস্ত শরীর। দুই খোঁটায় বাঁধা তারের মতো, এই হল ডাক্তারি anatomyর সঠিক রূপ। আর বাতাসের স্পর্শে আলোর আঘাতে গাছ-ফুল-পাতা-লতা এরা লতিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে শাখা-প্রশাখার আঁকাবাঁকা নানা ছন্দের ধারায়; এই হচ্ছে artistic anatomyর সঠিক চেহারা। আর্টিষ্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্যবান, কাযেই রসবণ্টনের বেলায় রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে ধরে দেয় ছোট বড় নানা আকারে ইচ্ছামত। এই পাত্রসমস্যা শুধু যে ছবি লিখছে তাকেই যে পূরণ করতে হয় তা নয়, রসের পাত্রপাত্রীর anatomy নিয়ে গণ্ডগোল রঙ্গমঞ্চে খুব বেশী রকম উপস্থিত হয়। নানা পৌরাণিক ও কাল্পনিক সমস্ত দেবতা উপদেবতা পশুপক্ষী যা রয়েছে তার anatomy ও model বাস্তব জগৎ থেকে নিলে তো চলে না। হরেরামপুরের সত্যি রাজার anatomy রাজশরীর হলেও রঙ্গমঞ্চের রাজা হবার কাযে যে লাগে তা নয়, একটা মুটের মধ্যে হয়তো রাম রাজার রসটি ফোটাবার উপযুক্ত anatomy খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর anatomy হয়তো সীতা সাজবার কালে লাগলো না, একজন ছেলের anatomy দিয়ে দৃশ্যটার মধ্যে উপযুক্ত রসের উপযুক্ত পাত্রটি ধরে দেওয়া গেল। পাখীর কি বানরের কি নারদের ও দেবদেবীর ভাবভঙ্গি চলন বলন প্রভৃতির পক্ষে যেরকম শরীর-গঠন উপযুক্ত বোধ হল অধিকারী সেই হিসেবে পাত্রপাত্রী নির্বাচন বা সজ্জিত করে নিলে; যেখানে আসল মানুষের উচ্চতা রচয়িতার ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না সেখানে রণ্‌পা দিয়ে anatomical মাপ বাড়িয়ে নিতে হল, যেখানে আসল দু হাতের মানুষ কাযে এল না সেখানে গড়া হাত গড়া ডানা ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি ভাঙ্গাচোরা দিয়ে নানা রসের পাত্রপাত্রী সৃষ্টি করতে হল বেশকারকে— রচয়িতার কল্পনার সঙ্গে অভিনেতার রূপের সামঞ্জস্য এইভাবে লাভ করতে হল নাটকে! কল্পনামূলক যা

তাকে প্রকৃত ঘটনার নিয়মে গাঁথা চলে না, আর ঘটনামূলক নাটক সেখানেও একেবারে পাত্রপাত্রীর সঠিক চেহারাটি নিয়ে কাজ চলে না, কেননা যে ভাব যে রস ধরতে চেয়েছেন রচয়িতা তা রচয়িতার কল্পিত পাত্রপাত্রীর চেহারার সঙ্গে যতটা পারা যায় মেলাতে হয় বেশকারকে। এক-একজন বেশ সুঠাম সুশ্রী, পাঠও করতে পারলে বেশ, কিন্তু তবু নাটকের নায়ক-বিশেষের পার্ট তাকে দেওয়া গেল না, কেননা সেখানে নাটক-রচয়িতার কল্পিতের সঙ্গে বিশ্ব-রচয়িতার কল্পিত মানুষটির anatomy-গঠন ইত্যাদি মিললো না। ছবিতেও তেমনি কবিতাতেও তেমনি, ভাবের ছাঁদ অনেক সময়ে মানুষের কি আর-কিছুর বাস্তব ও বাঁধা ছাঁদ দিয়ে পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ করা যায় না, অদল বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল-বদল সয় তা আর্টিষ্ট যে রসমূর্তি রচনা করছে সেই ভাল বুঝবে, আর কেউ তো নয়। চোখে দেখছি যে মানুষ যেসব গাছপালা নদ-নদী পাহাড়-পর্বত আকাশ— এরই উপরে আলো-আঁধার ভাব-ভঙ্গি দিয়ে বিচিত্র রস সৃজন করে চললেন যাঁর আমরা রচনা তিনি, আর এই-যে নানা রেখা নানা রং নানা ছন্দ নানা সুর এদেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষ নিজের কল্পিতটি। মানুষ বিশ্বের আকৃতির প্রতিকৃতি নিজের রচনায় বর্জন করলে বটে, কিন্তু প্রকৃতিটি ধরলে অপূর্ব কৌশলে যার দ্বারা রচনা দ্বিতীয় একটা সৃষ্টির সমান হয়ে উঠলো। এই-যে অপূর্ব কৌশল যার দ্বারা মানুষের রচনা মুক্তিলাভ করে ঘটিত জগতের ঘটনা সমস্ত থেকে, এটা কিছুতে লাভ করতে পারে না সেই মানুষ যে এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত দিকটার খবরই নিয়ে চলেছে, রসের অমূর্ততা মূর্তকে যেখানে মুক্ত করছে সেখানের কোন সন্ধান নিচ্ছে না, শুধু ফটো-যন্ত্রের মতো আকার ধরেই রয়েছে, ছবি ওঠাচ্ছে মাত্র, ছবি ফোটাচ্ছে না। মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়াবাদী কতক কায়াবাদী; এদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ লেগেই আছে। একজন বলছে, কায়ার উপযুক্ত পরিমাণ হোক ছায়ামায়া সমস্তই; আর একজন বলছে, তা কেন, কায়া যখন ছায়া ফেলে সেটা কি খাপে খাপে মেলে শরীরটার সঙ্গে, না নীল আকাশ রঙের মায়ায় যখন ভরপুর হয় তখন সে থাকে নীল, বনের শিয়রে যখন চাঁদনী মায়াজাল বিস্তার করলে তখন বনের হাড়হদ্দ সব উড়ে গিয়ে শুধু যে দেখ ছায়া, তার কি জবাব দেবে? মায়াকে ধরে রয়েছে কায়া, কায়াকে ঘিরে রয়েছে মায়া; কায়া অতিক্রম করছে মায়া দিয়ে আপনার বাঁধা রূপ, মায়া সে নিরূপিত করছে উপযুক্ত কায়া দ্বারা নিজেকে। জাগতিক ব্যাপারে এটা নিত্য ঘটছে প্রতি মুহূর্তে। জগৎ শুধু মায়া কি শুধু কায়া নিয়ে চলছে না, এই দুইয়ের সমন্বয়ে চলেছে; তাই বিশ্বের ছবি এমন চমৎকার ভাবে আর্টিষ্টের মনটির সঙ্গে যুক্ত

হতে পারছে। এই-যে সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথা কায়া মায়া ফুল আর তার রঙের মতো শোভা পাচ্ছে, anatomyর artistic ও inartistic সব রহস্য এরই মধ্যে লুকোনো আছে। রূপ পাচ্ছে রসের দ্বারা অনির্বচনীয়তা, রস হচ্ছে নির্বচনীয় যথোপযুক্ত রূপ পেয়ে; রূপ পাচ্ছে প্রসার রসের, রস পাচ্ছে প্রসার রূপের; এই একে একে মিলনে হচ্ছে দ্বিতীয় সৃজন আর্টে, তারপর সুর ছন্দ বর্ণিকা ভঙ্গ ইত্যাদি তৃতীয় এসে তাকে করে তুলছে বিচিত্র ও গতিমান। ওদিকে এক রচয়িতা এদিকে এক রচয়িতা, মাঝে রয়েছে নানা রকমের বাঁধা রূপ; সেগুলো দুদিকের রঙ্গ-রসের পাত্র-পাত্রী হয়ে চলেছে— বেশ বদলে' বদলে', ঠাট বদলে' বদলে'— অভিনয় করছে নাচছে গাইছে হাসছে কাঁদছে চলাফেরা করছে! রচকের অধিকার আছে রূপকে ভাঙতে রসের ছাঁদে। কেননা রসের খাতিরে রূপের পরিবর্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম; দিন চলেছে, রাত চলেছে, জগৎ চলেছে রূপান্তরিত হ'তে হ'তে, ঋতুতে ঋতুতে রসের প্রেরণাটি চলেছে, গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত রূপের নিয়ম বদলাতে বদলাতে পাতায় পাতায় ফুলে ফলে ডালে ডালে! শুধু এই নয়, যখন রস ভরে' উঠলো তখন এতখানি বিস্তীর্ণ পাত্রেও রস ধরলো না— গন্ধ হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো রস, রঙে রঙে ভরে' দিলে চোখ, উথলে পড়লো রস মধুকরের ভিক্ষাপাত্রে, এই-যে রসজ্ঞানের দাবী এ সত্য দাবী, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে স্পর্ধার দাবী নয়, সত্যগ্রহীর দাবী। ডাক্তারের দাবী, ঐতিহাসিকের দাবী, সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে একে তো অমান্য করা চলে না। আর্টিষ্ট যখন কিছুকে যা থেকে তা'তে রূপান্তরির্ত করলে তখন সে যা-তা করলে তা নয়, সে প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করলে না, উল্টে বরং বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমুক্তির নিয়মকে স্বীকার করলে, প্রমাণ করে চলল হাতে কলমে। আর যে মাটিতেই হোক বা তেল-রঙেতেই হোক রূপের ঠিক ঠিক নকল করে চলল সে আঙুরই গড়ুক বা আমই গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত হল, কেননা সে বিশ্বের চলাচলের নিয়মকে স্বীকার করলে না প্রমাণও করলে না কোন কিছু দিয়ে— অলঙ্কারশাস্ত্রমত তার কাজ পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট হল। রক্তচলাচলের খাদ্যচলাচলের পক্ষে যে ভৌতিক শরীরগঠন অস্থিসংস্থান তার মধ্যে রসাধার আর একটি জিনিষ আছে যার anatomy ডাক্তার খুঁজে পায়নি এপর্যন্ত। বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাঁচে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাঁচে ঢালা একেবারেই নয়, সুতরাং সে স্বাধীনভাবে রসের সম্পর্কে আসে, এ যেন এতটুকু খাঁচায় ধরা এমন একটি পাখী যার রসমূর্তি বিরাটের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে,

বচনাতীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখীর মালিক হয়ে এসেছে কেবল মানুষ, আর কোন জীব নয়। বাস্তব জগৎ যেখানে সীমা টানলে, রূপের লীলা শেষ করলে, সুর থামালে আপনার, সেইখানে মানুষের খাঁচায় ধরা এই মানস পাখী সুর ধরলে, নতুন রূপ ধরে' আনলে অরূপের— জগৎ সংসার নতুন দিকে পা বাড়ালে তবেই মুক্তির আনন্দে। মানুষ তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই যে শুধু মুক্তি দিচ্ছে তা নয়—যাকে দর্শন করছে, যাকে বর্ণনা করছে, তার জন্যে মুক্তি আনছে। আটঘাট-বাঁধা বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে চলেছে এই স্বপ্নে, সুরের মধ্যে গিয়ে বাঁশী তার গাঁঠে গাঁঠে বাঁধা ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম করেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের হৃদয় গিয়ে মিলছে বিশ্বরূপের হৃদয়ে— এই স্বপ্নের পথ। বীণার সেই anatomyটাই বীণার সত্য anatomy, এ সত্য আর্টিষ্টমাত্রকেই গ্রহণ করতে হয় আর্টের জগতে ঢোকার আগেই, না হলে সচরাচরকে ছাড়িয়ে সে উঠতে ভয় পায়। পড়া পাখী যা শুনলে তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো, রচয়িতার দাবী সে গ্রহণ করতে পারলে কি? মানুষ যা দেখলে তাই এঁকে চলল, রচয়িতার দাবী নিতে পারলে কি সে? নিয়তির নিয়মে যারা ফুল পাতার সাজে সেজে এল, রঙ্গীন ডানা মেলে' নেচে চলল, গেয়ে চলল, তারা কেউ এই বিশ্বসংসারে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, এক যারা স্বপন দেখলে স্বপন ধরলে সেই আর্টিষ্টরা ছাড়া। পাখী পারলে না রচয়িতার দাবী নিতে, কিন্তু আকাশের পাখীকে ধরার ফাঁদ যে মানুষ রচনা করলে মাটিতে বসে' সে এ দাবী গ্রহণ করলে, নিয়তিকৃত নিয়ম -রহিতের নিয়ম যারা পদে পদে প্রমাণ করে চলল নিজেদের সমস্ত রচনায়, তারাই দাবী দিতে পারলে রচয়িতার। কবীর তাই বললেন, "ভরম জঞ্জাল দুখ ধন্দ ভারি"— ভ্রান্তির জঞ্জাল দূর কর, তাতে দুঃখ ও দীনতা আর ঘোর সংশয়; "সত্ত দাবা গহো আপ নির্ভয় রহো"— তোমার যে সত্য দাবী তাই গ্রহণ কর, নির্ভয় হও। যে মানুষ রচয়িতার সত্য দাবী নেয়নি কিন্তু স্বপন দেখলে ওড়বার, সে নিজের কাঁধে পাখীর ডানা লাগিয়ে উড়তে গেল, পরীর মতো দেখতে হল বটে সে, কিন্তু পরচুলো তার বাতাস কাটলে না, ঝুপ করে পড়ে মরলো সে; কিন্তু যে রচয়িতার সত্য দাবী গ্রহণ করলে তার রচনা মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে উড়লো তাকে নিয়ে লোহার ডানা বিস্তার করে আকাশে। মানুষ জলে হাঁটবার স্বপন দেখলে, রচয়িতার দাবী গ্রহণ করলে না— ডুবে মরলো দুপা না যেতে; রচয়িতার রচনা পীয়ের মতো একেবারেই দেখতে হল না, কিন্তু গুরুভারের দ্বারা সে জলের লঘুতাকে জয় ক'রে স্রোতের বাধাকে

তুচ্ছ করে' চলে গেল সে সাত সমুদ্র -পার। মানুষ নিমেষে তেপান্তর মাঠ পার হবার স্বপন দেখলে, রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, খানিক পথে দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হল তার anatomy-দোরস্ত শরীর, তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরলো সে হরিণের মতো; ঘোড়াও দৌড় অবলম্বন করে' যতটা যেতে চায় নির্বিঘ্নে তা পারলে না, রণক্ষেত্রে ঘোড়া মায় সওয়ার পড়ে মরলো। রচয়িতা নিয়ে এলো লোহার পক্ষীরাজ ঘোড়া— যেটা ঘোড়ার মতো একেবারেই নয় হাড়হদ্দ কোন দিক দিয়ে— সৃজন করে' উঠে বসলো, আপন পর সবাইকে নিয়ে নিমেষে ঘুরে এল যোজন-বিস্তীর্ণ পৃথিবী নির্ভয়ে! যা নিয়তির নিয়মে কোথাও নেই তাই হল, জলে শিলা ভাসলো, আকাশে মানুষ উড়লো, ঘুমোতে ঘুমোতে পৃথিবী ঘুরে' এল রচনায় চড়ে' মানুষ! প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত আচরণে দোষ এখানে তো আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষ যখন আয়নার সামনে বসে' চুল ছাঁটে, টেরি বাগায়, ছিটের সার্টে বাংলা anatomyর সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে ভেঙে নেয় নিজের দেহ, কাজল টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেয়সী দেখা দিলে বলে বাহবা— চুলের খোঁপার ঘোরপেঁচ দেখে বাঁধা পড়ে— নিজের কোন সমালোচনা যে মানে না তার কাছে, তখন সে ছবির সামনে এসে anatomyর কথা পাড়ে কেন সে আমার কাছে এক প্রকাণ্ড রহস্য।

ইজিপ্টের লোক এককালে সত্যিই বিশ্বাস করতো, যে জীবন কায়া ছেড়ে চলে যায় আবার কিছুদিন পরে সন্ধান করে করে নিজের ছেড়ে ফেলা কামিজের মতো কায়াতেই এসে ঢোকে। এইজন্যে কায়ার মায়া তারা কিছুতে ছাড়তে পারেনি, ভৌতিক শরীরকে ধরে রাখার উপায় সমস্ত আবিষ্কার করেছিল, একদল কারিগরই তৈরি হয়েছিল ইজিপ্টে যারা 'কা' প্রস্তুত করতো; তাদের কাযই ছিল যেমন মানুষ ঠিক সেই গড়নে পুত্তলিকা প্রস্তুত করা, গোরের মধ্যে ধরে রাখার জন্য; ঠিক এই সব 'কা'-নির্মাতাদের পাশে বসে ইজিপ্টের একদল রচয়িতা artistic anatomyর বৃহত্ত্ব ও অন্যথাবৃত্ত দিয়ে পুত্তলিকা বা 'কা'-নির্মাতাদের ঠিক বিপরীত রাস্তা ধরে গড়েছিল কত কি তার ঠিক নেই, দেবতা মানুষ পশু পক্ষী সবার anatomy ভেঙে চুরে তারা নতুন মূর্তি দিয়ে অমরত্বের সিংহাসনে বসিয়ে গেল। ইজিপ্টের এই ঘটনা হাজার হাজার বৎসর আগে ঘটেছিল; কায়া-নির্মাতা কারিগর ও ছায়া-মায়ার যাদুকর দুই দলই গড়লে, কিন্তু একজনের ভাগ্যে পড়লো মূর্ত যা কিছু তাই, আর একজনের পাত্রে ঝরলো অমূর্ত রস স্বর্গ থেকে— এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন যুগের আর্টের ইতিহাসে হয়নি হবার নয়। ইজিপ্ট তো দূরে, পাঁচ হাজার

দশ হাজার বছর আরো দূরে, এই আজকের আমাদের মধ্যে যা ঘটছে, তাই দেখ না কেন; যারা ছাপ নিয়ে চলেছে মর্ত্য জগতের রূপ সমস্তের, তারা মূর্ত জিনিষ এত পাচ্ছে দেখে সময়ে সময়ে আমারও লোভ হয়— টাকা পাচ্ছে, হাততালি পাচ্ছে, অহংকে খুব বেশী করে পাচ্ছে। আর এরূপ যারা করছে না তারা শুধু আঁকাবাঁকা ছন্দের আনন্দটুকু, ঝিলিমিলি রঙের সুরটুকু বুকের মধ্যে জমা করছে, লোহার সিন্দুক কিন্তু রয়েছে খালি। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই কালে কালে খুব আদর করে আর্টিষ্টদের যা সম্ভাষণ করেছে তা উর্দ্‌তে বলতে গেলে বলতে হয়— খেয়ালী, হিন্দীতে— বাউর বা বাউল, আর সব চেয়ে মিষ্টি হল বাংলা— পাগল। কিন্তু এই পাগল তো জগতে একটি নেই; উপস্থিত দশবিশ লক্ষ কিম্বা তারও চেয়ে হয়তো বেশী এবং অনুপস্থিত ভবিষ্যতের সব পাগলের সর্দার হ'য়ে যে রাজত্ব করছে, উল্কার মতো জ্যোতির্ময় সৃষ্টি রচনা সমস্ত সে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে পথে-বিপথে সৃজনের উৎসব করতে করতে। এমন যে খেয়ালের বাউল, জগতের আগত অনাগত সমস্ত খেয়ালী বা আর্টিষ্ট হল তার চেলা, তারা পথ চলতে ঢেলাই হোক মাণিকই হোক যাই কুড়িয়ে পেলে অমনি সেটাকে যে খুব বুদ্ধিমানের মতো ঝুলিতে লুকিয়ে রাতারাতি আলো আঁধারের ভ্রান্তি ধরে' চোখে ধুলো দিয়ে বাজারে বেচে এল তা নয়— মাটির ঢেলাকে এমন করে' ছেড়ে দিলে যে সেটা উড়ে এসে যখন হাতে পড়লো তখন দেখি সোণার চেয়ে সেটা মূল্যবান, আসল ফুলের চেয়ে হয়ে গেছে সুন্দর! বাঙলায় আমাদের মনে আর্টের মধ্যে অস্থিবিদ্যার কোন্‌খানে স্থান, এই প্রশ্নটা ওঠবার কয়েক শত বৎসর আগে এই পাগলের দলের একজন আর্টিষ্ট এসেছিল। সে জেগে বসে' স্বপন দেখলে— যত মেয়ে শ্বশুরঘরে রয়েছে আসতে পারছে না বাপের বাড়ী, একটা মূর্তিতে সেই সবারই রূপ ফুটিয়ে যাবে! আর্টিষ্ট সে বসে গেল কাদা মাটি খড় বাঁশ রং তুলি নিয়ে, দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমা সোণার কমল হয়ে ফুটে উঠলো দশ দিকে সোণার পাপড়ি মেলে! এ মূর্তি বাঙলার ঘরে ঘরে দেখবে দুদিন পরে, কিন্তু এরও উপরে ডাক্তারি শাস্ত্রের হাত কিছু কিছু পড়তে আরম্ভ হয়েছে সহরে। বাঙলার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে এই মূর্তির মূল ছাঁচ যদি খোঁজ তো দেখবে— তার সমস্তটা artistic anatomyর নিয়মের দ্বারায় নিয়তির নিয়ম অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে ব্যতিক্রম ও অতিক্রমের সিংহাসনে।

রচনা: ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

শ্রীরাজশেখর বসু

যার দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবাক্য (বা শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যান্য দর্শনে আরও কয়েকপ্রকার প্রমাণ মানা হয়।

প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference), এবং আপ্তবাক্য (authority) —এই ত্রিবিধ প্রমাণই আজকাল সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে থাকেন। আপ্তবাক্যের অর্থ— বেদাদিতে যা আছে, অথবা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য। অবশ্য শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর গ্রহণীয়।

বিজ্ঞানী যখন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ক'রে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য নির্ণয় করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করেন। যখন পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করেন তখন অনুমানের আশ্রয় নেন ; যেমন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতির নিয়ম হতে গ্রহণ বা জোয়ার-ভাটা গণনা। বিজ্ঞানী প্রধানত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁকে আপ্তবাক্য অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়।

আদালতের বিচারকের কাছে বাদী-প্রতিবাদীর রেজেস্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি যখন সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তখন অনুমানের সাহায্য নেন। যখন কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত নেন, যেমন রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন তিনি আপ্তবাক্য আশ্রয় করেন।

Scientific mentality— এই বহুপ্রচলিত ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এর অর্থ, গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং সংস্কার ও পক্ষপাত দমন ক'রে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রেই সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন যে তিনি যা স্বচক্ষে দেখেন বা স্বকর্ণে শোনেন তাও ভ্রমশূন্য না হতে পারে, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কেবল নিজের প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত মনে করেন না, অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষও বিচার করেন। তিনি এও জানেন যে অনুমান দ্বারা, বিশেষত আরোহ (induction) পদ্ধতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তার নিশ্চয়

(certainty) সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই সমান সতর্ক ও সূক্ষ্মদর্শী নন।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যতটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত গণ্য হত এখন আর তত হয় না। বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প(hypothesis)ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাঁরা স্বীকার করেন যে সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা(probability)র অধীন। অমুক দিন অমুক সময়ে গ্রহণ হবে— জ্যোতিষীর এই নির্ধারণ ধ্রুবসত্যের তুল্য, কিন্তু কাল ঝড়বৃষ্টি হবেই এমন কথা আবহবিৎ নিঃসংশয়ে বলতে পারেন না।

চার পাঁচ শ বৎসর পূর্বে যখন মানুষের জ্ঞানের সীমা এখনকার তুলনায় সংকীর্ণ ছিল তখন কেউ কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ গণ্য হতেন। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। যিনি খুব শিক্ষিত তিনি শুধু দু-একটি বিষয় উত্তমরূপে জানেন, কয়েকটি বিষয় অল্প জানেন, এবং অনেক বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি জ্ঞানী ও সজ্জন তিনি নিজের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকেন, এবং তার বহির্ভূত কিছু বলে অপরকে বিভ্রান্ত করেন না।

বিজ্ঞানী এবং সর্ব শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্নকারী ক্ষুণ্ণ হয়, কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যেসব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

তুচ্ছ অতুচ্ছ সরল বা দুরূহ যেসকল বিষয় সাধারণে জানতে চায় তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।— ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না? পাতি বা কাগজি নেবু কোন্‌টায় ভাইটামিন বেশী? মিছরির ফুড-ভ্যালু কি চিনির চাইতে বেশী? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয়? নূতন সিমেণ্টের মেঝে ঘামে কেন? উদয়-অস্তের সময় চন্দ্র সূর্য বড় দেখায় কেন? সাপ নাকি শুনতে পায় না? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না? বাসন মাজার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন?

যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও হয় নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না, সরল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ হতে পারে। যাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি

সবগুলির উত্তর নাও জানতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। যদি উপযুক্ত উত্তর দেওয়ায় বাধা থাকে তবে সরলভাবে বলা উচিত, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও নির্ণীত হয় নি', অথবা 'প্রশ্নটির উত্তর বোঝানো কঠিন', অথবা 'উত্তর আমার জানা নেই'। দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন, যা হয় একটা উত্তর না দিলে মান থাকবে না। উত্তরদাতার এই দুর্বলতা বা সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে জিজ্ঞাসুর মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়। আমেরিকান লেখক William Beebe তাঁর 'Jungle Peace' নামক গ্রন্থে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন— These words should be ready for instant use by every honest scientist— 'I don't know'।

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করবার আগে যদি তন্ন তন্ন বিচার করতে হয় তবে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ সতর্ক ও যুক্তিপরায়ণ হয়ে থাকা সহজ নয়। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক কার্যে অনেক সময় অপ্রমাণিত সংস্কারের বশে বা চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে চলেন। এতে বিশেষ দোষ হয় না যদি তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে আসেন তখন তিনিও সাধারণ লোকের মতন অসাবধান হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই অনেক সময় কুযুক্তি বা হেত্বাভাস আশ্রয় করেন। আবার সময়ে সময়ে অশিক্ষিত লোকেরও স্বভাবলব্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দেখা যায় এবং চেষ্টা করলে অনেকেই তা আয়ত্ত করতে পারেন। অল্পদর্শিতা অসতর্কতা ও অন্ধ সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের বিচারে যেরকম ভুল হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

যদুবাবু সুশিক্ষিত লোক। তিনি 'ব্ল্যাক আর্ট' নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! জাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি টেবিল চেয়ার খরগোশ বার করছে, নিজের মুণ্ড উপড়ে ফেলে দু হাত দিয়ে লুফছে, একটা নরকঙ্কালের সঙ্গে নাচতে নাচতে পলকের মধ্যে সেটাকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করছে। শত শত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এমন ব্যাপার অসম্ভব।' যদুবাবু এবং অন্যান্য দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। রঙ্গমঞ্চের ভিতরটা আগাগোড়া কাল কাপড়ে মোড়া। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু মঞ্চের ঠিক বাইরে চারিধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। ভিতরে কোনও বস্তু বা মানুষ কাল

কাপড়ে ঢাকা থাকলে অদৃশ্য হয়, ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়। জাদুকর কাল ঘোমটা পরলে তাঁর মুণ্ড অন্তর্হিত হয়, তখন তিনি একটা কৃত্রিম মুণ্ড নিয়ে লোফালুফি করেন। তাঁর সঙ্গিনী কাল বোরখা প'রে নাচে, বোরখার উপর সাদা কঙ্কাল আঁকা থাকে। বোরখা ফেলে দিলেই রূপান্তর ঘটে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা অনেক শোনা যায়। বিশ্বাসী ভক্তরা বলেন, 'অমুক বাবার দৈবশক্তি মানতেই হবে, শূন্য থেকে নানারকম গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমার কথা না মানতে পার, কিন্তু বড় বড় প্রোফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য তো অবিশ্বাস করতে পার না।' এইরকম সিদ্ধান্ত যাঁরা করেন তাঁরা বোঝেন না যে প্রোফেসর বা উকিল জজ পুলিস-অফিসার ইত্যাদি নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হতে পারেন, কিন্তু 'অলৌকিক' রহস্যের ভেদ তাঁদের কর্ম নয়। জড় পদার্থ ঠকায় না, সেজন্য বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে যা প্রত্যক্ষ করেন তা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠকাবার সম্ভাবনা থাকে তবে চোখে ধুলো দেওয়া বিদ্যায় যাঁরা বিশারদ (যেমন জাদুকর), কেবল তাঁদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হতে পারে। রামায়ণে সীতা বলেছেন, 'অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ'— সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু বিচক্ষণ ওস্তাদের পক্ষেও বাবা স্বামী ঠাকুর প্রভৃতিকে পরীক্ষা করা সাধ্য নয়, কারণ তাঁদের কাপড়-চোপড় বা শরীর তল্লাশ করতে চাইলে ভক্তরা মারতে আসবেন। বৈজ্ঞানিক বিচারের একটি নিয়ম— কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা যদি সরল বা পরিচিত উপায়ে সম্ভবপর হয় তবে জটিল বা অজ্ঞাত বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা অন্যায়।

রামবাবু স্থির করেছেন যে বেলিণ্ডা জেলার লোকে চোর হয়, কারণ, তাঁর এক চাকর ওই জেলার লোক, সে ঘড়ি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ি কাজ করে, সেও রোজ বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরায়। শ্যামবাবু বলেছেন, বেলিণ্ডা জেলার লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অল্প কয়েকটি ঘটনা বা খবর থেকে রামবাবু আরোহ (induction) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই জেলার সকলেই চোর।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরুনিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও মরেছেন। এই দুই আশ্চর্য মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষ গণনা কত বার নিষ্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়, অম্বুবাচীতে অন্য দিনের তুলনায় বেশী বৃষ্টি হবেই, অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে বিপদ হয়, ইত্যাদি ধারণা বহু শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের যা যথার্থ উপায়— পরিসংখ্যান (statistics), তা এ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করেন নি।

বিপিনবাবু স্বজাতির উপর চটা। তিনি এক সভায় বললেন, বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র। তার ফলে তাঁকে খুব মার খেতে হল। বিপিনবাবু এরকম আশঙ্কা করেন নি। পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা কয়েকজনকে ওই কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে ধমক দিয়েছিল, কেউ তর্ক করেছিল, কেউ পাগল ভেবে হেসেছিল, কেউ বা বলেছিল, হাঁ মশায়, আপনার কথা খুব ঠিক। বিপিনবাবু ভাবতে পারেন নি, পৃথক পৃথক লোকের উপর তাঁর উক্তির প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, সমবেত জনতার উপর তেমন না হতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করলে জানতে পারতেন, বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যেপ্রকার, বস্তুসম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সেপ্রকার না হতে পারে।

সাধারণ লোকের বিচারে যে ভুল হয় তার একটি কারণ, প্রচুর প্রমাণ না পেয়েই একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা। এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে ব্যতিক্রম দেখা গেল যে duck-bill (ornithorhyncus) নামক জন্তু স্তন্যপায়ী অথচ অণ্ডজ। অতএব, শুধু এই কথাই বলা চলে যে অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব জরায়ুজ। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, সাদা বেরালের নীল চোখ থাকলে সে কালা হয়। এখন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি, কিন্তু সাদা লোম, নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণসম্বন্ধও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব শুধু বলা চলে, যার লোম সাদা আর চোখ নীল সে বেরাল খুব সম্ভবত কালা।

মিত্র আর মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত আর চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয়—ইত্যাদি প্রবাদের মূলে লেশমাত্র প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশের অতি উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও ফলিত জ্যোতিষ আর মাদুলি-কবচে অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। খবরের কাগজে 'রাজজ্যোতিষী'রা যেরকম বড় বড় বিজ্ঞাপন দেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা প্রচুর রোজগার করেন। আচার্য

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধটি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়া উচিত। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি।—

'কোনও একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা তাহা··· জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান-কার্যই বোধ করি তাঁর প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়।··· অবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য।··· তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না।··· নিজের উপরেও তাঁর বিশ্বাস অল্প।··· কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে··· এই ভয়ে তিনি সর্বদা আকুল। ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু পান না। তাহার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান।··· একটা ঘটনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র ঘটনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

'একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে।··· ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।··· পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না।

চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম begging the question, অর্থাৎ যা প্রশ্ন তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা। প্রশ্ন— কাঠ পোড়ে কেন? উত্তর— কারণ, কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে যা পুড়তে পারে। অতএব উত্তরটি এই দাঁড়ায়— কাঠ পুড়তে পারে সেই জন্যই পোড়ে। প্রশ্নটিকেই উত্তরের আকারে সাজিয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন— ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? উত্তর— তোমার dyspnoea হয়েছে। রোগের নাম শুনে রোগীর হয়তো ডাক্তারের উপর আস্থা বেড়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি হল না; নামটির মানেই কষ্টশ্বাস। আরও উদাহরণ— গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন? কারণ, গাঁজা মাদক দ্রব্য। রবার টানলে বাড়ে কেন? কারণ, রবার স্থিতিস্থাপক। ডি-ডি-টিতে পোকা মরে কেন? কারণ জিনিসটি কীটঘ্ন। খবরের কাগজে এবং রাজনীতিক বক্তৃতায় এইপ্রকার যুক্তি অনেক পাওয়া যায়। যথা— 'প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করিতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল।'

অনেক সময় পূর্বের ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। এরূপ যুক্তিই কাকতালীয় ন্যায় বা post hoc, propter hoc। আমার ফিক ব্যথা ধরেছে, একটা বড়ি খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল। এতে ঔষধের গুণ প্রমাণিত হয় না, ব্যথা আপনিও সারতে পারে। একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম, বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ফল দেখা গেল। এও প্রমাণ নয়, হয়তো যথাকালে আপনিই ফল ধরেছে। বার বার মিল না ঘটলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা প্রায়ই বলেন, যদি গণনা ঠিক হয় তবে মিলতেই হবে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরাও ব'লে থাকেন, যদি ঔষধ-নির্বাচন ঠিক হয় তবে রোগ সারতেই হবে। যদি শতবার অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তাতেও তাঁরা হতাশ হন না; বলেন, গণনা (বা ঔষধ) ঠিক হয় নি। যদি একবার ফললাভ হয় তবে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই দেখ, বলেছিলাম কিনা? যথার্থ গণনার (বা ঔষধের) কি অব্যর্থ ফল!

সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেজন্য অসংখ্য ক্ষেত্রে আপ্তবাক্য মেনে নিতে হয়, কার উপদেশ গ্রহণীয় তা লোকে নিজের শিক্ষা আর সংস্কার অনুসারে স্থির করে। পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে। সরকার বলছেন টিকা নাও, ভটচাজ্যি মশায় বলছেন শীতলা মাতার পূজা কর। যারা মতিস্থির করতে পারে না বা ডবল গ্যারাণ্টি চায় তারা টিকাও নেয় পূজার চাঁদাও দেয়। বাড়িতে অসুখ হলে লোকে নিজের সংস্কার অনুসারে চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক নির্বাচন করে। রেসে বাজি রাখবার সময় কেউ বন্ধুর উপদেশে চলে, কেউ গণৎকারের কথায় নির্ভর করে।

গত এক শ দেড় শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে— বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোকে মনে করে, যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তুর মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক স্পষ্ট মিথ্যা বলে না ; আইন বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম রক্ষা ক'রে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অথবা যা অপদার্থ তাও লোকে অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক স্নো মাখলে রং ফরসা হয়, অমুক তেলে ব্রেন ঠাণ্ডা হয়, অমুক সুধায় নার্ভ চাঙ্গা হয়, অমুক ফাউণ্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের শার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত বিলাতী ব্যবসায়ী ঘোষণা করেছেন— Beware of night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডে পিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোওয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়— এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে, সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম,

'ও কি হচ্ছে?' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতৈলে মারকিউরি আর লেড আছে কি না দেখছি।' প্রশ্ন— 'কেশতৈলে ওসব থাকবে কেন?' উত্তর— 'এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতৈল পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছি কথাটা সত্য কি না।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাক-দন্তগবেষণ, অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সীসে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে, কি সর্বনাশ, তবে তো অন্য তেলে এইসব থাকে। দরকার কি, এই গ্যারাণ্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।

ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মতবিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সর্ব-গ্রাহ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানী লাইসেংকোর প্রজনন-বিষয়ক মত নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যে উগ্র বিতর্ক হয়েছে তার কারণ প্রধানত রাজনীতিক।

যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এইপ্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।

রচনা : ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্যরচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কী রকম হত রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবন-ঘেরা বাড়ি কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিম্বাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি-প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন, আর তাঁর কাব্যসৃষ্টি দু-একখানি মাত্র ছোটখাটো পুঁথি ভ'রে দিত এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্রশালার কোনও মালবিকার মোহ, তাঁর কবি-মর্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারত না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হত, যেমন 'মেঘদূত' ছোট; কিন্তু সংখ্যায় দু-একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য লীলা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠত, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করত। অনুষ্টুপ থেকে স্রগ্ধরা এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মেন নি ব'লে সংস্কৃত ভাষায় যেসব ছন্দ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝংকার ও দোল, এসব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হয়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগত।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানা দিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুররসিক মন ও আশ্চর্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালকবয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রসগ্রহণের সময় হয় নি তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তান ও লয়ে মুগ্ধ করত 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষি দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্‌বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দুটি— কালিদাসের শব্দসম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনিসামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুষ্কেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে।

কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। রঘুবংশের যে প্রারম্ভটা প্রথমযৌবনে নিতান্ত সরল বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কী অদ্ভুত ক্ষমতা!—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কী সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানবদেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এমনি সুসম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

একটি মাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও ব্যালান্স। ভাষাপ্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন শেক্সপীয়রে—

And then it started like a guilty thing
Upon a fearful summons.

...

a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্তি গড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা; ধ্বনি রেখা রঙের অমৃত রসায়ন।—

বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।…
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।…
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।…
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।…

কিছুই আশ্চর্য নয় যে, পূর্বভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পনেরো শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ ক'রে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে

কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে রসমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম ইংরাজী কাব্য-রসিকের মনে হয়। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-যোগ, তা প্রধানত তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়— প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কত দিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন। যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব'য়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈকরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর-একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা আভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে, রামায়ণে, কালিদাসে সমস্ত ভাব রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্ত-রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এ সব কাব্যের ভাব গতানুগতিক কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবিপ্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন নি, সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝল্‌মল্‌ করছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্যের যতিভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলংকারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌' ও 'রোমান্টিসিজ্‌ম্‌'এর অপূর্ব মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্তির মতো চিরসুন্দরের ছন্দে গড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাব ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজী কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য করেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে কচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন টেনিসনের

কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ববর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই ইংরেজী কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তাঁর প্রতিভার ধর্মবৈশিষ্ট্যের পরেই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃতকাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করে নি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের স্বর, ধ্বনি, ভাব ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে।

২

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা; যেমন 'মেঘদূত', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সেকাল', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান'। এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীট্‌স্‌-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথের নিজের 'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে।' বস্তুর জগৎ কবির চিত্তকে রসসমাহিত করে কাব্যের জন্ম দেয়; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট করে এই অভিনব শ্রেণীর কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ে কবি-চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। মেঘদূত ও তার কবি রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবি-কল্পনাকে যে-দোল দিয়েছে এ তারি ফলে নূতন রসসৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রামচরিত রচনার যে-কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় গলে তা এক নতুন রসমূর্তি নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কাব্য যে কোথাও সংস্কৃতকাব্যের প্রতিচ্ছবি তা মনে হয় না; মনে হয়, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যে কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমারেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌঁছেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান, এবং সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রঙে নতুন করে গড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে-অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রাপথের সংক্ষেপ মাত্র সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।—

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি, বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা

এ মেঘদূত, কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙুল তুলে যে দিকে দেখিয়েছেন কবি সেই দিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—

বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিষ পাওয়া যাবে না।

৩

মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান সাহিত্য তাঁর কবিচিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন করে শুভদৃষ্টি হলো'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'এ রবীন্দ্রনাথ ব্যাস যে-রসের সৃষ্টি করেছেন তার ধারা ধরেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তঃস্থলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে

রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তার অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এবং তাঁর কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবিক কথা ও কাজ মনে হয়।—

হের দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া।

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের যে ভীষণগম্ভীর রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারি রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উপর কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এ দুই কাব্যের যে রস তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান কবির কল্পনাকে জাগায় নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জায়গায় তবুও গল্পের এক-একটা কাঠামো ছিল; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান থেকে যে 'পতিতা'র কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাংলায় কাব্য-রচনার কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদবধ' ও 'তিলোত্তমা'র বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত 'ক্ল্যাসিক' কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে-সব কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অন্তরের মিলও ঐ ক্ল্যাসিক কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তারে খুব জোরে ঘা দেয় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পুরাণ-প্রসঙ্গকে অতিক্রম ক'রে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে যায় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেস্ট'। রবীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ী যখন আসেন তখন একেবারে অন্তঃপুরে যেয়ে উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনা'য় বিদেশী কবির কল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল অতি সূক্ষ্ম পৌরাণিক সূত্র ধরে অভিনব রসসৃষ্টি করেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ'এর সমশ্রেণীর কাব্য। স্বাদের যে তফাত সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মিলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজকবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।

রচনা: ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মোহিতলাল মজুমদার

এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, আধুনিক সাহিত্যেই বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তির একটি সুগভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারণ, বাহিরের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মধ্যে এ যুগের বাঙ্গালীর স্বরূপ এখনও তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই— চরিত্র ও কর্ম্মবুদ্ধির অভাবে সেখানে সে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। সে যুগে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অটুট ছিল, নবতি বৎসর বয়সেও দেহ-মনের সামর্থ্য একেবারে লোপ পাইত না, পুত্রপৌত্রাদিবহুল পরিবার তখনও চারি দিকে বিদ্যমান। এজন্য বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র মদিরাও বাঙ্গালীর মনের পক্ষে রসায়নের কাজ করিয়াছিল, প্রাচীন সমাজের সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যেও তাহার প্রাণে নবীনতার আবেগ নিষ্ফল হয় নাই। যে শক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা বাস্তবজীবনে বাধা পাইলেও ভাবনা ধারণা ও ধ্যান-কল্পনার ক্ষেত্রে অতিশয় বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কারের মোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মদমনের শাস্ত্রবিধি ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের পৌরুষ-পাঞ্চজন্য, তাহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল; বাহিরে যাহার সহিত সন্ধি করিতে না পারিয়া সে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে ঘুরিতেছিল, অন্তরে সে তাহার সহিত আরও স্বাধীনভাবে বোঝাপড়া করিবার সাধনা করিয়াছিল। সেই সাধনার প্রাণময়তা, সেই সংগ্রামের উল্লাস, এবং আত্মচেতনার স্ফূর্ত্তি এই সাহিত্যের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়াছে। এ যুগের সাধনায় যদি জাতির সেই বিশিষ্ট চেতনা জাগিয়া না থাকিত, সে যদি ভাবের বিশ্বাকাশে আপনার মনোরথকে ছাড়িয়া না দিয়া, প্রাণরশ্মির দ্বারা তাহাকে আপনার পথে— স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিয়তিনির্দ্দিষ্ট রথবর্ত্মে— চালাইবার শক্তি না পাইত, তবে সাহিত্যে প্রাণের সাড়া জাগিত না, ভাষা ফুটিত না, সাহিত্যেরই সৃষ্টি হইত না।

মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এই সাহিত্যজীবনের ধারা এবং গতি-প্রকৃতির নানাদিক আছে; সকল দিকগুলির সম্যক আলোচনা করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর এই যুগের সাধনা ও সিদ্ধির একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে না। বহু প্রাচীন অতীতের ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই, কাজেই কীর্ত্তি-পরম্পরার ভিতর দিয়া জাতির অদৃষ্টলিপি বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। অতএব সদ্য-বিগত কালের যে একমাত্র কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর একটা পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই আমাদের

জাতীয় জীবনের একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এজন্য এই সাহিত্যের উৎপত্তি, তাহার প্রধান প্রবৃত্তি, এবং বর্ত্তমান পরিণতির কথা আর এক দিক দিয়া অনুধাবন করিবার প্রয়োজন আছে।

'জাতীয়তা' ও 'সাহিত্য'— আজকালকার কালচার-বিলাসী, dilettante বাঙ্গালীর মতে— এই দুইটি শব্দ পরস্পর-বিরোধী। সাহিত্যে এখন বিশ্বজনীনতার নামে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধুয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য-ধর্ম্মের দিক দিয়া এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কি অর্থে কতখানি সত্য, সে বিচারের ক্ষমতা বা প্রয়োজন কাহারও নাই। অথচ দেখা যাইতেছে ব্যক্তির খেয়াল-খুশি, বা pseudo-Romantic ভাবতন্ত্রের তাণ্ডবলীলা এ যুগে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে spiritএর উপর matter জয়ী হইয়াছে; আধুনিক লেখকেরা যে স্বাধীন ভাব-কল্পনার দাবী করিয়া থাকেন, মূলে তাহা বাহিরের নিকটে অন্তরের পরাজয়, বস্তুর নিকটে আত্মসমর্পণ— সমাজের যুগ-প্রয়োজনে স্বকীয় কল্পনার পক্ষচ্ছেদ। এই সকল লেখকেরা আত্মভ্রষ্ট, বস্তু-নিগৃহীত, সামাজিক সমস্যার অন্ধ তাড়নায় সনাতন ভাব-সত্য হইতে তিরস্কৃত। ইহারা স্বাধীন নয়, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য একটা মোহ মাত্র; ইহারা জড়জীবী, চিৎশক্তিহীন, বর্ত্তমানের আবিল ও বিক্ষুব্ধ জলস্রোতের ক্ষণ-বুদ্‌বুদ— ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মতই মিলাইয়া যাইবে।

ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র— ইহার কোনটাই খাঁটি সাহিত্য-তন্ত্র নয়। সাহিত্য-সমালোচনায় যে সকল বাক্য বা formula ব্যবহার করা হয়, তাহার দ্বারা কাব্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে ধরিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। সমালোচনা-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আসলে যাহা সাহিত্য তাহা একই নিয়মে সৃষ্ট হইয়া থাকে, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাহাকে একই রূপে চিনিয়া লয়; যাহা accidental তাহাই যদি essential হইয়া উঠে, তবে সে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। সাহিত্যে ব্যক্তিও আছে, বস্তুও আছে; কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নাই। যাহা তর্কবিচারের অতীত তাহা লইয়া আমরা যখন বিচার করিতে বসি, তখনই এইরূপ বৈলক্ষণ্য-নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয়— কিন্তু যে-গুণে রচনা কাব্য হইয়া উঠে তাহার মূল রহস্য একই। তথাপি এইরূপ বিচারেও ক্ষতি নাই— যদি সেই বিচার-বিতর্কের সিদ্ধান্তগুলিকে একটা গণ্ডির মধ্যে মানিয়া লওয়া হয়। কারণ, মনে রাখিতে হইবে, এই সকল সিদ্ধান্ত কাব্যসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনের কৌতূহল চরিতার্থ করে মাত্র— রসাস্বাদ বা রসের ধারণার ইতর-বিশেষ করিতে

পারে না। কাব্যরচনায় রসের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, কবির প্রাণের কোন্ নিগূঢ় নিয়মের বশে কাব্যসৃষ্টি হয়, তাহা যেমন রসের ধারণা বা রসতত্ত্ব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না, তেমনই কবির যে প্রাণধর্ম্ম কাব্যসৃষ্টি করে সেই প্রাণধর্ম্মের লক্ষণগুলির উপরে রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন emotions বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কাব্যের উপাদান-উপকরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হই— কবিবিশেষের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকার-ভেদ আমাদের ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল অথবা প্রতিকূল হয়; কিন্তু emotionsএর ঐ প্রকারভেদ পর্য্যন্তই যদি কাব্যের স্বরূপ-নির্দ্দেশ হয়, তবে তাহা রস পর্য্যন্ত আর পৌঁছাইবে না— কাব্য ঐখানেই ইতি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং তাহার সম্বন্ধে রসিকের রসোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কাব্যকে হারাইয়া, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতেছে। কাব্যে তাহারা কবির খেয়াল-খুশি, অথবা জীবনের যে দিকটা জড়চেতনার দিক— spirit যেখানে matterএর দ্বারা অভিভূত— সেই বস্তুপীড়িত চেতনাকে উৎকৃষ্ট কবিপ্রেরণা বলিয়া মনে করিতেছে। ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন তড়িৎ-স্পর্শের মত যাহা তাহাদের স্নায়ুকে মাত্র আঘাত করে তাহাই কাব্যরস! প্রকৃত জীবন-রহস্যের পরিবর্ত্তে, পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রার যেসব জমা-খরচের হিসাব মানুষের জড়চেতনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে— তজ্জনিত জৃম্ভণ উদ্গার আর্ত্তনাদ প্রলাপ ও দুঃস্বপ্ন যে রচনায় যত অধিক প্রকট হইয়াছে তাহাই তত উৎকৃষ্ট কাব্য! এ অবস্থায় কাব্য-সমালোচনা নিষ্ফল।

কিন্তু আমরা গত যুগের বাংলা সাহিত্যের কথা বলিতেছি। সে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে খুব আধুনিক সাহিত্যনীতি অবলম্বন না করিলেও বোধ হয় চলিবে; আমরা সে সাহিত্যের কাব্যগুণ বিচার করিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা বাঙ্গালীর হৃদয়-সংগ্রাম, তাহার 'জাতীয়' আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটা বিপুল প্রয়াস দেখিতে পাই। বাঙ্গালী যে তখনও বাঁচিয়াছিল— আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, জীবধর্ম্মের এই দুই শক্তির প্রমাণ তাহার এই সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রাণশক্তি ছিল বলিয়াই সে তাহার প্রাণের ভাষাকে এমন সুন্দর সুদৃঢ় ও সুপরিপুষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্যের নামে যে অনাচার করিতেছি তাহা এই ভাষারই বুকে; আজও পর্য্যন্ত আমরা গদ্যে ও পদ্যে যে বমন ও রোমন্থন করিতেছি তাহাও পিতৃপিতামহ-নির্ম্মিত এই সাহিত্যের শিলা-চত্বরের উপরেই। কারণ, কি ভাষা, কি সাহিত্য, কোনও দিক দিয়াই আমরা সেই মন্দিরে একটি নূতন চূড়া তুলিতে পারি নাই, বরং তার ভিৎ জখম করিতেছি।

গত যুগে এই সাহিত্য ও ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া ?— যেমন করিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কোনো জাতির সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাহিত্যের রসতত্ত্ব এক নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি-মূলে জীবনধর্ম্ম আছে, কিন্তু রসের আস্বাদনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা জাতিগত চেতনা নির্ব্যক্তিক ও সার্ব্বজনীন হইয়া ওঠে। এই জীবনধর্ম্ম অর্থে আধুনিক সাহিত্যের আত্মতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নয়। ইহা আরও গভীর, আরও ব্যাপক। কবিও প্রকৃতিপরবশ, কিন্তু কবির অহং এই প্রকৃতির অধীন হইয়াই দেশ কাল ও জাতির বিশিষ্ট সাধন-সংস্কারের প্রভাবে যাহা সৃষ্টি করে তাহাই সাহিত্য। কারণ, ভাব যতই বিশ্বজনীন হউক, কবির প্রাণের ছাঁচে ঢালা না হইলে তাহা রূপময় হইয়া উঠে না— এই প্রাণই কবিধর্ম্মের, তথা জীবনধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেখানে যাহা কিছু সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছে তাহার রস যতই গভীর উদার ও সার্ব্বজনীন হউক— যে রূপ হইতে সেই রসের উৎপত্তি হয় তাহা কবির প্রাণেরই রূপ ; অর্থাৎ তাহাতে যে বর্ণ আছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়-রক্তের আভা, এবং তাহাতে আলোছায়ার যে রেখাপাত আছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ-বেদনার অশ্রু-হাস্যে বিচিত্রিত। কবি যতই বস্তুতন্ত্র বা আত্মতন্ত্র হউন, তাঁহার এই প্রাণধর্ম্মই কাব্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা। এই প্রাণের স্পন্দন একটা নির্ব্বিশেষ ভাবযন্ত্রের ক্রিয়া নয় ; কবির জাতি ও বংশ, তাঁহার দেশ ও কাল এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে— ইহাকে পুষ্ট করিয়াছে। সাহিত্যের যে রূপ রসের আধার সেই রূপটি বৃন্তহীন পুষ্পসম বিশ্বাকাশে ফুটিয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকা-বন্ধন আছে, না থাকিলে কোনও সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য থাকিত না— সাহিত্য সাহিত্যই হইত না ; কারণ তাহা হইলে ভাবের রূপসৃষ্টি অসম্ভব হইত। তাই, জগতের সাহিত্যে যে কাব্য সবচেয়ে নির্ব্যক্তিক সেই সেক্সপীরীয় নাটকের প্রেরণামূলেও এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজ-প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে ; তাই গ্যেটে যে ভাষায় তাঁহার ফাউস্ট লিখিয়াছেন সেই ভাষাই তাহার প্রাণ— সে ভাষার বাহিরে সে এতটুকু দাঁড়াইতে পারে না।

অতএব সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক কি, এবং এই জাতীয়তারই বা অর্থ কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, আমি এখানে সাহিত্যরসের লক্ষণ বিচার করিতেছি না। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কোন্ শক্তির ক্রিয়া আছে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির জীবন— তাহার জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহারই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্যের দর্পণেই জাতি যেন আপনাকে আপনার মধ্যে অবলোকন করে— তাহার আত্মসাক্ষাৎকার হয়। যাঁহারা সাহিত্যের রসই উপভোগ করেন তাঁহাদের নিকটে এ তথ্যের কোনও মূল্য

নাই; ঋতুবিশেষে জল ও মাটির কোন্ অবস্থায় উদ্যানলতা পুষ্পপ্রসব করে সে সংবাদ তাঁহাদের নিষ্প্রয়োজন; তাঁহারা কেবল সদ্য-চয়নিত পুষ্পগুচ্ছের রূপ ও সৌরভ উপভোগ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই ফুল যখন ফুরাইয়া আসে তখন শুধুই বিলাসীর বিলাস-সঙ্কট উপস্থিত হয় না, জাতির প্রাণশক্তির অভাব ধরা পড়ে, এবং সে যে কত বড় দুর্দ্দিন তাহা জাতির জীবনেই যাহারা জীবিত— যাহারা বিশ্বপ্রেমিক নয়, অতি অধম ও সঙ্কীর্ণমনা, স্বজাতি-প্রেমিক— তাহারাই তাহা জানে।

আমাদিগের গদ্যযুগের সাহিত্যে এই জাতীয়তা ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্ম্মের প্রকাশ রহিয়াছে। পশ্চিমের আকস্মিক সংঘাতে, এই জাতির বহুকাল-লুপ্ত চেতনা চমকিত হইয়া উঠিল, যে মুহূর্ত্তে তাহার মানস-শরীরে এই বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল সেই মুহূর্ত্তে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। হঠাৎ জাগরণে সে দিশাহারা হইয়াছিল। গুপ্তকবি ও রঙ্গলাল দিশাহারা হন নাই, কারণ তাঁহাদের সম্যক জাগরণ হয় নাই— একজন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতেছিলেন, আর একজন জাগর-স্বপ্নের ক্ষণ-অবসরে এই রূঢ় আলোকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন গৃহকোণের স্তিমিত মৃৎপ্রদীপটি উস্কাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু জাগরণে বিলম্ব হয় নাই। পশ্চিমের প্রবল প্রভাব— শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও আশা বিশ্বাস— যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিল; তাহার অন্তরের অন্তস্তলে সুগভীর মর্ম্মমূলে— তাহার জাগ্রত চেতনারও অন্তরালে যে হাহাকার জাগিয়াছিল, বাঁহিরে বিদ্রোহচ্ছলে সেই অসীম আকূতিই মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসে প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধ-কাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে? কেহ কি এখনও পড়ে? এই কাব্যকাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িতকুন্তলা রোদনোচ্ছূননেত্রা অপরূপমমতাময়ী মূর্ত্তি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য্য আর কি ফুটিতে পারে? তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদবধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে; বাঙ্গালীর গৃহ-সংসারের সেই পুণ্যদীপ্তি মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার ভার্জ্জিল ট্যাসোর

কাব্যগৌরব বিফল হইল— বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল— বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা, বাঙ্গালীবধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ নরক পৃথিবী ও সমুদ্রতল -ব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্চনা এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোককাননে বন্দিনী নারীলক্ষ্মীর মূক শোক-ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে ; এবং শক্তিশেল-মূর্চ্ছিত ভ্রাতার শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্ম্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্ম্মল উৎসবারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

> সুখের প্রদীপ, সখি ! নিবাই লো সদা
> প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরূপী
> আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
> নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
> বনবাসী সুলক্ষণে ! দেবর সুমতি
> লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
> শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
> শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
> বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
> রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা,
> মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।

—কবির কাব্যলক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না— ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমার-মিল্টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জ্জিলের কল্পনা এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু— এমন-কি বাক্য-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা সবই ছিল ; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালীজীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্ম্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্যতরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল ; ছন্দে ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল— কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন ? সাগরবক্ষে উত্তাল

তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলু ধ্বনি? এ যে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্নশিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন নব তারাবলী", এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে! সমুদ্র গর্জ্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক,— তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর। সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যতরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল— "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।"

এমনি করিয়া আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ভিৎ পত্তন হইয়াছিল। বাহিরের প্রচণ্ড সংঘাত ভিতরের প্রাণবস্তু আলোড়িত করিয়াছিল; এ আলোড়নের প্রয়োজন ছিল, এই সংঘাতেই তাহার প্রাণ জাগিয়াছিল। বাঙ্গালী হঠাৎ নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল, তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণে সাড়া জাগিল; এই প্রাণ ছিল বলিয়াই যে প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ফলে এই নব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথম দিশাহারা অবস্থায় সে একটা প্রবল আবেগ অনুভব করিয়াছিল; নবভাব ও চিন্তার মন্থনে তাহার প্রাণের সেই অস্থিরতা সর্ব্বত্র সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশের বেদনা ও ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু ভাষা নাই, ছন্দ নাই, প্রাণে যাহা জাগিয়াছে তাহার অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অথবা সেই অনুভূতিকে চাপিয়া রাখিয়া ইংরেজী সাহিত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভাব ও চিন্তারাজি মনের মধ্যে গোল বাধাইতেছে। সে-সকল ভাব ও চিন্তার আবেগমূলক অনুকরণে যে-সকল কাব্য ও মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা খাঁটি কাব্যসৃষ্টির পরিচয় পাই না বটে, কিন্তু বাঙ্গালী কেমন করিয়া এই নব ভাবের প্লাবনের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও নিজের জাতি-কুল আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে— তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই। হেমচন্দ্রের কাব্যে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী-প্রাণের পরিচয় পাই; কিন্তু সে প্রাণ বলিষ্ঠ হইলেও অলস, তাহা গভীরভাবে আন্দোলিত হয় নাই। যে বজ্রাগ্নির আলোকে মধুসূদনের জাগরচৈতন্য স্তম্ভিত হইয়া, অন্তরের অন্তরে বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, সে বজ্রাগ্নি হেমচন্দ্রের অতিশয় স্থূল আত্মতৃপ্ত বাঙ্গালীয়ানা ভেদ করিতে পারে নাই। নবীনচন্দ্রের আবেগ ছিল, কিন্তু সে আবেগ অন্ধ; তিনি আদৌ আত্মসচেতন ছিলেন না, অতিশয় আত্মাভিমানী ছিলেন; তাই তাঁহার মনে ভাব ও কল্পনার যেমন অবাধ অধিকার ছিল, প্রবলতাও ছিল, তেমনি তাহা উপর দিয়াই বহিয়া যাইত— অন্তরের মধ্যে

কাব্যসৃষ্টির গভীরতর প্রেরণা হইয়া উঠিবার অবসর পাইত না। তাই এক-একটা idea তাঁহাকে পাইয়া বসিত মাত্র; ইংরেজীশিক্ষার অভিমানই ছিল তাহার মূল— তাহার সহিত অতিশয় দেশী এবং অতি দুর্ব্বল ভাবাতিরেক যুক্ত হইয়া যে কাব্যগুলির জন্ম হইয়াছে তাহাতে ইংরেজী ভাব ও দেশী ভাবপ্রবণতার একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাই— বাঙ্গালীর জাতি-ধর্ম্ম ও ইংরেজী-শিক্ষা উভয় উভয়কে বেড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করি। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সে যুগের সেই দিশেহারা অবস্থার প্রথম দিকে এই একমাত্র কবি ইংরেজী ভাব ও চিন্তার ধারাকে ধীরভাবে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন; নববিজ্ঞান দর্শন ও ইতিহাসের আলোকে নিজের অন্তরের ধারণা ও ভাবনাকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন— ভাবাতিরেক বা কবিকল্পনাকে দমন করিয়া বাস্তব-প্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে যে ভাবমার্গ ও যুক্তিপন্থার প্রসার হইয়াছিল তাহাই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তিনি কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি, কাব্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্য-জিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বস্তু-নিচয়ের নূতন করিয়া মূল্যনির্দ্ধারণের জন্য তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দেশীয় চিন্তা-প্রণালীর সমন্বয়-সাধন করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সত্যনির্ণয়ের আবেগ, যুক্তিকল্পনার আনন্দ, মনুষ্যসমাজের নূতনতর মহিমা আবিষ্কারের উৎসাহ তাঁহাকে যে কাব্যরচনায় ব্রতী করিয়াছিল, তাহাতে সম্যক্ রসসৃষ্টি না হইলেও একটা নূতন ভাবদৃষ্টির পরিচয় আছে; তাঁহার কাব্যে নব নব চিন্তা ও ভাবনার যে সকল চকিত-চমক আছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যে এইরূপ অনেক চিন্তাবস্তু কাব্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে— সুরেন্দ্রনাথ সেগুলিকে যেন চিন্তার আকারেই ছড়াইয়া গিয়াছেন। এ শক্তি ঠিক কবিশক্তি না হইলেও ইহার মূলে কল্পনার আবেগ আছে; যে দৃষ্টান্ত ও উপমা -সমুচ্চয়ের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্যকে সমীচীন করিয়া তুলিতে চান, তাহার মধ্যেই তাঁহার কবিশক্তির প্রমাণ আছে। তাঁহার রচনায় এ যুগের প্রধান প্রবৃত্তি নিখুঁতভাবে ধরা পড়িয়াছে। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সাড়া জাগিয়াছিল তাহার ফলে সে যে নূতন চিন্তাভিত্তির অন্বেষণ করিয়াছিল, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আপনার প্রাণধর্ম্মের অনুযায়ী করিয়া যে পরস্ব-গ্রহণের প্রয়োজন সে অনুভব করিয়াছিল, তাহাতে দেশী ও বিদেশী চিন্তার সমন্বয়সাধনে একটা সজ্ঞান চেষ্টাই স্বাভাবিক। এবং সে সমন্বয়-সাধনে কতক পরিমাণে ভাবুকতারও প্রয়োজন— এই ভাবুকতাই

সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সে যুগের এই প্রধান প্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। তাঁহার কাব্যরচনা এই হিসাবে সার্থক হইয়াছে যে, তাঁহার ভাববস্তু তাঁহার কাব্য অপেক্ষা কম বা বেশী হয় নাই— তাঁহার কথা তিনি তাঁহার মত করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-রচনার মত অক্ষমের প্রয়াস-বিড়ম্বনা তাহাতে নাই ; তিনি নবীনচন্দ্রের মত মহাকাব্য-রচনার নামে ধর্ম্ম রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় কবি Pope-এর মত কবিতায় Essay on Woman লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার কার্য্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনও লুকাচুরী নাই, বরং এই গদ্যাত্মক কাব্যে কবির নির্ভীক সত্যবাদের উৎসাহ, ভাবচিন্তার অভাবনীয় চমক, ভাষার একটি নূতন ভঙ্গী এবং স্থানে স্থানে অপ্রত্যাশিত ছন্দ-ঝঙ্কার তাঁহার 'মহিলা-কাব্য'খানিকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বেশ একটু স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এই সকল রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্য না হইলেও, যে প্রাণ-মনের নিগূঢ় আন্দোলনে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, দুই বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষে জাতিবিশেষের সুপ্ত চেতনা মন্থিত হইয়া তাহার প্রাণভাণ্ডে অমৃত-সঞ্চয় হইয়া ওঠে— সেই আন্দোলন-আলোড়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই সকল রচনায় আছে। মাইকেল, বঙ্কিম, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ —আধুনিক সাহিত্যের এই চারিটি স্তম্ভ যে ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বঙ্গভারতীর এই অভিনব মন্দিরচূড়া ধারণ করিয়া আছেন, তাহার তলদেশ কোথায় এবং কত গভীর, নির্ণয় করিতে হইলে এই সকল কবির কাব্যপ্রচেষ্টা সযত্নে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। কোনো যুগের অন্তরতম প্রবৃত্তির সন্ধান করিতে হইলে, কেবল উৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না ; কারণ,প্রতিভার যে দিকটা আমাদিগকে মুগ্ধ করে সে তার অলৌকিক কীর্ত্তি— এই কীর্ত্তির অন্তরালে যে স্বাভাবিক নিয়ম রহিয়াছে তাহা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ প্রতিভাশালী নহেন তাঁহাদের প্রয়াস প্রচেষ্টা আরও স্বচ্ছ, তাঁহাদের মধ্যে আমরা যুগধর্ম্মকে আরও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। মাইকেলের মেঘনাদবধ-কাব্যে বাঙ্গালীর প্রাণ যুগধর্ম্মবশে কি নিগূঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়াছে, সে চিন্তা আমরা করি না— তাঁহার কাব্যরসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যগুলির মধ্যে, পাশ্চাত্ত্যকাব্য-সাহিত্যের পূর্ণ রসস্রোত বাঙ্গালীর প্রাণে কেমন করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দান করিয়াছে, সেই সকল কাব্যে বাঙ্গালীর মনীষা ও কবিপ্রতিভা খাঁটি বিদেশী রস-রসিকতার আবেগে কি অপূর্ব্ব ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে— তাহা চিন্তা করিতে গেলে আমরা কেবল বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া থাকি ; কোথায়·কোন্ দিক

দিয়া কবির প্রাণে সাড়া জাগিয়াছে, এবং আমরা পাঠকেরা এই অতিশয় অপরিচিত ভাবলোকে প্রাণের কোন্ নবজাগরণে জাগিয়া উঠি, অথবা কোন্ স্বপ্নলোকে আমাদের চিরসুষুপ্ত কামনালক্ষ্মীর সন্ধান পাই— এই বিদেশী সাহিত্যকলার মোহনমুকুরে আমাদেরই প্রাণের প্রতিবিম্ব কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল, এ চিন্তার অবকাশ থাকে না। কিন্তু এ কথা কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই সাহিত্যরস যতই উৎকৃষ্ট হউক, যদি তাহার ভাষা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে, যদি তাহার ভাবকল্পনায় কেবল আমাদের রসপিপাসা উদ্রিক্ত না হইয়া তাহার সহিত আমাদের একটি মর্ম্মগত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবেই তাহা আমাদের সাহিত্য হইয়াছে। বিদেশী ভাবকল্পনা বিদেশী সাহিত্যেই আমরা উপভোগ করি; কিন্তু সেই ভাবকল্পনাই যদি আমাদের মনের তৃপ্তিসাধন করিত, তবে কোনও পৃথক স্বকীয় সাহিত্যের প্রয়োজন হইত না— আমার ভাষায় তাহা অনুবাদ করিলেই আমার সাহিত্য হইত। এ যুগে সেই বিদেশী ভাবকল্পনাকে যাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন,— অর্থাৎ তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির বিকাশ করিয়াছিলেন —তাঁহারাই এ যুগের সাহিত্যস্রষ্টা। এই সৃষ্টিশক্তিই তাঁহাদের দিব্যশক্তি। এইখানেই সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার সম্বন্ধ। কবির আত্মা নির্ব্বিশেষ মানবাত্মা নয়; যে রূপ-রস-পিপাসা কবিপ্রকৃতির স্থায়ী লক্ষণ, যাহার বশে কবির ভাব রূপময় হইয়া উঠে, নির্ব্বিশেষ বিশেষে পরিণত হয়— কবির সেই কবিধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট প্রাণমনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন— প্রাণের সেই ছাঁচটি আছে বলিয়াই ভাব রূপের আকারে আকারিত হয়; এই প্রাণ না থাকিলে সাহিত্যের প্রাণসৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রাণের মূল জাতির বহুকাললব্ধ চেতনা, তাহার অতীত ও বর্ত্তমান, তাহার জাগ্রত ও মগ্নচৈতন্যের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আছে। মেঘনাদবধ-কাব্যের মধ্যে আমরা কবির এই অন্তরতম অন্তরের পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্কিমের কাব্যে চৈতন্য আরও পরিস্ফুট, তাই তাঁহার মধ্যে এই দেশী ও বিদেশী ভাবের সংঘর্ষ আরও গভীর, আরও বিপুল। বঙ্কিমের কাব্যসৃষ্টিতে আমরা যে প্রাণের আলোড়ন দেখিতে পাই, তাহাতে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অধীর উচ্ছ্বাস, ফেনশীর্ষ তরঙ্গগহ্বরের অন্ধকার, এবং জলতলস্থ ভীষণা শান্তির আভাস পাই। সেকালে বাঙ্গালীর প্রাণে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল— বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপরে সর্ব্বপ্রথম মেঘনাদ-বধের তরঙ্গচূড়া দেখা দিয়াছিল— সেই পাশ্চাত্ত্য ঝটিকার আন্দোলনে প্রমত্ত বাঙ্গালীর প্রাণসাগর যে তুঙ্গতম তরঙ্গে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই ফল— বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, চন্দ্রশেখর,

দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ। কিন্তু এই তরঙ্গের স্রোত নির্ণয় হইবে সুরেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে।

তথাপি এই আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী সংঘাতের প্রতিঘাতে যে সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল—নবাবিষ্কৃত ভাব ও চিন্তার জগতে বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, তাহার কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ বাস্তবের সহিত দ্বন্দ্বকে আরো ঘনাইয়া তোলা— সহসা সে সাহিত্যের স্রোত উল্টা দিকে বহিল। এ দ্বন্দ্ব যেন তাহার বেশীক্ষণ সহ্য হইল না— প্রাণ হইতে মনে, ভাব হইতে ধ্যানে, সে বাস্তবমুক্তির জন্য লালায়িত হইল। মাইকেল হইতে বঙ্কিম— অতি অল্পকাল, এক পুরুষও নয়; বাঙ্গালীর নবজাগ্রত প্রাণচেতনা তখনও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, জাতির অতীত স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশা তাহাকে চঞ্চল করিতেছে মাত্র—সেই কালেই সাহিত্য-প্রাঙ্গণের এক কোণে ধ্যানাসনে বসিয়া কবি বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল'-গান আরম্ভ করিয়াছেন। সেকালে সে সুরে কান পাতিবার অবসর কাহারও ছিল না; কেহ জানিত না যে, অতঃপর বাংলার কাব্যলক্ষ্মী দেশ-কাল বিস্মৃত হইয়া যে ধ্যানরসে নিমগ্ন হইবেন— সাহিত্যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন স্তিমিত হইয়া ক্রমশঃ যে সূক্ষ্মতর রসবিলাস ও বিশ্বজনীন ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা হইবে— এই ভাবোন্মত্ত, উদাসীন আত্মহারা ব্রাহ্মণ-কবি তাহারই সূচনা করিতেছেন।

বাঙ্গালী চরিত্রে ভারতীয় প্রকৃতিসুলভ ধ্যানকল্পনার প্রভাব যে আছে এবং থাকিবেই এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাঙ্গালীর যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমি পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিতে চাই তাহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের নিদান এবং তাহারই ফলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী একটা বিদেশী সাধনার সারবস্তু আত্মসাৎ করিয়া তাহার সাহিত্যে নবজন্মের পরিচয় দিয়াছে। আর কোনও ভারতীয় জাতি এমন করিয়া যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কার ভেদ করিয়া এত শীঘ্র এইরূপ একটি আধুনিক আদর্শকে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। মাইকেলের মহাকাব্যে যে বেদনা সঙ্গীতরূপে প্রকাশ পাইল, তাহা যেন— "Music yearning like a god in pain"; তাহাতে নবজন্মের সেই প্রাণপণ প্রয়াস বা আত্মস্ফূর্ত্তির আবেগ রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিবিন্যাসের মধ্যেই প্রাণের যে লীলা, মুক্তগতির যে আনন্দ, কাব্যবস্তুর নিঃসঙ্কোচ সঙ্কলনে কল্পনার যে চিন্তালেশহীন স্বাধীন বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, তাহাতেই এই নবসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই আত্মস্ফূর্ত্তির কারণ— নিজ দেহসংস্কারের

দ্বারাই বহির্জ্জগতের সহিত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া মানুষ যে সহজ রস আস্বাদন করিতে চায়, বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে সেই অভারতীয় প্রবৃত্তি সুপ্ত আছে; ভারতীয় প্রভাবের বশে যে কল্পনা অন্তর্মুখ সেই কল্পনারই তলে তলে জীবন ও জগতের প্রতি তাহার এই মমতা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে। তাই বেদান্ত ও সন্ন্যাস বাঙ্গালীর যথার্থ ধর্ম্ম হইতে পারে নাই। দেশের জলবায়ু, কর্ম্ম অপেক্ষা স্বপ্নের অনুকূল; ইহার উপর আর্য্য সাধনার অধ্যাত্মবাদ চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে; তথাপি বাঙ্গালীর মজ্জাগত প্রাণধর্ম্মকে এই মনোধর্ম্ম একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই; এজন্য জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার যে স্বাস্থ্যকর আসক্তি তাহা ভোগ হইতে উপভোগে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্বেতভুজা বীণাপাণি বাঙ্গালীর চিত্ত-শতদলে যখন আসন পাতিলেন, তখন সহসা তার কল্পনায় এক মহোৎসব পড়িয়া গেল। সে সাহিত্যে জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানবহৃদয়, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ক্ষেত্রে পরস্পরকে যে মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে—মানুষের দেহই যে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় সূর্য্যালোকিত আকাশতলে ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিল, বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে আত্মপরিচয় সাধন করিতে সেও অধীর হইয়া উঠিল। মাইকেলের কাব্যপ্রেরণায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে বহির্বস্তুর বাহিরের রূপ। কেবল-মাত্র বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে দূরে ধরিয়া অথবা নিকটে সাজাইয়া দর্শন ও স্পর্শনের আনন্দে তিনি বিভোর; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্র-চিত্রণ এবং তক্ষণশিল্পীর মত মূর্ত্তি-সুষমার সন্ধানে তাঁহার কল্পনার কি উল্লাস! উপমার পর উপমায় তিনি যে রূপ ফুটাইয়া তোলেন তাহা ভাব বা চিন্তার চমক নহে—বাহিরের বস্তুবিন্যাসের সৌন্দর্য্য; বিষাদপ্রতিমা বন্দিনী সীতার ললাটে সিন্দূরবিন্দু-'গোধূলিললাটে আহা তারারত্ন যথা'। তিনি বস্তুকে ভাবের দ্বারা, বা ভাবকে বস্তুর দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তোলেন না; একই বস্তুর সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য বহু বস্তুর উপমা সন্নিবেশ করেন, চিত্রকে চিত্রের দ্বারাই সুন্দর করিয়া তোলেন। আলো ও ছায়া এই দুইটি মাত্র বর্ণে মর্ম্মরমূর্ত্তি যেমন প্রকাশ পায়, তাঁহার সৃষ্ট মানব-মানবীও তেমনি অতিশয় সরল ও সার্ব্বজনীন সুখ-দুঃখের ছায়ালোকসম্পাতে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। এইজন্য আকারে ও ভঙ্গিমায় মহা-কবি মিল্টনকে অনুসরণ করিলেও মধুসূদন মানুষের সংসার বিস্মৃত হইয়া মহাকাব্যের অত্যুচ্চ কাব্য-লোকে, সীমাহীন দিগ্‌দেশে, তাঁহার কল্পনাকে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মানুষকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন; পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব তাঁহার হৃদয়ে যে মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল তাহারই আবেগ মহাকাব্যের রূপভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়াছে। মাইকেলের কাব্য পড়িয়া মনে হয়, গীতিপ্রাণ বাঙ্গালী

কবি যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন; সেখানে হৃদয়-সমুদ্রের বেলা-বালুকায় ভঙ্গতরঙ্গের অলস ফেনরেখা বুদ্‌বুদ্‌মালায় মিলাইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে দূরাগত জলোচ্ছ্বাস ও ভগ্নপোত-যাত্রীর আর্ত্তনাদ নিভৃত নিকুঞ্জের বংশীরবকেই এক অপূর্ব্ব বেদনায় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। কবিকল্পনার এই নূতন অভিযান নব্য সাহিত্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিল—মনের সূক্ষ্ম লীলাবিলাস অগ্রাহ্য করিয়া মানুষকে দেহের রাজ্যে দাঁড় করাইয়া, তাহার স্বাভাবিক আকার আয়তন ও রূপ-ভঙ্গিমা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল; পাপ-পুণ্য-নির্ব্বিশেষে তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি নিয়তির অমোঘ নিয়মে কেমন ভীষণ মধুর হইয়া উঠে—বাঙ্গালী-কবির চিত্তে তাহারই প্রেরণা জাগিয়াছিল।

কিন্তু মধুসূদনের যে আবেগ একটা 'great technique' ও prodigious art'-এর প্রেরণায় মানুষের জীবনকে কেবলমাত্র একটা বিশালতর পটভূমিকার উপরে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও দেহের মুক্তগতি অঙ্কিত করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল, মনুষ্যজীবনের রহস্য-চিন্তার সেই আবেগ পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে। গীতিকাব্যের নিছক ভাবুকতায় এবং স্বল্প পরিসরে যে প্রেরণা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না—ভাবজগৎ হইতে বাহিরে আনিয়া মূর্ত্তিজগতের চাক্ষুষ-আলো-অন্ধকারে হৃদয়মণির দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা প্রতিফলিত করিবার জন্য যে নূতন আকারে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন—মহাকাব্য বা কাহিনীকাব্যে তাহার experiment শেষ হইবার পূর্ব্বেই, সেই প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে অবতারকল্প প্রতিভার অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলা গদ্যচ্ছন্দ সহসা যে বাণীরূপ ধারণ করিল তাহাতে দেহেরই রূপরাগ প্রাণের মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও বাঙ্গালী কবি এমন করিয়া 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের' গাথা গান করেন নাই; প্রকৃতির প্ররোচনায় মানুষের আত্মা এমন করিয়া দেহের দুয়ারে লুটাপুটি খায় নাই; মনুষ্য-হৃদয়ের চিরন্তন আকূতি কবিকল্পনায় মণ্ডিত হইয়া দেহধর্ম্মের তাড়নায় এমন সুদুর্ল্লভ-দুর্ভাগ্য-মহিমা লাভ করে নাই। য়ুরোপের কাব্যলক্ষ্মী তথাকার সাহিত্যে মানুষের যে পরিচয়টিকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া দেহচেতনার মধ্য দিয়াই অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন—সে সাহিত্যের সেই গভীরতম প্রেরণা এমন করিয়া আর কোনও বাঙ্গালী কবিকে আবিষ্ট করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে কামনার সেই সোমযাগ যে বেদীর উপরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মনুষ্যজীবনের রোমান্স্; যে উপকরণসমষ্টির দ্বারা তিনি এই বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসে তাহা নিত্যপ্রত্যক্ষ

নয় বলিয়া যাঁহারা এই কাব্য অতিমাত্রায় কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের চক্ষে মানুষের জীবনই অতিশয় ক্ষুদ্র ; বঙ্কিমের কল্পনায় মানব-ভাগ্য ও মানব-চরিত্রের যে রহস্য-সন্ধান আছে তাহা যদি কাহারও পক্ষে বাস্তবাতিরিক্ত হয়, তবে তাঁহার মতে হিমালয় অপেক্ষা উই-ঢিবি সত্য, এবং পদ্ম অপেক্ষা ঝিঙাফুল অধিকতর বাস্তব।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালীর নবজন্মের কথা বলিতেছিলাম। মানুষের দেহমন্দিরে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহার প্রতি যে গোপন শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত, জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার সেই ঔৎসুক্য এই নবসাহিত্যের জন্ম-হেতু। যে কামনার নাম সৃষ্টিকল্পনা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের যে মোহিনী মানুষের প্রাণে 'প্রেম'-নামক মহাপিপাসার উদ্রেক করে— যাহার বশে মানুষ আপনাকে স্বতন্ত্র না ভাবিয়া, এই জগৎ-রহস্যের সঙ্গে আপনাকে একটি অপূর্ব্ব রসচেতনায় যুক্ত করিয়া নিজেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়— বাঙ্গালী চরিত্রের সেই সুপ্ত প্রবৃত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। আধ্যাত্মিকতার প্রাণহীন জড়-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা তুচ্ছ ধারণা বা ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া, বহিঃ-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহারই নিদর্শন— বিষবৃক্ষ ও মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধের কবি নাটক রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টিতে কবির যে আত্মবিলোপ— সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার যে কল্পনা-শক্তি— যাহার বলে কবিই আত্মচেতনার (সে যত গভীর হউক) সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রকৃত মুক্তির অধিকারী হন— মধুসূদনের সে শক্তি ছিল না। তাই তাঁহার কাব্যে যখন মেঘনাদের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজ করেন, তখন লক্ষ্মণ কথা খুঁজিয়া পায় না— কবিহৃদয়ের লিরিক-পক্ষপাত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তথাপি মধুসূদন সাহিত্যের এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ না করিলেও, মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবেই তাঁহার যে শ্রদ্ধা, মানুষের বাসনা-কামনা পাপ-পুণ্য পৌরুষ ও দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার যে শাস্ত্র-সংস্কার-মুক্ত সহজ সহানুভূতি, তাহাই এ যুগের কবিকল্পনাকে মুক্তিলাভের দুঃসাহসে দীক্ষিত করিয়াছে। অপরাপর প্রতিভাহীন কবি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মহাকাব্য বা কাহিনীকাব্য রচনার আগ্রহ থাকিলেও, ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া গীতিকাব্য বা কাহিনী কোনোটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তার কারণ, এ কাব্যের উৎকৃষ্ট আর্ট বা technique তখনও বাংলা কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রাচীন গীতিকাব্যের কল্পনা ও রচনাভঙ্গীই তখনও ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এ সমস্যার সমাধান করিল— এ কাব্যের ছন্দ হইল গদ্য, ইহার

আকার হইল উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই এ কল্পনার পূর্ণ বিকাশ ও অবসান ঘটিয়াছে— বঙ্কিমের সেই নাটকীয় প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি, কল্পনার সেই ঐশ্বর্য্য আর কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।

তথাপি উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে এই ধারা কতকটা ভিন্নমুখী হইলেও আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই; বাস্তবপ্রীতি বা মানুষের দেহজীবনের রহস্যবোধ উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির অভাবে অতিশয় সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইলেও তাহা আজ বাংলা গদ্যে বাস্তবেরই বিচিত্র ভঙ্গী বিশ্লেষণ করিতেছে। কিন্তু বাংলাকাব্যে এই বহির্মুখী কল্পনা আর আমল পাইল না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে মূর্ত্তিপূজার যে আনন্দ, বাহিরের বিপুল জনস্রোতের কলকোলাহলে মিশিয়া মিলিত কণ্ঠস্বরের যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা— বাংলা কাব্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল না। মানুষ হইয়া মানুষের ভিড়ে আসিয়া দাঁড়াইবার সেই উৎসাহ যেমন বাঙ্গালীর পক্ষেই সম্ভব, তেমনি বৃন্দাবন-স্বপ্নও বাঙ্গালীরই; এই দুই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ধারায় বাঙ্গালী আত্মহারা। তাই নব-সাহিত্যের যে প্রেরণার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি, যে প্রেরণার বশে বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর নবজন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করি, এবং যাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ঘটিলে সাহিত্যে তথা জীবনে আমরা একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারিতাম, সেই প্রেরণা সহসা আর-এক পথে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালীর কাব্য-কল্পনা প্রাণের অন্তস্তল হইতে সরস্বতীর ধ্যানমূর্ত্তি আবিষ্কার করিল— তাহাতে বাস্তবজীবন ও বহির্জগৎকে আত্মসাৎ করিবার এক অভিনব ভাবসাধনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল— বাহিরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন আর রহিল না। কাব্য জীবন হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। আমি কবি বিহারীলাল ও তাঁহার "সারদামঙ্গলের" কথা বলিতেছি।

বিহারীলালের গীতিকল্পনায় আত্মভাব-সাধনার যে ভঙ্গীটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এতই নূতন যে, আমাদের দেশীয় গীতিকাব্যের ইতিহাসে কবিমানসের এতখানি স্বাতন্ত্র্য কাব্যসাধনাকেই আধ্যাত্মিক সংশয়মুক্তির উপায়রূপে বরণ করার এই আদর্শ— ইতিপূর্ব্বে আর লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব কবির কাব্যসাধনায় একটা ভাবগভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় আছে— শুধু রসসৃষ্টিই নয়, প্রাণের গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির সাধনা আছে। তথাপি বৈষ্ণব কবির কল্পনায় এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই, সে কল্পনা একটা বিশিষ্ট ভাবসাধনার পদ্ধতিকে, একটা সঙ্কীর্ণ সাধন-তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াছে— সে সাধনার মন্ত্র কবির নিজ কবিদৃষ্টির ফল নহে। বিহারীলালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ আধুনিক। সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয়

কল্পনার অধীন করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ার যে গীতিপ্রেরণা, *তাহারই নাম* কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিহারীলালের কল্পনায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ, বাংলা কাব্যে সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, সহসা ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী গীতিকাব্যে কবির এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়াছিল; এবং Wordsworth ও Shelleyর কল্পনা হইতে বিহারীলালের কল্পনা যতই ভিন্ন হউক, উহা যে মূলে সমগোত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বিহারীলালের কাব্যসাধনায় ইংরেজী কাব্যের প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তথাপি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার আছে। প্রথমতঃ, ইংরেজী সাহিত্য বা ভাষায় বিহারীলাল ততদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে ইংরাজ রোমাণ্টিক কবিগণের সঙ্গে তাঁহার খুব গভীর পরিচয় সম্ভব। তিনি বায়রণের কাব্য পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কবিতায় বায়রণের ভাবানুবাদ আছে; এরূপ ইংরেজী জ্ঞান বা ভাবগ্রাহিতা খুব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু শেলী অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাবকল্পনা অনুবাদ বা অনুকরণের বস্তু নয়; সেখানে কাব্যের আত্মাকে যেন আত্মসাৎ করিতে হয়, সে কাব্যে এবং সে ভাষায় বিহারীলালের ততখানি প্রবেশ ছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ বিহারীলাল প্রভৃতির গীতি কবিতার বিশেষত্বই এই যে, শুধু তাহার ভাববস্তুই মৌলিক নয়, ভাবনার ভঙ্গীও মৌলিক; তাহা না হইলে তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এমন ফুটিয়া উঠিত না। এ স্বাতন্ত্র্য যেন জন্মাগত, কোনও বহির্গত প্রভাবের ফল নয়। তাই বিহারীলালের কোনও কোনও শ্লোকে শেলীর কবিতা-বিশেষের ছায়া লক্ষ্য করিলেও এরূপ ভাবসাদৃশ্য অনুকরণাত্মক হইতে পারে না। অতএব এইরূপ প্রভাবকেই বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণার কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। তথাপি, বিহারীলাল এই সকল কবিদের সঙ্গে যে একেবারে অপরিচিত ছিলেন এমন না হইতে পারে; হয়তো ইংরেজী কাব্যে কবি-মানসের এই নূতন অভিব্যক্তির কথা তিনি তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহাতে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আশ্বাস ও উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন— আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মত বন্ধুর সংসর্গ যাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনুমান মিথ্যা না হইতেও পারে।

তবে কি বাংলাকাব্যে বিহারীলালের অভ্যুদয় নিতান্তই আকস্মিক? তিনি কি সে যুগের কেহ নন?— সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কুত্রাপি ঘটে না, আমাদের সাহিত্যেও ঘটে নাই; বিহারীলাল এই যুগেরই কবি, এবং প্রতিভা হিসাবে তিনি

যেমন বঙ্কিম ও মধুসূদনের সমকক্ষ, তেমনি তাঁহার কাব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও একই অবস্থার ফল। সে যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রতিভা যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, মধুসূদন বঙ্কিম প্রভৃতি তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বরণ করিয়া কল্পনাকে বহির্মুখী করিয়া য়ুরোপীয় আদর্শে রসসৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।— অন্তরকে বাহিরের নিয়মাধীন করিয়া সর্ব্ব দ্বন্দ্ব ও সংশয়কে কাব্যরসে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিহারীলাল এই দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন নাই— এইখানেই তাঁহার ভারতীয় সংস্কার জয়ী হইয়াছে; কিন্তু তিনিও এ যুগের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে সচেতনতা এ যুগে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, পূর্ব্বতন কোনও যুগে যদি তাহা ঘটিত, তবে ভারতীয় কবি কাব্যসাধনার যে-পন্থা অবলম্বন করিতেন ও যে-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতেন, বিহারীলাল তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বহির্জগৎকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া প্রাণের মধ্যে একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়া সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রীতি ও সৌন্দর্য্য -লুব্ধ কবিপ্রাণ ধ্যানযোগে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহার ভাবনায় জীবধর্ম্মের গভীরতম প্রবৃত্তিও বাস্তবজগতের কঠোর কর্কশতার উপরে একটি কোমল প্রলেপ বুলাইয়া শান্ত আনন্দরসে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। এ সাধনা ভারতীয় প্রকৃতির অনুবন্ধী— সকল রসের উপরে শান্তরসের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় কবির কবিধর্ম্ম। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ-কঠোর নিয়তি, বাসনা-কামনার স্বর্গনরকব্যাপী আলোড়ন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ট্রাজেডির অনুভাবনা, ভারতীয় কবির কল্পনাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যসাধনায় এই মন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও তাহা স্বতন্ত্র, তাঁহার কবিপ্রকৃতি অন্য দিকে সম্পূর্ণ আধুনিক। আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ কাব্যরসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলিয়া ঘোষণা করিলেও— কাব্যকে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিলেও— কবির কাব্যসাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ, এই রসসৃষ্টিতে কাব্যের যে কলা-কৌশল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেই কলা-কৌশলের নিপুণ প্রয়োগই কবিপ্রতিভার মুখ্য কীর্ত্তি— রস যেন তাহার গৌণ পরিণাম; কবি যেন একটি আদর্শ স্থির রাখিয়া কাব্যের উপকরণগুলি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতেন; একটা বাঁধা নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ মানস বা প্রাণের প্রেরণাকে দমন করিয়া রাখিতেন। এজন্য কাব্যসাধনায় কবি-মানসের কোনও স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না। আধুনিক কালে আমরা কাব্যের মধ্যে কবি-মানসের যে আধ্যাত্মিক পরিচয় পাই— মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তি জগতের সঙ্গে

নিবিড় সম্পর্কের ফলে যে পূর্ণ-চেতনা লাভ করে— কবি কীট্‌স্ যাহাকে 'soul-making' বলিয়াছেন, এই সকল কাব্যে তাহার নিদর্শন নাই। কাব্য বাস্তব জগতের রূপরসোদ্ভূত হইলেও তাহার লক্ষ্য যখন সেই 'রস' যাহা ব্রহ্মাস্বাদের মত, তখন বস্তু-জগতের সঙ্গে কাব্যের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবার প্রয়োজন কি? কলেকৌশলে সেই অবস্থা ঘটাইতে পারিলেই যথেষ্ট। অতএব বাহিরের সঙ্গে অন্তরের কোনও বোঝাপড়া অনাবশ্যক— সে সমস্যা জ্ঞানযোগী দার্শনিকের অধিকারভুক্ত। এজন্য কবির পক্ষে একটা স্বাধীন ভাবসাধনার প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালী কবি বিহারীলাল এই বহিঃসৃষ্টির প্রভাবকে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, এবং তাহাকে নিজস্ব ভাবসাধনার মন্ত্রে জয় করিয়া লইয়াছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলে যে subjectivity আছে তাহা ভারতীয় সাধনরীতির অনুকূল; কিন্তু তাহা যে কবিধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন; কারণ, এই ভাব-সাধনার মূলে আছে মর্ত্ত্যমাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ, তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। কবিকল্পনার উপরে বহিঃ-প্রকৃতির এই প্রভাব— যেমন ভাবেই হোক মর্ত্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা— যে ধরণের আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। ইংরাজ রোমাণ্টিক কবিগণের মতই— প্রকৃতি ও মানবহৃদয়কে একত্রে গাঁথিয়া একটা বৃহত্তর আদর্শের অনুপ্রাণনা, মানুষের মনোবৃত্তি ও দেহবৃত্তিকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার এই চেষ্টা— মানুষের প্রাণে যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের পিপাসা রহিয়াছে, বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে তাহার উৎসরূপিণী এক চিন্ময়ী সত্তার কল্পনা— বাঙ্গালী-কবিকেও এত শীঘ্র অভিভূত করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। কিন্তু তদপেক্ষা বিস্ময়কর তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা। তাঁহার 'সারদা', Wordsworth-এর প্রকৃতিসর্ব্বস্ব বিশ্বচেতনাও নয়; Shelleyর রূপাতীত রূপময়ী, প্রেমসৌন্দর্য্যের অপরা আদর্শ-লক্ষ্মী, বিশ্বাতীত বিশ্বাত্মাও নয়। তাঁহার 'সারদা' মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী, বিশ্বব্যাপ্তসৌন্দর্য্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী, বহিরন্তরবিহারিণী, বিশ্ববিকাশিনী "দেবী-যোগেশ্বরী"— তিনি "প্রত্যক্ষে বিরাজমান, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান" অর্থাৎ, "তুমিই বিশ্বের আলো (শুধু নয়), তুমি বিশ্বরূপিণী"—

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।

—'যোগীর ধ্যান' ও 'প্রেমিকের প্রাণ',— তাঁহার 'সারদা'য় এই দুয়ের কোনও বিরোধ নাই, কারণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যপিপাসা তাঁহার নিকট অভিন্ন।

বাস্তবপ্রীতি বা প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ যাহার নাই, তাহার সৌন্দর্য্য-পিপাসাও নাই। সৌন্দর্য্য রূপাতীত বা বাস্তবাতীত নয়, এ জন্য প্রেয়সী ও রূপসীর মধ্যে ভাবগত অসামঞ্জস্য নাই। যোগীর ধ্যানে যে সৌন্দর্য্যের প্রেরণা রহিয়াছে, প্রকৃত প্রেমের প্রেরণাও নাই। বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের যোগ-সূত্ররূপিণী এই 'যোগেশ্বরী' সারদার কল্পনা করিয়াছেন; ইহাতে কাব্যের সহিত জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্কের কথা— সকল উৎকৃষ্ট কাব্য-প্রেরণার মর্ম্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কীট্‌সের সেই "Principle of Beauty in all things" বিহারীলালও কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মনে হয় কবি-প্রেরণার পরমতত্ত্বটিকে তিনি যেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়াছেন, তেমন করিয়া Wordsworth বা Shelleyও পান নাই। কবি কীট্‌স্ যাহার সজ্ঞান চেতনায় অভিভূত হইয়াছিলেন Shakespeare অজ্ঞানে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যসৃষ্টির আনন্দে কবি-জীবনের পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিহারীলালের ভারতীয় প্রকৃতি ধ্যানরসে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ অন্তরের উপলব্ধিকেই কবিপ্রাণের নিশ্চিন্ত মুক্তি মনে করিয়া কেবল মন্ত্র জপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হয় নাই; তাঁহার কাব্য একরূপ তত্ত্বরসের (mysticism) আধার হইয়া আছে,— সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলে একটা কথা মনে হয়। বিহারীলালের এই মন্ত্রদৃষ্টি যদি কাব্য সৃষ্টি করে, তবে সে কাব্য গীতিকাব্য হইতে পারে না; নাটকীয় রূপসৃষ্টি ভিন্ন আর কোনও উপায়ে ইহার পূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব। যে কল্পনা সর্ব্ববস্তুকে সুন্দর দেখে, যে সৌন্দর্য্যবোধের মূল বাস্তবপ্রীতি, সে কল্পনার পরিণাম বিশ্বাত্মীয়তা। অতএব তাহা যদি কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা হয় তবে তাহা কোমল কঠোর, সুন্দর-কুৎসিত, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ— এক কথায় জগৎসৃষ্টির যতকিছু বৈচিত্র্যকে একটি সমান নির্‌দ্বন্দ্ব রসচেতনার বশে কাব্যরূপে প্রতিফলিত করিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে, লিরিকের আত্ম-ভাব-সর্ব্বস্বতা তাহার পক্ষে অসঙ্গত। এই জন্যই বিহারীলালের গীতিকবিতাও সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার রচনায় যথার্থ কাব্যসৃষ্টির পরিবর্ত্তে কাব্যরসরসিকের একরূপ ভাবাবস্থার পরিচয় আছে।

Keats এই ভাবকে রূপ দিবার— বহিরন্তরবিহারী এই সত্য-সুন্দরকে কাব্যের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য আকুল হইয়াছিলেন ; অসমাপ্ত কবিজীবনে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়গোচরকে বাক্যগোচর করিতে পারিয়াছিলেন, নিজ প্রাণের আকুতিকেও অপরের হৃদয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিকল্পনাও কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তিনিও বুঝিয়াছিলেন ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) রূপ-সৃষ্টি ব্যতিরেকে এ কল্পনা সার্থক হইতে পারে না। বিহারীলালের এ ভাবনা ছিল না, এ প্রেরণাই ছিল না, কেবল উৎকৃষ্ট ভাবরসে নিমগ্ন হইয়া তিনি নিজ প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন— কাব্য-প্রেরণার যে রহস্য সেই রহস্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; তাই তিনি প্রকৃত কবি না হইয়া mystic হইয়াই রহিলেন। একজন প্রসিদ্ধ কবি সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

The pure poet is not a mystic, contemplation of the mystery is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creator.

তথাপি বিহারীলালের কাব্যসাধনায় ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে থাকিলেও, তাহার একটা লক্ষণ বিস্মৃত হইলে চলিবে না— বিহারীলালের কবি-প্রকৃতিতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ এবং অতিশয় বাস্তব হৃদয়বৃত্তি একসঙ্গে চরিতার্থ হইয়াছে। ইহার কারণ, তাঁহার কাব্যসাধনায় বাঙ্গালীর বৈরাগ্যবিমুখ বাস্তবরসপিপাসার সঙ্গে ভারতীয় ভাবনা যুক্ত হইয়াছে— এই দুইয়ের সম্মিলনেই এমন সত্যকার কবিদৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বাঙ্গালী-প্রতিভা বাস্তবজীবনের কল্পনাগৌরবে কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙ্গালীপ্রতিভাই ইংরেজী-প্রভাববর্জ্জিত হইয়া এবং ভারতীয় ধ্যানপ্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কাব্যের স্রষ্টা না হইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছে। এজন্য শেলী বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তুলনায় বিহারীলালের কবিদৃষ্টি আরও সম্যক্ ও সুসম্পূর্ণ হইলেও কাব্যসৃষ্টির বিষয়ে তাঁহাদের বহু নিম্নে রহিয়া গিয়াছে।

বিহারীলালের এই কবিদৃষ্টি আর-কাহাকেও অনুপ্রাণিত না করিলেও তাঁহার কাব্যরচনার ভঙ্গী এবং তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ পরবর্ত্তী কবিগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যসাহিত্য বাঙ্গালীর সুপরিচিত হইয়া উঠিল; তাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে ভাবোন্মাদমাধুরী অপূর্ব্ব সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, গীতিপ্রাণ বাঙ্গালীর কল্পনা তাহাতে আত্মসমর্পণ

করিল ; বিহারীলাল যে আত্মভাবসাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিদেশী গীতিকাব্যের আদর্শ সহজেই বাংলা কাব্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙ্গালীসুলভ প্রীতিকল্পনায়, বাহিরের সহিত অন্তরকে যুক্ত করিয়া একটি পরিপূর্ণ রসসাধনার যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল ; ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এ কাব্যের মূল-প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইল। বিহারীলালের কাব্যে আত্মভাবনিমগ্নতার লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে সজ্ঞান আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু সেই আত্মনিমগ্নতার মোহই বড়াল-কবির কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বিহারীলালের 'সারদা'র একটি দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাঁহার সেই রহস্যময়ী মূর্ত্তি—শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল-কবির অবাস্তব রসপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে। ব্যক্তির এই আত্মপরায়ণ কল্পনা, এই সম্পূর্ণ অসামাজিক আত্মরতির কবিতা বাংলা সাহিত্যে নূতন—কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবিকল্পনার হা-হুতাশ বাংলা সাহিত্যে এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই আত্মরতি আর-এক রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; তিনি সর্ব্ববস্তুতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন তাহা বস্তুগত নয়, বাস্তবই অবাস্তব-মনোহর হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রীতির অফুরন্ত উৎসমুখে সর্ব্ববস্তুই সুন্দর। এ বিষয়ে তিনিও বিহারীলালের কাব্যকল্পনার একাংশমাত্রের অধিকারী। বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে যে 'ভোলা প্রেমিকের প্রাণ' বলিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথের কাব্য তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে, কিন্তু 'কবির যোগীর ধ্যান' তাহা নহে।

তথাপি দেবেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবিপ্রতিভায় বাংলা গীতিকাব্যের যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও যেন পলকের জন্য, অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মত, বাঙ্গালীর সেই চিরকালের বাঙ্গালীত্ব শেষবার ধরা দিয়াছে। এ যুগের কবিগণের মধ্যে এই বাঙ্গালী-সুলভ প্রীতির আবেগ আমরা বিহারীলালের কাব্যে দেখিয়াছি ; মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও এই প্রীতির বশে abstractions লইয়া থাকিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এই প্রীতির উচ্ছ্বাসে অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কবিশক্তির অভাবে তাঁহার প্রীতি ভাষায় ও ছন্দে কাব্যের অপূর্ব্বতা লাভ করে নাই। বিহারীলাল এই প্রীতিকেই অতি উচ্চ সৌন্দর্য্যধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন ; সেই ধ্যানের সঙ্গে এই প্রীতির বিরোধ ছিল না বলিয়াই তিনি এমন সম্যক্ কবিদৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রীতি একটি নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আত্মভাবমূলক আবেগের তীব্রতায় এই প্রীতি যেন কবির হৃদয়-বাঁশরীর একমাত্র রন্ধ্রমুখে গীতোচ্ছ্বাসে বাজিয়া

উঠিয়াছে। চিন্তালেশহীন নিছক emotionএর এই আবেগ, এই ভাববিহ্বলতা বাংলা কবিতায় যে একটি সুর যোজনা করিয়াছে, তাহা গীতিকাব্য হিসাবে অপূর্ব্ব; নিজ প্রাণের আহ্লাদকে উপুড় করিয়া ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার এমন ভঙ্গী বাঙ্গালী কবি ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। প্রীতি-সৌন্দর্য্যের এই মিলিত আবেগ দেবেন্দ্রনাথকে বিহারীলালের যতটা সমগোত্র করিয়াছে আর কাহাকেও তেমন করে নাই; মনে হয়, যে আবেগ বিহারীলালের ধ্যান-কল্পনায় গভীর হইয়া শান্তরসে পরিণত হইয়াছে, সেই আবেগই দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবশ করিয়াছে। বিহারীলাল 'বিচিত্র এ মত্তদশা'কে 'ভাবভরে যোগে বসা' বলিয়াছেন—দেবেন্দ্রনাথের সে যোগসাধনা ছিল না; তাঁহার কল্পনা একমুখী, আত্মহারা, অপ্রকৃতিস্থ; তিনি ধ্যান-ধারণার ধার ধারিতেন না, ভাবকে ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার ঘটিত না। সেজন্য, প্রবল হইলেও তাঁহার কল্পনা সঙ্কীর্ণ, তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি অসমান ও বিক্ষিপ্ত।

আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে এ যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তথাপি কবিগণের মৌলিক প্রতিভা ও ব্যক্তিগত প্রেরণার যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন তাহা করিয়াছি। এই আলোচনা হইতে বাঙ্গালীর কবিপ্রতিভা তাহার জাতীয় প্রবৃত্তির দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই সাহিত্যসৃষ্টিতে কি কারণে কোন্ দিকে তাহা কতখানি সফল বা নিষ্ফল হইয়াছে তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। বাঙ্গালীর স্বভাবে যে দুই প্রবল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কারণ এই জন্যই এই সাহিত্যের ধারা একটা ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়া শেষে বিমুখবাহিনী হইয়াছে। যাহা নূতন, অথচ সত্য এবং সুন্দর, তাহার আদর্শ বিদেশী বা বিজাতীয় হইলেও, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার যে উদার কল্পনাশক্তি বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব, তাহারই প্রভাবে এই নবসাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জাতির প্রাণে সাড়া না জাগিলে, কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। তাই, য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে, এই নব সাহিত্যের কল্পনাভঙ্গী ও ভাবপ্রেরণায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে কৌতূহল, মনুষ্যজীবনের বাস্তব নিয়তির ভাবনায় যে অভিনব উন্মাদনা আমরা লক্ষ্য করি— কল্পনাকে ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ ও মনস্তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সফল ও নিষ্ফল সাধনার পরিচয় পাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে

দেখা যায়, বাঙ্গালীর অন্তরে এইম র্ত্যজীবনের প্রতি একটি সত্যকার মমতা, দেহপ্রীতি বা বাস্তবরসবুভুক্ষা চিরদিন বিদ্যমান আছে। কিন্তু দেশের জল-বায়ু, ভারতীয় কাল্‌চারের প্রভাব, ও বাহিরের নানা অবস্থার গুণে, এই ভোগস্পৃহা জীবনের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষায় সত্য হইয়া উঠে নাই, অলস ভাববিলাস বা আত্মরতিকেই সে এই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় করিয়া লইয়াছে। তাই সাহিত্যে ও জীবনে কোনও বৃহৎ কল্পনা বা কীর্ত্তি-কামনা তাহার নিশ্চিন্ত পল্লী-বাস-সুখ বিঘ্নিত করিতে পারে নাই। কিন্তু গতযুগের সেই বৈদেশিক ভাবপ্লাবনে সে সহসা জাগিয়া দেখিল, তাহার গ্রামপ্রান্তের সেই নিভৃত নদীটির কূল-রেখা দূরবিসর্পী মাঠ-বাট-প্রান্তর একাকার করিয়া দিগন্ত-সীমায় মিশিয়াছে ; এবং সেইখানে ঊষালোকে, নানারাগরঞ্জিত মণিহর্ম্ম্যের মত একটি মেঘস্তম্ভ যেন সেই জলের উপরেই দাঁড়াইয়া ছায়া বিস্তার করিয়াছে! বাস্তব জগতে কল্পনার এই আচম্বিত বিস্তারে তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইল ; যে-মেঘ আকাশকে মেদুর করিয়া, গৃহকোণ অন্ধকার করিয়া, তাহার অন্তরের দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া তুলিত, সেই মেঘ আজ নবপ্রভাতের কিরণচ্ছটায় কি অপরূপ মায়াপুরী রচনা করিয়াছে! সেই দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি পার হইয়া অসীম সম্পদ-শোভার রহস্য-নিকেতন অধিকার করিবার জন্য মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষরছন্দে আহ্বান-সঙ্গীত গাহিলেন। এই কূলভাঙ্গা কল্পনাস্রোত, এই মুক্তির আনন্দই বাংলা-কাব্যে মধুসূদনের দান। কিন্তু মধুসূদন য়ুরোপীয় আদর্শে মানুষের মনুষ্যধর্ম্ম, পুরুষের পৌরুষকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিলেও, মনুষ্যজীবনের তলদেশ বা ভীমকান্ত শিখর-মহিমা অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিবার সাহস বা ধৈর্য্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীসুলভ মমতা ও প্রীতিবিহ্বলতার বশে তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে য়ুরোপীয় আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সে প্রভাব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ; তাঁহার কাব্যেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কল্পনার এ ধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।— জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষামৃতপানের সে আকাঙ্ক্ষা— দেহ মন ও হৃদয় এই তিনেরই উদ্দীপনার সে পৌরুষ আর নাই। মনে হয়, যে প্রাণবহ্নি কেবলমাত্র কবিপ্রতিভা-দ্বারা এক সাহিত্য হইতে আর-এক সাহিত্যে জ্বালাইয়া লইয়া বাঙ্গালীর কল্পনা বহির্ম্মুখী হইতে চাহিয়াছিল, তাহাতে গোড়া হইতেই একটা অভাব, একটা দুর্ব্বলতা ছিল। বাঙ্গালীর মজ্জাগত গীতি-প্রবণতা বা আত্মভাববিহ্বলতাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে— বাস্তব-জীবন-সাধনার সেই নূতন আবেগ সাহিত্যেও সফল হয় নাই। যে-প্রবৃত্তি আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভকে একটি নবতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিল তাহা যেন অর্দ্ধপথেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাঙ্গালীর

একমাত্র সম্বল ছিল সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও সহজ প্রীতিরস-রসিকতা— তাহাই লইয়া সে মহাকাব্য ও কাহিনীর দিকে ঝুঁকিয়াছিল— তাহার ফল হইয়াছিল শক্তিহীন অনুকরণ ও ভাব-কল্পনার স্বেচ্ছাচার। ইহারই প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিলেন বিহারীলাল। তিনি একেবারে বাহির হইতে অন্তরে আশ্রয় লইলেন এবং কাব্য-সাধনার ধ্যানযোগে, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ ও বাঙ্গালীসুলভ সহজিয়া প্রীতির যোগসাধন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের যে নব অনুপ্রেরণা বাংলা কাব্যে প্রথম প্রথম একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিলেও, কালে তাহা প্রাণ-মূলে রসসঞ্চার করিয়া, শুধু সাহিত্যে নয়, বাঙ্গালীর জীবনেও প্রতিষ্ঠা পাইত— বিহারীলাল সেই অনুপ্রেরণাকে আদৌ অস্বীকার করিয়া—

হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উল্কিমুখি আয়া!

এবং

তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে

—বলিয়া, জীবনের সর্ব্বদায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া গাহিলেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুশী তার।

ইহাতেই সর্ব্বদ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল, বাঙ্গালী যেন মুক্তি পাইল। আত্মভাবনিমগ্ন বাঙ্গালী-কবি কখনো অন্তরে কখনো বাহিরে স্বকীয় কল্পনা প্রসারিত করিয়া কাব্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, এই আত্মভাবনিমগ্নতার মধ্যেও তিনি একটি অপূর্ব্ব প্রীতিরসের সাধনা করিয়াছিলেন। এ প্রীতি শুধুই কাল্পনিক বিশ্বপ্রেম নয়, অথবা আর্টের সৌন্দর্য্য-লালসা নয়; এ রস জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব হৃদয়-সম্পর্কের রস। এই প্রীতি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা একাধারে মিলিত হইয়াই বিহারীলালের কাব্যে (আধুনিক বাংলাকাব্যের একমাত্র সত্যকার) mysticism সঞ্চার করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিজীবনের আদর্শহিসাবে বিহারীলালের বাঙ্গালীত্ব এই যে ভাবদৃষ্টির সন্ধান পাইয়াছিল— কাব্য-মন্ত্র ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

রচনা: ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

লেখক-পরিচয়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৫ মে ১৮১৭ ; মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫। প্রিন্স্ দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৈশোরের শিক্ষা সমাপ্ত হয় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে। কিছু কাল হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অনুশীলনের জন্য স্থাপিত 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইহার পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি'র কাজে যোগ দেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্ববোধিনী সভা সেকালের শিক্ষিত জনসমাজকে নানা বিষয়ে পথ দেখাইয়াছিল। এই সভা হইতে ১৮৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্য-নির্মাণে এই পত্রিকার দান অপরিসীম। এই তত্ত্ববোধিনী সভাকে অবলম্বন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে পরিবর্তন আসে। এ দেশে শিক্ষাবিস্তার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, বারাকপুর পাঠশালা, সুখসাগর স্কুল, হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় ইত্যাদি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ আজীবন ইহার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস উদার বুদ্ধি ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে তাঁহার লেখায় গোঁড়ামি কিংবা সংকীর্ণতার সংস্পর্শ নাই।

গ্রন্থাবলী : আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৭৭৪ শক) ; ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০ খ্রী) ; ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ ১৭৮৩ শক ; দ্বিতীয় প্রকরণ ১৭৮৮ শক ; পরিশিষ্ট ১৮০৭ শক) ; জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (১৮১৫ শক) ; পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৫ খ্রী) ; স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮ খ্রী)। ইত্যাদি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ ; মৃত্যু ২৯ জুলাই ১৮৯১। নিবাস বীরসিংহ, জেলা হুগলী (বর্তমান মেদিনীপুর)। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের প্রশংসাপত্রের এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য—"শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট"। সংস্কৃত কলেজের পাঠসমাপনের পর বিদ্যাসাগর কিছুকাল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্পর্শে আসেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। এই কলেজে সামান্য চাকুরি হইতে ক্রমে তিনি অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনে স্মরণীয় অধ্যায়। যুক্তির দ্বারা যুক্তিকে এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা তিনি অপর পক্ষের অযুক্তিকে খণ্ডন করিতেন— ইহার প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার বেনামী রচনা 'অতি অল্প হইল' বা 'আবার অতি অল্প হইল' গ্রন্থে। সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ এবং উদ্যম সদাজাগ্রত ছিল। সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য -বিষয়ক সমালোচনা উল্লেখযোগ্য রচনা। সাহিত্যের দিক হইতে বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হইল গদ্যরচনায় সহজ ও অনায়াস ভঙ্গির প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মধুসূদন বলিয়াছিলেন : The man ... has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother.

গ্রন্থাবলী : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) ; সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) ; শকুন্তলা (১৮৫৪) ; সীতার বনবাস (১৮৬০) ; আখ্যান-মঞ্জরী (১৮৬৩); স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত (১৮৯১)। ইত্যাদি

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ ; মৃত্যু ১৫ মে ১৮৯৪। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। মেজাজের মিল না হইলেও এই দুইজনের মনের মিল ছিল। ভূদেব আজীবন শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড খুলিয়া তিনি এ দেশে সংস্কৃত-চর্চার পথটি সুগম করিয়া দেন। ভূদেবের মন ছিল নিষ্ঠাপরায়ণ এবং আচারনিষ্ঠ। জাতির ঐতিহ্যে তিনি পুরামাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। ভূদেবের লেখায় প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে নয়— যুক্তির দ্বারা তিনি প্রাচীনকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভূদেবের রচনা ঈষৎ গুরুগম্ভীর ও যুক্তিনির্ভর। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা তিনি। ভূদেব অনেক কাল 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী : ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) ; পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬) ; পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) ; সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) ; আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫) ; বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ (১৮৯৫), দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৫) ; স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫)। ইত্যাদি

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৩৪ ; মৃত্যু ১৮৮৯। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। পরীক্ষায় কৃতকার্যতা সঞ্জীবচন্দ্রের কপালে ঘটে নাই। চাকুরি-জীবনেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সাংসারিক জীবনে সঞ্জীবচন্দ্র পটু বা বিচক্ষণ ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সঞ্জীবচন্দ্র যোগ্যতার সঙ্গে ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'ভ্রমর' নামে আর একখানি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকাও সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা অজস্র নয়। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার দ্যুতি এবং নবীনতা এই স্বল্পপরিমাণ রচনাতেও লক্ষণীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না'। আসর-জমানো বৈঠকি মেজাজের আলাপচারি হইতেছে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলী। তাঁর 'পালামৌ' ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। Bengal Ryots নামে একখানি ইংরাজি গ্রন্থে তিনি বাংলার প্রজাদের সুখসুবিধা আইনকানুন লইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

গ্রন্থাবলী : যাত্রা-সমালোচন (১৮৭৫) ; রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭) ; কণ্ঠমালা (১৮৭৭) ; সংকার (১৮৮১) ; বাল্যবিবাহ (১৮৮২) ; জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) ; মাধবীলতা (১৮৮৫) ; দামিনী (১৮৮৩) ; পালামৌ (১৮৯৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮; মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪। নিবাস কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ-পরগনা। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ। বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুইজন গ্রাজুয়েটের মধ্যে তিনি একজন। সরকারী চাকুরিতেও যোগ্যতার পরিচয় দেন। ছাত্র অবস্থা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সেকালের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মতো তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

'সম্বাদ প্রভাকরে' গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁহার নিজস্ব রচনাপদ্ধতির পরিচয় দেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাহির হইবার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার খ্যাতি সর্বত্রগামী হয়। ইতিপূর্বে উপন্যাসের সৃষ্টি হইলেও প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারাটিকে পুষ্ট করিয়া তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকশিক্ষক বলিয়াছেন। এই বিশেষণ যথার্থ। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'পত্রসূচনা'য় শিক্ষিত বাঙালীর মনের কথাটি প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানচর্চার প্রশস্ত পথটি 'বঙ্গদর্শন' উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মচর্চায় মনঃসংযোগ করেন।

গ্রন্থাবলী: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫); কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬); মৃণালিনী (১৮৬৯); বিষবৃক্ষ (১৮৭৩); ইন্দিরা (১৮৭৩); যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪); লোকরহস্য (১৮৭৪); চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); রাধারাণী (১৮৭৫); বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫); কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫); বিবিধ সমালোচন (১৮৭৬); রজনী (১৮৭৭); কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮); সাম্য (১৮৭৯); রাজসিংহ (১৮৮২); আনন্দমঠ (১৮৮৪); দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪); মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪); কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬); সীতারাম (১৮৮৭); বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১১ মার্চ ১৮৪০; মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। বাল্যের বিদ্যাশিক্ষা স্কুলের ধরাবাঁধা নিয়মে হয় নাই। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যচর্চায় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কবিতা রচনা করিতে ভালোবাসিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার শিক্ষকতায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কাব্য উত্তমরূপে অধিগত করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। চিত্রকলাতেও দ্বিজেন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। 'স্বদেশী মেলা' স্থাপনে তাঁহার আনুকূল্য স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন ইত্যাদি সভা-সমিতির সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন, "ভাব-সকল যেন

luscious। যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শৈলীর আস্বাদ পাইতে চান, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবেন।" গদ্য-রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অতুলনীয়। দুরূহ তত্ত্বকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শব্দ -নির্বাচন ও -প্রয়োগের মৌলিকতা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার বিশেষত্ব।

গ্রন্থাবলী : মেঘদূত (১৮৬০); স্বপ্ন-প্রয়াণ (১৮৭৫); আর্য্যামি ও সাহেবিআনা (১৮৯০); গীতাপাঠ (১৯১৫); নানা চিন্তা (১৯২০); প্রবন্ধমালা (১৯২০)। ইত্যাদি

চন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ৩১ আগস্ট ১৮৪৪; মৃত্যু ২০ জুন ১৯১০। নিবাস হুগলী জেলার কৈকালা গ্রাম। কলেজের পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৬৫ সালে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ সালে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ সালে বি. এল. পাস করিলেও ওকালতি ব্যবসা তাঁহার মনোমত হয় নাই। কিছুকাল তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে বাংলা সরকারের অধীনে অনুবাদকের কর্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন হইতেই চন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তবে ইতিহাসের প্রতিই তাঁহার প্রীতি ও নিষ্ঠা অধিক ছিল। সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর ন্যায় তিনিও প্রথমে ইংরাজিতেই প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে বঙ্কিমের অনুপ্রেরণায় বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দা বিলম্বিত দেখি।" বাংলা ভাষাতে চন্দ্রনাথের প্রতিভা ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের সরণি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথ সাহিত্যে খ্যাতি পাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ বসুর 'রম্যরচনা'র নিদর্শন রহিয়াছে 'ফুল ও ফল' এবং 'ত্রিধারা' নামক গ্রন্থে।

গ্রন্থাবলী : শকুন্তলাতত্ত্ব (১৮৮১); পশুপতি-সম্বাদ (১৮৮৪); ফুল ও ফল (১৮৮৫); ত্রিধারা (১৮৯১); সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০); "বেতালে" বহু রহস্য (১৯০৩); পৃথিবীর সুখদুঃখ (১৯০৯)। ইত্যাদি

শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম ৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭ মৃত্যু ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯। নিবাস মজিলপুর, চব্বিশ-পরগনা। পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হরানন্দ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিবনাথের মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; 'সম্বাদ প্রভাকর' তাঁহার সহায়তা পাইয়াছিল। শিবনাথের বাল্যজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কুচবিহার-বিবাহ-আন্দোলন লইয়া শিবনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পরে শিবনাথ শাস্ত্রী -প্রমুখ ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১৮৮৮ সালে শিবনাথ বিলাত-যাত্রা করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া শিবনাথ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিবনাথ কয়েকখানি উপন্যাস লেখেন; তাঁহার রচিত কবিতা ও গদ্যপ্রবন্ধ তাঁহার অকৃত্রিম উপলব্ধি, আন্তরিকতা ও মনস্বিতার মুকুরস্বরূপ। অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক রূপেও তাঁহার খ্যাতি অপরিসীম। তাঁহার 'আত্মচরিত' বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস। শিবনাথের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' স্মরণীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থাবলী: নির্ব্বাসিতের বিলাপ (খণ্ড কাব্য, ১৮৬৮); পুষ্পমালা (১৮৭৫); মেজ বৌ (১৮৮০); রামমোহন রায় (১৮৮৬); যুগান্তর (১৮৯৫); রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪); প্রবন্ধাবলি (১৯০৪); বিধবার ছেলে (১৯১৬); আত্মচরিত (১৯১৮)। ইত্যাদি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩; মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৯৩১। নিবাস নৈহাটী। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন সুপণ্ডিত ছিলেন। হরপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাহচর্য পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন হরপ্রসাদের "friend, philosopher and guide"। পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় হরপ্রসাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অপরিসীম। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। বিদ্যাচর্চা তাঁহার জীবনে অন্যতম আচরণীয় বিষয় ছিল। তাঁহার তথ্যপ্রীতি ও তথ্যনিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। কিন্তু 'পাথুরে প্রমাণে' তাঁহার অতিবিশ্বাস

ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হরপ্রসাদ বাংলা রচনায় মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" তাঁহার অন্যতম আবিষ্কার। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি বাংলা দেশের ও সাহিত্যের ইতিহাস-চর্চার পথ সুগম করিয়া দেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদে থাকা-কালীন হরপ্রসাদ নানা গ্রন্থ সম্পাদন করেন। বৌদ্ধধর্মের বিশদ আলোচনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্যতম কীর্তি। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ সরকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন।

গ্রন্থাবলী : ভারতমহিলা (১৮৮১); বাল্মীকির জয় (১৮৮১); সচিত্র রামায়ণ (১৮৮২); মেঘদূত-ব্যাখ্যা (১৯০২); কাঞ্চনমালা (১৯১৬): বেণের মেয়ে (১৯২০); প্রাচীন বাংলার গৌরব (১৯৪৬); বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮)। ইত্যাদি

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮; মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭। নিবাস রাড়ীখাল, বিক্রমপুর, জেলা ঢাকা। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু সমাজসংস্কারে শিক্ষাবিস্তারে এবং কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন। জগদীশচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বৃত্তি পাইয়া এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাস করিয়া বিলাত যান। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে কেমব্রিজ হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি পান। ১৮৯৬ হইতে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁহার মৌলিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানী প্রভৃতি নানা দেশে প্রচার করেন। পাশ্চাত্য জগৎ জগদীশচন্দ্রের মৌলিক আবিষ্কারের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে আমেরিকাতে ধারাবাহিক বক্তৃতার সাহায্যে তিনি উদ্ভিদতত্ত্ব এবং তড়িৎ-পার্থবিদ্যা (Electrophysics) সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক গবেষণার কথা জ্ঞাপন করেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি. উপাধি দান করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বসুবিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর হইতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণায় রত হন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার কৃতিত্ব বাংলা তথা ভারতের গৌরবের বস্তু। সাহিত্যে

তাঁহার অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। জগদীশচন্দ্র দুইবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। জগদীশচন্দ্রের রচনায় কল্পনা ও সত্যের অপরূপ সমন্বয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থাবলী : অব্যক্ত (১৯২০) পত্রাবলী (১৯৫৮)। ইত্যাদি

বিপিনচন্দ্র পাল

জন্ম ৭ নভেম্বর ১৮৫৮; মৃত্যু ২০ মে ১৯৩২। নিবাস পৈল, জেলা শ্রীহট্ট। পিতা দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্ট জেলা স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে বিপিনচন্দ্র অনুপ্রাণিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী হইতে পান স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা। বিপিনচন্দ্র কেবল ধর্মসংস্কারেই নিজেকে নিয়োজিত করিলেন না, কিংবা একমাত্র রাজনীতি-চর্চাও তাঁহার জীবনের ব্রত হয় নাই। রাজনীতি সমাজ এবং সাহিত্য এই সকলই বিপিনচন্দ্রের প্রিয়বস্তু ছিল। শেষপর্যন্ত বিপিনচন্দ্র কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। পরে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করিলেও কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তরের জন্য তিনি দীর্ঘদিন এ কাজে থাকিতে পারেন নাই। ১৮৯৯ সালে বিপিনচন্দ্র বিলাত এবং সেখান হইতে নিউইয়র্ক যান। ১৯০০ সালে দেশে ফিরিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। তেজস্বিতা ও মনস্বিতার সঙ্গে অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তির জন্য তিনি সারা ভারতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রচারক নবভাবে-ভাবিত Bande Mataram পত্রের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৮ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিলাত যান। মতস্বাতন্ত্র্যের জন্য শেষ দিকে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগ ছিন্ন হয়। বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা নানা কাজকর্মের মধ্যেই অগ্রসর হইয়াছিল। তথাপি তিনি যেসমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার স্থায়ী মূল্য আছে। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় স্বাধীন স্বচ্ছন্দ চিন্তা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর সহজেই ধরা পড়ে।

বিপিনচন্দ্র অনেকগুলি ইংরাজি গ্রন্থও রচনা করেন এবং অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী : শোভনা (উপন্যাস—১৮৮৪); ভারতসীমান্তে রুস (১৮৮৫); ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া (১৮৮৭); সুবোধিনী (১৮৯২); ভক্তিসাধন

(১৮৯৪); জেলের খাতা (১৯১০); চরিত-কথা (১৩২৩); সত্য ও মিথ্যা (১৩২৩); প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ (১৩৪১); নবযুগের বাঙ্গালা (১৩৬২); মার্কিনে চারিমাস (১৩৬২); রাষ্ট্রনীতি (১৩৬৩)। ইত্যাদি

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৫৯; মৃত্যু ৩০ জুলাই ১৯৫৬। পৈত্রিক নিবাস দিগ্‌ড়া, হুগলি জেলা। বাল্যশিক্ষা পাঠশালায়। ১৮৭৮ সালে দশ টাকা বৃত্তি পাইয়া বর্ধমান মহারাজার স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। হুগলি কলেজ হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাস করিয়া (১৮৮৩) কটক কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পর কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে। তার পর কিছুদিন চট্টগ্রাম কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করিয়া কটকের কলেজে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। দ্বিতীয় বার কটকে গিয়া যোগেশচন্দ্র অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্‌ চন্দ্রশেখরের প্রতি আকৃষ্ট হন। চন্দ্রশেখর সিংহের জ্যোতিষগ্রন্থ যোগেশচন্দ্র সম্পাদনা করেন। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২০ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া বাঁকুড়ায় আসেন। অবসর গ্রহণের পর হইতেই যোগেশচন্দ্র অক্লান্ত অধ্যবসায় লইয়া বিদ্যাচর্চা করিতে থাকেন। ১৯৫১ সালে *Ancient Indian Life* গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার লাভ করেন। পূজাপার্বণ গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৯৫২ সালে যোগেশচন্দ্রকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে সরোজিনী বসু পদক ও ১৯৪৭ সালে জগত্তারিণী পদক দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ১৯৫৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যানিধি মহাশয়কে 'ডক্টরেট' উপাধি দান করেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁহার রচনার আরম্ভ। 'দাসী' পত্রিকায়ও লিখিয়াছেন। 'প্রবাসী'তেই অধিক লিখিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাংলা বানান ও লিপি -সংস্কারে তাঁহার মৌলিক দান সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পুরাচর্চায় ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-আলোচনায় যোগেশচন্দ্রের অসামান্যতা দেখা যায়।

গ্রন্থাবলী: আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৩); রত্নপরীক্ষা (১৯০৪); বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম অধ্যায় ১৩১৫— দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩১৭ —তৃতীয় অধ্যায় ১৩১৯); বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম-চতুর্থ খণ্ড : ১৩২০-১৩২২); ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (প্রথম খণ্ড ১৯১৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৩); শিক্ষাপ্রকল্প (১৩৫৫);

পূজাপার্বণ (১৩৫৮) ; কোন্ পথে (১৩৫৯) ; বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল (১৩৬১) ; কি লিখি (১৩৬৩)। ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ও সারদা দেবীর অষ্টম পুত্র বা চতুর্দশ সন্তান, জোড়াসাঁকো কলিকাতার ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের শেষরাত্রে (৭ই মে ১৮৬১)। পিতামহ দ্বারকানাথ বিত্তে এবং চিত্তে খ্যাতি অর্জন করেন, অসামান্য সততা এবং জীবনব্যাপী ঈশ্বরভক্তির কারণে দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি বলা হইত। বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠেন। এই পরিবারের অনেকেই সাহিত্য স্বাদেশিকতা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কৃতিত্বের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। বাড়িতে বড়ো বড়ো গায়কগুণীর সমাগমে, শুনিয়া শুনিয়াই উচ্চাঙ্গের গানে এবং 'গায়কী'তে তাঁহার অধিকার জন্মে। কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয় ছিল। আর-একটু বড়ো হইলে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সাহিত্য ও সংগীত -সাধনার সকল প্রকার উদ্যমে তিনি উৎসাহদাতা ও সহযোগী -রূপে লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ষোলো এই পরিবার হইতে ভারতী মাসিক পত্র বাহির হয়, রবীন্দ্রনাথের নানা গদ্য পদ্য রচনা তাহাতে নিয়মিত প্রকাশ হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই স্কুল-পলাতক; সতেরো বছর বয়সে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাতে গিয়া এক বৎসরের অধিক কাল থাকেন। পাশ্চাত্যের সহিত এই তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূচনা। বিলাত হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্য শুরু করেন; দেশে ফিরিলে অল্পকালের মধ্যেই সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কাব্যগ্রন্থ, ও প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক প্রকাশিত হয়। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা প্রভৃতি গীতিনাট্য উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা ও অভিনয়দক্ষতা— তেমনি বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষিতে তাঁহার আখ্যানকথনের প্রতিভা ক্রমশ ফুটিয়া উঠে। তেইশ বৎসর বয়সে মৃণালিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি অব্যাহতগতি চলিতে থাকে। রাজা ও রানী, বিসর্জন, মানসী, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গোড়ায় গলদ, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্য নাটক প্রহসন ও গদ্য রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটিতে থাকে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে সাধনা প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র গদ্য পদ্য রচনায়, আলোচনা ও সমালোচনায় এবং ছোটোগল্পে মাসের পর মাস ইহার

কলেবর পূর্ণ হইতে থাকে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে তিনি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। বঙ্গদর্শনে-প্রচারিত চোখের বালি ও নৌকাডুবি উপন্যাস দুইটির রচনায় বাংলা কথাসাহিত্যে নূতন ভাব ভঙ্গী ও বিষয়ের অবতারণা করেন। কর্মী ও শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের সাধনায় ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণে কবির পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে অসুস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো কবিতার ইংরেজি ভাষান্তর ও রূপান্তর করিতে থাকেন। তাহা বিলাতে গুণী ও রসিক -সমাজের গোচরে আসিলে তাঁহারা এক অপূর্ব আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করেন। কেবলমাত্র গীতাঞ্জলির অনুবাদ না হইলেও, Gitanjali : Song-Offerings নামে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত হওয়ার ফলে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। পুরস্কারের সমুদয় অর্থ আশ্রম-বিদ্যালয়ে দান করেন। গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রাচী-প্রতীচীর হৃদয় ও বুদ্ধির সম্মিলনে, বিদ্যা ও প্রতিভার সহযোগিতায়, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পরে নিকটবর্তী সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন নামে পল্লীসেবা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলন্ড, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তিনি ভারতের মর্মবাণীর প্রচার উপলক্ষে ভ্রমণ করেন। তাঁহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি পরাধীন ভারতের আত্মমর্যাদার অন্যতম স্থায়ী মূলধনরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তারিখে (৭ই অগস্ট, ১৯৪১) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩; মৃত্যু ৪ জুলাই ১৯০২ কলিকাতা। সিমলাপল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশের সন্তান। পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাটর্নী ছিলেন। কলেজ-জীবনেই নরেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সহপাঠী ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। কলেজের অধ্যক্ষ হেস্‌টি সাহেব নরেন্দ্রনাথের দার্শনিক জ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৮৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই হইতে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় বিবেকানন্দ। ১৮৮৭ সালে তিনি

পরিব্রাজক রূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তার সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডে যান। ১৮৯৭ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালে দ্বিতীয় বার লণ্ডন যান। স্বামীজী দেশের কুসংস্কার দূর করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক চেতনা -আনয়নে ব্রতী ছিলেন। জাতিভেদ-প্রথার তীব্র সমালোচক ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় উপদেশে মানবপ্রেমের উদারতর স্থর ফুটিয়া উঠিত। ঠিক সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ লেখেন নাই; তাঁহার রচনা বহুল নয়। কিন্তু স্বল্পপরিমাণ লেখার মধ্যেও তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া আছে। গদ্যরচনায় তিনি কথ্যরীতির আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হন নাই; যেমন তাঁহার বিভিন্ন বাংলা প্রবন্ধে তেমনি বাংলা চিঠিপত্রে ইহার প্রাণবান্ সাবলীল ভঙ্গী পাঠককে যুগপৎ প্রীত ও উদ্‌বোধিত করে।

রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীগণের জীবনকালে এ দেশে, বিশেষতঃ বাংলায়, জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণ ঘটিয়াছিল, বিবেকানন্দের চরিত্র ও চিন্তা তাহার অন্যতম প্রবল প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে।

গ্রন্থাবলী: ভাব্‌বার কথা (১৯০৫); বর্ত্তমান ভারত (১৯০৫); পরিব্রাজক (১৯০৩); পত্রাবলী (১৯০৫); প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য; বীর-বাণী (১৯০৫)। ইত্যাদি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ২০ আগস্ট ১৮৬৪; মৃত্যু ৬ জুন ১৯১৯। নিবাস টেঁয়াবৈদ্যপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা পিতৃব্য এবং পিতামহ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ছাত্রজীবন গৌরবোজ্জ্বল। দু-একবার ছাড়া ছাত্রবৃত্তি হইতে এম. এ. অবধি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম হইয়াছেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ঐ কলেজে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। সাহিত্যানুরাগ বাল্যকাল হইতেই ছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রথম লেখা আরম্ভ করেন। 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে রামেন্দ্রসুন্দর নিয়মিত লিখিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বিদ্যাচর্চায় পাণ্ডিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের সমকক্ষ ব্যক্তি খুব কম ছিলেন। তাঁহাকে যথার্থ বিদ্যার সাতসমুদ্রের কাণ্ডারী বলা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যে সরস ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজস্ব। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব, দার্শনিক সমস্যা ইত্যাদি যে কত সহজ ও অনায়াস পদ্ধতিতে প্রকাশ করা

যায় রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী তাহার নিদর্শন। বস্তুতঃ রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষার সম্ভাবনার চৌহদ্দিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। দেশানুরাগ রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রের এক অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। তাঁহার 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বাঙ্গালী জাতির জীবনভাষ্য।

গ্রন্থাবলী : প্রকৃতি (১৮৯৬); জিজ্ঞাসা (১৯০৪); বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬); মায়াপুরী (১৯১১); ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৯১১); কর্ম্মকথা (১৯১৩); চরিত-কথা (১৯১৩); বিচিত্র-প্রসঙ্গ (১৯১৪); শব্দ-কথা (১৯১৭); যজ্ঞকথা (১৯২০); নানা-কথা (১৯২৪)। ইত্যাদি

সতীশচন্দ্র রায়

জন্ম ১৭ অক্টোবর ১৮৬৬ ; মৃত্যু ২৯ মে ১৯৩১। নিবাস ধামগড় গ্রাম, জেলা ঢাকা। বাল্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও পরে ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিস ইনস্টিটিউশন হইতে বি. এ. এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে প্রথম হইয়া এম. এ. পাস করেন। কিছুদিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। পড়াশুনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের জন্য চাকুরি ত্যাগ করেন।

চাকুরি ত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্র সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া আলোচনা শুরু করেন। যৌবনে মেঘদূতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রত্নতত্ত্বের দিকে বরাবর ঝোঁক ছিল। ভাষাতত্ত্ব-আলোচনায়ও উৎসাহ ছিল অদম্য। হিন্দীসাহিত্যচর্চার আগ্রহে হিন্দী শিক্ষা করেন। হিন্দীতে প্রাচীন হিন্দুস্থানী কবিদের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের একজন স্থায়ী সদস্য ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। বাংলা পদাবলীসাহিত্য-আলোচনাতে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল ; কঠোর পরিশ্রমে তিনি পদাবলী-সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করেন।

গ্রন্থাবলী : শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (১৩০৪); মেঘদূত ; শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (১৩১৯); রসমঞ্জরী (১৩২০); অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী (১৩২৭); নায়িকা-রত্ন-মালা (১৩৩৭); ভবানন্দের 'হরিবংশ' (১৩৩৮)। ইত্যাদি

দীনেশচন্দ্র সেন

জন্ম ৩ নভেম্বর ১৮৬৬ ; মৃত্যু ২০ নভেম্বর ১৯১৯। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এইজন্য ছাত্র-

অবস্থাতেই তিনি চাকুরি-গ্রহণে বাধ্য হন। সাহিত্যে অনুরাগ তাঁহার বরাবরই ছিল। পুঁথি সংগ্রহ করার আগ্রহ তাঁহার চিরকাল ছিল। পুঁথি সংগ্রহ করিতে করিতে দীনেশচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা জাগে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তাঁহার এই ইচ্ছাপ্রসূত কীর্তি। দীনেশচন্দ্রের এই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কীর্তিকে দেশবাসী সাদরে বরণ করিয়াছিল। বাংলার মনীষীবৃন্দের আনুকূল্য তিনি পাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রীতি লাভ করেন। বহুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাহিনী-চিত্র-চরিত্র ইত্যাদি লইয়াও মনোরম গ্রন্থাবলি রচনা করেন। তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসও আছে। দীনেশচন্দ্রের রচনায় প্রাঞ্জলতা সরলতা ও আন্তরিকতা অতি সহজেই পাঠক-চিত্তকে আকৃষ্ট করে। ইংরাজিতে গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য জগতের নিকট বাংলা সাহিত্যের রসভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেন।

গ্রন্থাবলী : কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ (কাব্য— ১৮৯০) ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) ; তিন বন্ধু (১৯০৩) ; রামায়ণী কথা (১৯০৪) ; বেহুলা (১৯০৭) ; ফুল্লরা (১৯০৭) । ইত্যাদি। সম্পাদিত গ্রন্থ : ছুটীখানের মহাভারত (১৯০৪) ; শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (১৯০৫) ; কাশীদাসী মহাভারত (১৯১২) ; বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৪) ; ময়মনসিংহ-গীতিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩) । ইত্যাদি

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৮৬৭ ; মৃত্যু ১৫ নভেম্বর ১৯২৩। নিবাস হালিশহর, চব্বিশ-পরগনা। বাল্যকাল হইতে বিহারে বাস করার জন্য হিন্দী ভাষায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ১৮৮৭ সালে পাটনা কলেজ হইতে সংস্কৃত অনার্স-সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পান। কলেজের শিক্ষার পর পাঁচকড়ি বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ধর্মপ্রচারক' পত্রে তাঁহার প্রথম রচনার সূত্রপাত। অল্প কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া তিনি সাংবাদিক-কার্যে ব্রতী হন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সংস্পর্শে আসেন। ইন্দ্রনাথ পাঁচকড়ির সাহিত্যগুরু। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গবাসী'র প্রধান সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে 'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর 'রঙ্গালয়' পত্রে যোগদান করেন। 'সন্ধ্যা' কাগজেও নিয়মিত লিখিতেন। ১৯০৮ সালে

'দৈনিক হিতবাদী'র সম্পাদক হন। ইহা ছাড়া 'বাঙ্গালী' ও হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্রে'র সম্পাদনার ভারও তাঁহার উপর কিছুকাল ছিল। একমাত্র 'নায়ক' পত্রিকার সঙ্গেই তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে সরকারী প্রচারবিভাগে বঙ্গানুবাদকের কাজে ব্রতী হন। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় জার্নালিজমের লক্ষণ আছে। রচনাপদ্ধতিতে আবেগের তীব্রতা লক্ষণীয়। তাঁহার রচনার অপর বৈশিষ্ট্য উচ্ছ্বাসপ্রবণতা। সাংবাদিকের দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তিনি সর্বদা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার অধিকাংশ রচনার উৎস হইল স্বজাতিপ্রীতি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক রচনা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ইঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী: আইন-ই-আকবরী (১৯০০); উমা (১৯০১); রূপলহরী (১৯০২); সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড— ১৯০৯); সাধের বউ (১৯১৯); দরিয়া (১৯২০)। ইত্যাদি

প্রমথ চৌধুরী

জন্ম ৭ আগস্ট ১৮৬৮; মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬। পিতৃনিবাস হরিপুর, পাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম. এ. পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ব্যারিস্টারি বেশিদিন করেন নাই। প্রথমজীবনে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন: এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার নানা গল্পে ছড়াইয়া আছে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া ফরাসী সাহিত্যে, তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। প্রচলিত মতামতকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন না। যেখানেই কোনো অসংগতি দেখিয়াছেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাহায্যে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। চলতি ভাষার পক্ষে কেবল ওকালতি নয়, তাহার দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইতে পারে তাহা হাতে কলমে দেখাইয়াছেন। ১৩২১ সালে 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করেন। কবিতা-রচনাতেও প্রমথ চৌধুরী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রমথবাবুর রচনায় সর্বত্রই মজলিশি মেজাজের ছাপ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাবলী: তেল নুন লকড়ি (১৯০৬); সনেট-পঞ্চাশৎ (১৯১৩); চার-ইয়ারি কথা (১৯১৬); বীরবলের হালখাতা (১৯১৭); নানা-কথা (১৯১৯); পদ-চারণ (১৯১৯); নীললোহিতের আদিপ্রেম (১৯৩৪)। ইত্যাদি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৬ নভেম্বর ১৮৭০ ; মৃত্যু ২০ অগস্ট ১৮৯৯। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে বলেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অর্থকরী বিদ্যার দিকে বলেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহায়তা পাইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হন। আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ বাল্যকাল হইতেই ছিল। গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার সমান উৎসাহ দেখা যায়। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি 'বালক' মাসিক পত্রের লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনার নিদর্শন 'একরাত্রি' প্রবন্ধ এবং 'সন্ধ্যা' কবিতা। বলেন্দ্রনাথের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণা এই তরুণ লেখকের পাথেয়স্বরূপ ছিল। তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি যে রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে ; বিচিত্র ভাবনা কল্পনা সমালোচনা -মূলক এমন বহু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যাহা সকল কালের সকল পাঠকের উপভোগ্য বস্তু হইয়া থাকিবে। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' বাহির হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বলেন্দ্রনাথের সকল রচনা লইয়া 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী : চিত্র ও কাব্য (নিবন্ধ, ১৮৯৪) ; মাধবিকা (কাব্য, ১৮৯৬) ; শ্রাবণী (কাব্য, ১৮৯৭)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৭১ ; মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। রবীন্দ্র-নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। বাল্যে নর্মাল স্কুলে কিছুদিন পড়েন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই পাঠ সাঙ্গ হয়। কিছুদিন যন্ত্রসংগীতের চর্চা করেন। ছেলেবেলা হইতেই চিত্রাঙ্কনের দিকে ঝোঁক ছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের পদে আহ্বান করেন। আর্ট স্কুলে তিনি একটি শিল্পীগোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন। প্রধানতঃ তিনি এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টায়, রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সহযোগিতায়, ভারতীয় চারু ও কারু -কলা, ক্রমশ যুগোপযোগী নবজীবন ও নূতন প্রেরণা লাভ করে। নাট্যকলাতেও

তাঁহার উৎসাহ ছিল প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে তাঁহার অভিনয়দক্ষতা সকলকে মুগ্ধ করিত। রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পর বিশ্বভারতীর আচার্য-পদে অবনীন্দ্রনাথ কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকাশ দুই ধারায়— ছবি লেখায় এবং গল্প-প্রবন্ধ রচনায়। মূলতঃ শিল্পী বলিয়া তাঁহার রচনাপদ্ধতিতে ছবি-আঁকার অপূর্ব উৎসাহ, রঙের লুকোচুরি এবং রোমান্টিক রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। রূপকথার জগতের জীয়নকাঠি তাঁহার করায়ত্ত ছিল। বাংলার তথা ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে ভারতীয় চিত্রকলার শ্রদ্ধা-মিশ্রিত আলোচনা এবং অন্যত্র বাংলার ব্রত সম্বন্ধে তাঁহার প্রীতিস্নিগ্ধ বিশ্লেষণ মনোমুগ্ধকর। বৈষ্ণবপদাবলী-চিত্রণে তাঁহার শিল্পীজীবনের সূচনা, আর শেষবয়সে তিনি প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে এবং বাংলার পরিচিত কৃষ্ণলীলার আখ্যানকে স্থায়িত্ব দিয়াছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী পাঠ করেন, শিল্প-রসজ্ঞতার সহিত কবিত্বের অপরূপ সমন্বয়ে সেগুলি বঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদরূপে সমাদরণীয় হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের 'শিশুসাহিত্য' গতানুগতিক নয়; এইগুলিকে নিছক শিশুসাহিত্য বলা ভুল। এইসমস্ত রচনা শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকেরই উপভোগ্য হইয়াছে।

গ্রন্থাবলী: শকুন্তলা (১৮৯৫); ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৫); বাংলার ব্রত (১৯০৯); রাজকাহিনী (১৯০৯); ভূতপত্‌রীর দেশ (১৩২২); খাতাঞ্চির খাতা (১৩২৩); পথে-বিপথে (১৯১৯); বুড়ো আংলা (১৩৪১); বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী (১৯৪১); ঘরোয়া (১৩৪৮); জোড়াসাঁকোর ধারে (১৩৫১); আপন কথা (১৩৫৩); আলোর ফুলকি (১৯৪৭)। ইত্যাদি

রাজশেখর বসু

জন্ম ১৬ মার্চ ১৮৮০; মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ১৯৬০। বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স এবং পাটনা হইতে ফার্স্ট আর্টস পাস করেন। বি. এ. পাস করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পাস করেন। ইহার পর বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। বাল্য-বয়সে কাব্যচর্চা করিতেন। কিন্তু সে অভ্যাস পনেরো-ষোল বছর বয়সেই চুকিয়া যায়। তাঁহার প্রথম গল্প শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ১৯২২ সালে লেখা হয়। গল্পটি পরশুরাম ছদ্মনামে ভারতবর্ষে ছাপা হইয়াছিল। ইহার পর জলধর

সেনের উৎসাহে তিনি উক্ত ছদ্মনামের আড়ালে গল্পরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার গল্পগ্রন্থ গড্ডলিকা প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্রে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে বসুমহাশয়ের সাহিত্যকৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরশুরামের রচনা প্রধানতঃ পরিহাসরসাত্মক। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান চিরকাল অম্লান থাকিবে। বাংলা বানান -সংস্কারেও তাঁহার দান সামান্য নয়। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যও রাজশেখর বসুর রচনায় সমৃদ্ধ। তাঁহার রামায়ণ এবং মহাভারতের সারানুবাদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সালে জগত্তারিণী এবং ১৯৪৫ সালে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়া রাজশেখর বসুকে সম্মানিত করেন। ১৯৫৫ সালে তাঁহাকে রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন।

গ্রন্থাবলী : গড্ডলিকা (১৩৪২); কজ্জলী (১৩৪৫); চলন্তিকা (১৩৪৫); মেঘদূত (১৩৫০); বাল্মীকি রামায়ণ— সারানুবাদ (১৩৫৩); মহাভারত— সারানুবাদ (১৩৫৬); গল্পকল্প (১৩৫৭); ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প (১৩৫৯); কৃষ্ণকলি (১৩৫৯); বিচিন্তা (১৩৬২); চলচ্চিন্তা (১৩৬৫)। ইত্যাদি

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ। আদি নিবাস ছোটবিন্যাকৈর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলা। পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত রংপুর জেলা হইতে এনট্রান্স পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন। দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া রংপুর আদালতে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯১৭-১৮ সালে ইউনিভার্সিটি ল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৩২১ সালে সবুজ পত্র প্রকাশিত হইলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন। সবুজ পত্রে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ। 'অন্নচিন্তা' এবং 'শিক্ষা ও সভ্যতা' প্রবন্ধ লিখিয়া রচনা শুরু করেন। পরে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের 'রীতিবিচার' লইয়া আলোচনা করেন; এইসমস্ত আলোচনা একত্রে গ্রথিত হইয়া 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনা অজস্র নয়। তাঁহার রচনার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধি বর্তমান। অতুলবাবুর সমস্ত রচনার মধ্যে তীক্ষ্ণ মননের স্বাক্ষর দীপ্যমান।

গ্রন্থাবলী : শিক্ষা ও সভ্যতা ; কাব্যজিজ্ঞাসা (১৩৩৫) ; নদীপথে (১৩৪৪) ; জমির মালিক (১৩৫১) ; সমাজ ও বিবাহ (১৩৫৩) ; ইতিহাসের মুক্তি (১৩৬৪)।

মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ ; মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার। নন্দলাল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট-জ্ঞাতিভ্রাতা। কৈশোর ও স্কুলজীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয় ; বাল্যে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী হালিশহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসন হইতে বি. এ. পাস করেন। সংসার-আবর্তে পড়িয়া এম. এ. পড়া ছাড়িয়া দেন। ১৯১৪ সালে সরকারী চাকুরিতে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। ১৩৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনেক কাল পরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। পরে বঙ্গবাসী কলেজে 'গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে' অধ্যাপনায় যোগ দেন।

মোহিতলাল চার-পাঁচ বছর বয়সে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হন। নয় বছর বয়সে রোমান্স পাঠে আগ্রহ জাগে। বারো-তেরো বছর বয়সে 'পলাশির যুদ্ধ' 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য-পাঠ শেষ হয়। 'মানসী'তে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। 'বীরভূমি' পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে কাব্যচর্চায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছন্দোমাধুর্য মোহিতলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন। ১৩৩১ সালে 'শনিচক্রে'র সঙ্গে পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে কবি মোহিতলালের স্থান অতিশয় বিশিষ্ট। সমালোচক-রূপেও মোহিতলালের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। ভাষারীতির 'বিশুদ্ধতা' লইয়া তাঁহার প্রবল আগ্রহ এবং নিষ্ঠা ছিল। গদ্যের বাঁধুনি আবেগময়, ওজঃগুণাঢ্য ও অলংকৃত— যেমন বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যে, ভাবনা-অনুভূতির ব্যাপ্তিতে, তেমনি ভঙ্গীর গুণেও সুধী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে।

গ্রন্থাবলী : দেবেন্দ্র-মঙ্গল (১৯১২) ; স্বপন-পসারী (১৩২৮) ; বিস্মরণী (১৩৩৩) ; আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৩৪৩) ; স্মরগরল (১৩৪৩) ; সাহিত্যকথা (১৩৪৫) ; কবি শ্রীমধুসূদন (১৩৪৫) ; সাহিত্যবিতান (১৩৪৯) ; বাঙ্গালার নবযুগ (১৩৫২) ; রবি-প্রদক্ষিণ (১৩৫৬) ; কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য (দুই ভাগ ১৩৫৯-৬০)। ইত্যাদি

প্রবন্ধকার সাহিত্যরথীগণের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য নিম্নতালিকা-ধৃত গ্রন্থগুলি পাঠ্য ।—

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ॥ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪৫

শ্রীসুকুমার সেন ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : চতুর্থ খণ্ড

বাঙ্গালা সাহিত্যে গভ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥ বাংলা সাহিত্যের একদিক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ॥ চিত্র-চরিত্র

বাংলার লেখক

শ্রীসুশীল রায় ॥ স্মরণীয়